অসামান্য পত্রলেখিকা
নিবেদিতা

অনুবাদ

প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

শ্রীসারদা মঠ
কলকাতা ৭০০ ০৭৬

প্রকাশিকা :
প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা
শ্রীসারদা মঠ, কলকাতা ৭০০ ০৭৬

প্রথম সংস্করণ :
নভেম্বর, ১৯৫৮

মুদ্রক :
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯

নিবেদন

শ্রীসারদা মঠের বাংলা মুখপত্র 'নিবোধত' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে ভগিনী নিবেদিতার বেশ কয়েকটি চিঠির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সঙ্কলিত 'Letters of Sister Nivedita' গ্রন্থের দুটি খণ্ড থেকে পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী নির্বাচিত কিছুসংখ্যক পত্রের সহজ সরল বাংলায় অনুবাদ করেছেন। পত্রগুলি হৃদয়গ্রাহী। পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহে ও বিশেষ অনুরোধে অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল। এইসঙ্গে আরও কয়েকটি নতুন চিঠির অনুবাদও যোগ করা হয়েছে।

বইটির প্রারম্ভে নিবেদিতার জীবনের ঘটনাবলী পরমপূজনীয়া মুক্তিপ্রাণামাতাজীর লেখা নিবেদিতার প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। পুস্তকের পরিশিষ্টে সংযোজিত হল ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে পূজনীয়া শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীরই তিনটি ভাষণ।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য নামে প্রকাশিত এই বইটি তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। আশা করি বইটি নিবেদিতার অসামান্য জীবন সম্পর্কে পাঠকের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে।

প্রকাশিকা

মুখবন্ধ

অসামান্য পত্রলেখিকা নিবেদিতা, জীবনে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন যা পত্রসাহিত্যে এক বিশেষ সংযোজন। এছাড়াও নিবেদিতার জীবনালেখ্যে ব্যক্তি নিবেদিতার যে-পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যায়, এই চিঠিপত্রের মধ্যে তার প্রকাশ হয় বিদ্যুৎ ঝলকের মতো।

১৮৯৫-এর নভেম্বরে নিবেদিতা স্বামীজীকে প্রথম দেখেন। ১৮৯৭-এব ৭ জুন এল স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান— "হে মহাপ্রাণ! উঠো, জাগো, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?..."

নিবেদিতার অন্তবাত্মা সাড়া দিল সেই আহ্বানে, সবকিছু ছেড়ে তিনি এলেন ভারতবর্ষে, স্বামীজীর কাজে, ভারতসেবায় তিলে তিলে নিজেকে আহুতি দিয়ে মাত্র তেরো বছরের মধ্যে নির্বাপিত হয়ে গেলেন।

ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে পেয়েছিল এক পরমাত্মীয়রূপে, কিন্তু বিরাট দুর্ভাগ্য, এইদেশ তাঁকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারেনি। এই খেদ ছিল নিবেদিতার প্রথম জীবনী-রচয়িত্রী সরলাবালা সরকারের। কিন্তু নিবেদিতাব অন্তরঙ্গ এই চিঠিগুলিতে দেশ, কাল, ধর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধির যে-আন্তরিক চিত্র ফুটে উঠেছে, (বিশেষ করে মিসেস সারা বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে লেখা পত্রগুলিতে) তা আমাদের নিবেদিতাকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। বর্তমান গ্রন্থে অনূদিত আটত্রিশটি চিঠি ভূমিকাসহ দশটি বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শব্দার্থের পরিবর্তে চিঠিগুলির মর্মার্থ গ্রহণেই আমরা আগ্রহী। ভাবেব সংগতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় অনেকস্থলে কালানুক্রমে চিঠিগুলিকে বিন্যস্ত করা সম্ভব হয়নি।

প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

অ নু ক্র ম

●

প রি শি ষ্ট

●

পড়ার টেবিলে নিবেদিতা

স্বামীজীর সঙ্গে কাশ্মীরে

ভগিনী নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।"

স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ধর্মযাজক পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড ও মাতা ইসাবেলের কন্যা মার্গারেট উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের ডানগ্যানন নামক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর।

মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁর মা মেরি তাঁকে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এই নিবেদন সম্পূর্ণ হয়েছিল একতিরিশ বছর পর স্বামীজী যেদিন তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করে নতুন নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতার জীবনকালকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমপর্ব তাঁর জন্মকাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ গুণগুলির সম্যক বিকাশের সঙ্গে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা। একদিকে সংশয়ের তাড়নায় মানসিক অবসন্নতা ও হতাশা, পাশাপাশি অন্তরের অন্তস্তলে এক পরম আশ্বাস—যে মহা-আহ্বানের জন্য তিনি প্রতীক্ষারত, তা একদিন আসবেই। স্বামী বিবেকানন্দের দৈববাণীর মাধ্যমে সেই প্রত্যাদেশ তাঁর কাছে এল। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর শুরু হল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, যে অধ্যায় ছিল তাঁর কর্মজীবনের প্রস্তুতিপর্ব। তৃতীয়পর্বে নিবেদিতার প্রকাশ ঘটেছিল নীরব, অনলস এক কর্মব্রতিরূপে। কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আত্মবিসর্জন—এই ছিল তাঁর সাধনা। তাঁর এই মহৎ কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্বামীজী-উচ্চারিত সেই চরমসত্য—ব্রতের উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নয়।

সাফল্যের সঙ্গে হ্যালিফ্যাক্স কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ করে মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করলেন। শুরু হল তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি

নিয়ে নানান গবেষণা। ইতিমধ্যে পেস্তালৎসি-ফ্রবেলের মতো শিক্ষাবিদেরা শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন। নবীন শিক্ষাব্রতী মার্গারেট জনৈকা ডাচ মহিলা ডি-লিউয়ের আহ্বানে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের উইম্বলডনে নতুন বিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। পরে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ১৮৯২ সালে স্বাধীনভাবেই নিজে একটি বিদ্যালয় খুললেন। শিক্ষাকার্যে তাঁর সাফল্য এবং শিক্ষাসম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও বক্তৃতাবলী তাঁকে লন্ডনের বিদগ্ধসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, রচনাশক্তি ও বাগ্মিতা।

সহসা তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আগমনে।

বহির্জীবনের সাফল্য মার্গারেটের চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারেনি। তাঁর অন্তরে এক আলোড়ন চলছিল। বাল্যকালে প্রচলিত ধর্মের প্রতি তাঁর একটা সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে প্রখর বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার ফলে সংশয় দেখা দেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি মনে হত প্রাণহীন। জীবনের এই পরমসন্ধিক্ষণে আবির্ভাব স্বামী বিবেকানন্দের—সব সংশয় ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে মার্গারেটকে যিনি এক অনন্তলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই নিবেদিতা নিয়মিত তাঁর ক্লাসগুলিতে উপস্থিত থাকতেন। এরকমই একটা ক্লাসে স্বামীজী হঠাৎ বলে উঠলেন, "জগতে আজ কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।' কে কে যেতে প্রস্তুত?" স্বামীজীর সেই বজ্রগম্ভীর আহ্বান মার্গারেটের হৃদয়ে তীব্র আঘাত করল।

দিনের পর দিন মার্গারেট অস্থিরচিত্তে কাটাতে লাগলেন। স্বামীজীর আহ্বান তিনি উপেক্ষা করতে পারছেন না। কিন্তু মনের মধ্যে নানা সংশয়। স্বামীজীর আদর্শের স্বরূপ কী— যে আদর্শের জন্য তিনি সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত!

৭ জুন, ১৮৯৬ স্বামীজী মার্গারেটকে লিখলেন :

"প্রিয় মিস নোবল,

আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যেতে পারে—তা হল মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি কার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ।"

এরপর একদিন স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে মার্গারেটকে আরও স্পষ্ট করে বললেন, "স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতগুলি পরিকল্পনা আছে। আমার

মনে হয়, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারো।"

মার্গারেট বুঝতে পারলেন ভারতবর্ষের নারীজাতির সেবায় তাঁকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি মার্গারেট ভারতের মাটিতে পা রাখলেন। জেটিতে অপেক্ষমাণ স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁর কর্মের প্রেরণা, ত্যাগের উৎস।

২৮ জানুয়ারি থেকে ১১ মে পর্যন্ত মার্গারেটের জীবনে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়—২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে যোগদান, ১১ মার্চ স্টার থিয়েটারে বক্তৃতাদান। বক্তৃতার বিষয় ছিল : ইংল্যান্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব। ১৭ মার্চ সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদা দেবীকে দর্শন ও ২৫ মার্চ ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভ।

দীক্ষালাভের পর ১১ মে স্বামীজীর সঙ্গে তিনি হিমালয়ভ্রমণে যান। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সদানন্দ, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস সারা বুল ও আরও কয়েকজন। এই ভ্রমণকালে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও স্বামীজীর দুর্লভ সঙ্গ লাভ করেছিলেন। স্বামীজী বহুসময় এমন দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত থাকতেন যে যাঁরা তাঁর আশেপাশে ছিলেন তাঁরাও দৃশ্যমান জগতের বাইরে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আভাস পেতেন। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়েই নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে শেখেন, প্রাচ্যজীবনযাত্রা ও সনাতন আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

নিবেদিতা কাজ আরম্ভ করার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। তাই কলকাতায় ফিরেই তার উদ্যোগ চলতে লাগল। স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮-এ কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং বাগবাজার পল্লীতে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে এসে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কাজ সম্পন্ন করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই নিবেদিতার স্কুলটি বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। নিবেদিতাও ভারতের জাতীয় আদর্শে নারীশিক্ষার কাজের পাশাপাশি বক্তৃতাদান, প্লেগের সেবা ইত্যাদি নানা কাজ শুরু করলেন। স্বামীজীর মতো নিবেদিতাও উপলব্ধি করেছিলেন—এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন অর্থের, সেইসঙ্গে একদল শিক্ষাব্রতীর যারা এই মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। ১৮৯৯ সালে তাই অর্থ-সংগ্রহের জন্য স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতাও গেলেন আমেরিকায়।

ভগিনী নিবেদিতার ভারতবাসের কাল অতিসংক্ষিপ্ত। এই স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর তিনবার পাশ্চাত্যে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমবার স্বামীজীর সঙ্গে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ১৯০৭-এ এবং

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে পরম বান্ধবী মিসেস সারা বুলের অসুস্থতার সংবাদে শেষবারের মতো তাঁকে পাশ্চাত্যে যেতে হয়।

নিবেদিতার স্বল্পকাল ভারতবাসের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল নিরলস কর্ম ও সেবায় পূর্ণ। ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে নিবেদিতা কলকাতার বাগবাজারে ফিরে আসেন এবং পুনরায় বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। ওই বছর এপ্রিল মাসে স্বামীজীর আর এক শিষ্যা কৃস্টিন ভারতে এসে নিবেদিতার কাজে যোগ দেন। ৪ জুলাই স্বামীজীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণ নিবেদিতার কাছে অপ্রত্যাশিত ও মর্মান্তিক। কিন্তু সংকল্পে তিনি অবিচল। অন্তরের সমগ্র শোক নিরুদ্ধ রেখে তিনি কর্মে অগ্রসর হলেন।

স্বামীজী অনুভব করেছিলেন স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। তাই নিবেদিতা সর্বান্তঃকরণে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতের মুক্তি চেয়েছিলেন। সেকারণে তিনি রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন, অথচ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। ফলে তাঁকে সঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমা ও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

এইসময় থেকে নিবেদিতার যথার্থ কর্মজীবনের শুরু। তিনি বলতেন, "My task is to awaken a nation."

দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম, সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতির মূলে যে-সকল শিক্ষিত, প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের ওপরও নিবেদিতার প্রভাব বড়ো কম ছিল না। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। শুধু বিখ্যাত ব্যক্তিই নন, উদীয়মান অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকদেরও তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণাস্বরূপ।

ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতি ও সেবার জন্য তিনি অর্ধাশনে অনাহারে কাজ করে গেছেন। তাঁর মহৎ চিন্তা ও কর্ম সমগ্র দেশকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। একসময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বক্তৃতাগুলি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—স্বদেশ, জাতীয়তা ও ভারতের ঐক্যবোধ। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ভারতের পৌরাণিক কাহিনী, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে যেসব তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কার করেছিল তার মূল্য অপরিসীম।

নিবেদিতা নিজে যে-কটি বই প্রকাশ করে গেছেন তার মধ্যে 'The Master As I Saw Him', 'Kali the Mother,' 'The Web of Indian Life,' 'Foot Falls of Indian History' বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

বস্তুত নিবেদিতার বিদ্যালয়টি ছিল তাঁর সর্ববিধ কার্যের কেন্দ্র। গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অশেষ কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্থান পরিত্যাগে সম্মত হননি। বিদ্যালয় ছিল তাঁর প্রাণের জিনিস, তিনি বলতেন, "বিদ্যালয়ের ওপর স্বামীজীর দৃষ্টি রয়েছে, এটি ভারতের নবজাগরণের উদ্বোধন-মন্ত্র স্বরূপ হবে।"

হিমালয়ের সঙ্গে নিবেদিতার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। প্রতি গ্রীষ্মে ও পূজার ছুটিতে তিনি মায়াবতী, দার্জিলিঙ প্রভৃতি জায়গায় যেতেন। ১৯১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি মায়াবতীতে গিয়েছিলেন আর পূজাবকাশে বসুদম্পতির সঙ্গে গেলেন দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সকলেই আশা করছেন নিবেদিতা সুস্থ হয়ে উঠবেন, নিবেদিতা কিন্তু নিজের অন্তরে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না, তিনি জানেন মৃত্যুর অর্থ এক অনন্ত সত্তায় নিজের সত্তার বিলুপ্তি।

নিবেদিতা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কিন্তু তাঁর পরিচিত জনেরা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। চিকিৎসার জন্য ডাঃ নীলরতন সরকারের প্রাণপণ চেষ্টা, বসুপবিবারের সেবা-শুশ্রূষা কোনও কিছুর ত্রুটি ছিল না তবু অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। সকলের মন বিষাদগ্রস্ত। কিন্তু নিবেদিতার প্রশান্ত দুই চোখে সকলের প্রতি যেন অনিঃশেষ প্রেম ও করুণা। মেয়েদের শিক্ষার চিন্তাই তাঁর হৃদয়কে অধিকার করেছিল—প্রধানত যে-কাজের জন্য তাঁর এদেশে আগমন। তাই তাঁর যা-কিছু অর্থ, গ্রন্থস্বত্ব সমস্তই বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণের নামে উইল করে দিলেন। সেই অর্থ দিয়ে গঠিত চিরস্থায়ী ফান্ডের আয়ের সবটুকুই ব্যয়িত হবে ভারতীয় নারীগণের জাতীয়ভাবে শিক্ষার জন্য। শেষের দিনগুলিতে তিনি ধ্যানতন্ময় হয়ে উঠেছিলেন।

১৩ অক্টোবর ভোরবেলা সহসা নিবেদিতার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন : "The boat is sinking. But I shall see the sunrise."—নিবেদিতার আত্মা বিলীন হয়ে গেল অসীম, অনন্ত সত্তায়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গতপ্রাণা সাধিকার ব্রত সংসিদ্ধ হল।

নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের সংবাদ দ্রুতগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর নির্দেশমতো হিন্দুমতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল। হিমালয়ের নির্জন ক্রোড়ে, শ্মশান প্রান্তরে যেখানে নিবেদিতাকে দাহ করা হয়, পরবর্তী কালে সেই পবিত্রভূমির ওপর যে-স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল, তাতে লেখা আছে : "Here reposes Sister Nivedita who gave her all to India."

তীর্থযাত্রা

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৮। তারপর থেকে ২০ জুন ১৮৯৯ পাশ্চাত্যগমনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসের প্রাথমিক পর্বটি ছিল তাঁর জীবনের স্মরণীয় কাল। ১৭ মার্চ ১৮৯৮ সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদা দেবীকে তিনি প্রথম দর্শন করেন। ২৫ মার্চ, ১৮৯৮ দীক্ষার পর মার্গারেটের নতুন নাম হয় 'নিবেদিতা'।

এরপর ১১ মে, ১৮৯৮ মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজী উত্তর-পশ্চিম ভারতে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। তখনও নিবেদিতা ভারতের অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে পরিচিত নন—চেনা-অচেনা আলো-আঁধারিতে রয়েছেন। এদেশে কাজ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতকে জানার ও ভালোবাসার। স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়বাসের দিনগুলিতে নিবেদিতার আন্তরসত্তায় রূপান্তর ঘটে এবং তখন তিনি বুঝতে পারেন ভারতের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনের জন্য কতখানি প্রস্তুতি তাঁর প্রয়োজন ছিল।

ভারতে আসার পর থেকে তাঁর নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ বিবরণ জানাতে নিবেদিতা ব্যগ্র ছিলেন। সে সম্বন্ধে প্রথম পত্র (৭ আগস্ট, ১৮৯৮) লিখেছেন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মিসেস নেল হ্যামন্ডকে। চিঠিটি তিনি লেখেন স্বামীজীর সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণকালে ঝিলাম নদীর ওপর হাউসবোটে বসে। স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথ যাত্রা এই চিঠির প্রধান আলোচ্য। হিন্দুদের ধ্যান, আসন প্রভৃতি সাধন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তাঁর জিজ্ঞাসু মনের পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে।

ক্ষীরভবানী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঐশীভাবে অনুপ্রাণিত স্বামীজীর যে-আত্মমগ্ন রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে (১৩ অক্টোবর, ১৮৯৮) তারই ভাববিহ্বল অনুরণন। চিঠি দুটি কাদের লেখা তা জানা যায়নি এবং ভেতরের কিছু পাতাও পাওয়া যায় না।

চতুর্থ পত্রে (৯ মার্চ, ১৮৯৯) নিবেদিতার মননঋদ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমায়ের এক নীরব অথচ গভীর ভাবময় ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। তখনও পর্যন্ত নিবেদিতা আশা করছেন ইংল্যান্ড ও ভারতের মিলন আসন্ন।

॥ এক ॥

ইসলামাবাদ ও শ্রীনগরের মধ্যবর্তী
ঝিলাম নদীর ওপর (হাউসবোটে বসে লেখা),
কাশ্মীর, রবিবার সকাল, ৭ আগস্ট, ১৮৯৮

প্রিয় নেল,

আগের চিঠির ঠিক পরে পরেই অত্যন্ত সুন্দর তোমার শেষের যে চিঠিটি এক রবিবার সকালে লিখেছিলে, তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আজ আর একটি রবিবারের সকাল। আমরা (ঝিলামের বুকে) শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চলেছি। এইমাত্র কনসাল পত্নী তাঁর স্বামীর কাছে রওনা হয়ে গেলেন, তাই আমি এখন একা একটি নৌকাতে আছি। ওদিকে স্বামীজীর নৌকাটি,—আর মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলের নৌকা ঠিক আমার পিছনে আছে। আমরা ওদের নৌকাতে খাওয়া-দাওয়া করতে যাই। (সকালে জলখাবার খাই ছ-টায়, দুপুরের খাওয়া বেলা বারোটায় আর রাতের খাওয়া সেরে ফেলি বিকেল পাঁচটা অথবা ছ-টায়।)

নদীটিকে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে চলেছি—যাত্রাপথে মৃদুমন্দ বাতাস আমাদের আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গে রয়েছি। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এসব শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র সান্ত্বনা—এই আনন্দময় প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছি।

তোমার চিঠি পেয়ে কী যে ভালো লাগল! এতটা তো আশা করিনি, কারণ আমার ধারণা ছিল তুমি চিঠি লেখা একেবারেই পছন্দ কর না। তোমার অপর চিঠিটি ঠিক সময়ে এসেছে—তাই মনে হল তোমার সঙ্গেই যেন তোমার নির্জনবাসের (রিট্রিট) সপ্তাহটি কাটালাম। অক্সফোর্ড বেছে নিয়ে খুব ভালো করেছ। পাঁচ পাউন্ড খরচের ব্যাপারটা কতই না আনন্দ দিয়েছে। এইরকম

আনন্দের আয়োজন যেন আরও হয়। 'গ্রেট থট' পত্রিকাটি খুব সুন্দর উপহার। এমনকি স্বামীজীও 'MAP' পড়ে ফেলেছেন। কত ভালো হল, বলো তো? ভাবতেও পারি না, একটা সামাজিক পত্রিকা কেমন করে এত সুখপাঠ্য ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে। যদি এরকম আরও পত্রিকা তোমার কাছে থাকে, আমাকে পাঠালে সত্যিই তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। স্বরূপানন্দকে দেখানোর জন্য এটি অন্য যে-কোনও পত্রিকার থেকে ভালো, কারণ কী ধরনের উপাদান 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এই পত্রিকাটি সে বিষয়ে খুব সহায়ক হবে।

আলমোড়াতে স্বরূপানন্দ আমার বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন, আর উনি আমাকে গীতা পড়তেও সাহায্য করতেন। এখন নতুন পত্রিকাটির সম্পূর্ণ ভার তাঁরই ওপর পড়েছে। স্বরূপানন্দ আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। স্বামীজী ছাড়া আমি যে-তিনজন বাঙালির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্ব বোধ করি, স্বরূপানন্দ তাঁদের একজন। তুমি পত্রের মাধ্যমে গুরুদেবের (স্বামীজীর) প্রতি যে 'ভক্তি ও ভালোবাসা' পাঠিয়েছ, আমি তাঁকে জানিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর ভালোবাসা তোমাদের জানালেন। আমাকে তোমাদের যে-ছবি পাঠিয়েছ তা দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। (কেমন ঘরোয়া ও সুন্দর ছবিটি! ওঃ, তোমার নীড়ের মধ্যে যদি একবার উঁকি মারতে পারতাম!) তুমি তো জান, তোমাদের সম্বন্ধে তাঁর কত বড়ো ধারণা। একদিন তিনি নানা আকাশকুসুম কল্পনা করে বলছিলেন যে, বিহারের কোনও জনবিরল স্থানে একটি কৃষি-কলোনি তৈরি করবেন (অবশ্য তাঁরই কথায়, তাঁর কল্পনা হয়তো রূপায়িত হবে কয়েক শতাব্দী পরে—তবুও শুনে রাখো)। তাঁর কল্পনার রাশ টানলেন এই বলে, "আর হ্যাঁ, ওই কাজে মিঃ ও মিসেস হ্যামন্ড এবং আরও অনেক ইংরেজ কর্মী আসবেন এবং আমার জন্য তাঁরা ওই কাজ করবেন।"

একটা কথা তোমাকে বলব বলে কবে থেকে জমিয়ে রেখেছি, অথচ তোমাকে বলাই হচ্ছে না। মিসেস জনসন ও মিঃ স্টার্ডি দুজনেই তোমাকে এমন আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে স্বামীজীকে পত্র দিয়েছেন যে স্বামীজীর মন ভরে গিয়েছে। আমার মনে হয় তোমার অনুরোধে আয়োজিত 'Purity Meeting'-এ স্বামীজীর বক্তৃতা তাঁকে তোমার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করেছে। মিসেস বুল একথাও স্বামীজীকে দু-তিনবার বলেছেন যে, তাঁর মতে এ-পর্যন্ত স্বামীজী যত বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে ওটিই সর্বোত্তম।

স্বামীজীকে ঘিরে মিসেস বুলের ভারি সুন্দর একটা নিজস্ব ভাব আছে। তাঁকে এক একজন এক একভাবে দেখে—তাদের ভেতরের ভাবটি লক্ষ্য করতে আমারও ভারি ভালো লাগে। যেমন তোমার কাছে তিনি গুরু (Master) বা আচার্য, আমার কাছে 'রাজরাজেশ্বর' (King), আর মিসেস বুলের চোখে 'শিশু ভগবান' (Sistine Child)। এটি কী সুন্দর ভাব, তাই না? কথাটি উচ্চারিত হওয়ামাত্র সকলেই সাদৃশ্যটি ধরতে পারে।

এবার আমি এমন একটা কথা বলব যে, তুমি একেবারে অবাক হয়ে যাবে। আমি এক সপ্তাহের জন্য বহুদূরে হিমালয়ের উচ্চশিখরে গিয়েছিলাম—আঠারো হাজার ফুট উচ্চতায়। 'স্বামীজীর সঙ্গে হিমবাহ দেখতে গিয়েছিলাম'— এইটুকুই সকলকে জানাব। বাকি কথা যা লিখব তা তুমি কাউকেই বলবে না। আসলে এটি ছিল একটি তীর্থযাত্রা—অমরনাথের গুহাভিমুখে। তিনি আমাকে সেখানে শিবের কাছে উৎসর্গ করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

তাঁর পক্ষে সেটি ছিল এক পরম মুহূর্ত। তিনি সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হয়ে যান, যদিও সেখানে ছিলেন মাত্র দু-মিনিট। যাতে প্রবল ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে না পড়েন, তাই গুহা থেকে তিনি দ্রুতপদে বেরিয়ে আসেন। স্বামীজী অত্যন্ত পরিশ্রান্তও হয়েছিলেন, কারণ পায়ে হেঁটে তাঁকে দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল কঠিন চড়াই অতিক্রম করতে হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রও ছিল দুর্বল। কিন্তু অমরনাথের সাক্ষাৎদর্শনের পর থেকে তুমি যদি তাঁর বিশ্বাস, সাহস ও আনন্দ দেখতে! তিনি বললেন, এখানে শিব তাঁকে অমরত্বের বর দিয়েছেন। সুতরাং তিনি নিজে ইচ্ছা না করলে তাঁর মৃত্যু হবে না।.আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই ভেবে যে, সেসময় আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। জীবনে এ এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি, নয় কি? আর আমাকেও তিনি শিবের কাছে উৎসর্গ করে দিলেন। অবশ্য হিন্দুধারায় যাকে উৎসর্গ করা হয় তার কোনও ভূমিকা থাকে না। কিন্তু তিনি আমাকে যখনই কথাটা বলেছেন, তখন থেকে আমি প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠছি।

আমি তাঁর অনুভূতির কথা জেনে গভীরভাবে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু যিনি তোমার পূজ্য, তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও, যদি তুমি শুধু নৈসর্গিক শোভাই আস্বাদন কর এবং তার থেকে গভীরতর অনুভূতির সন্ধান না পাও—ওঃ প্রিয় নেল, তবে সে যে কী মর্মান্তিক যন্ত্রণা!! স্বামীজী তো আমার জন্য সেই দিব্য অনুভূতিকে জীবন্ত করে দিতে পারতেন! কিন্তু তিনি নিজেই গভীরভাবে মগ্ন হয়ে গেলেন।

এখনও পর্যন্ত যখনই সেই সময়ের দিকে তাকাই, অসহ্য মনঃকষ্টে হতাশার অতলে তলিয়ে যাই। কিন্তু আমি জানি, এটা আমারই ভুল। স্বামীজী কিন্তু আমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছেন। ওই তীর্থযাত্রার পর থেকে আশ্চর্যভাবে আমি স্বামীজীর এবং ঈশ্বরের নিকটতর সান্নিধ্য লাভ করেছি। কিন্তু হায়, যে-সুযোগ হারালাম, তা আর কিছুতেই ফিরে আসবে না। সেটি হারানোর অভিজ্ঞতা যে কতখানি তিক্ত! আমি তাঁর ওপর এতই রেগে গিয়েছিলাম যে তিনি কথা বলতে চাইলেও আমি কিছুতেই শুনতে চাইনি।

নেল, আমি জানি তোমার নির্ভীক প্রাণে আমার জন্য একটু শান্তি ও সান্ত্বনা থাকবে—কেবল আমি যদি তখন স্বামীজীর কাছে এতটা বেসুরো হয়ে না বাজতাম! একটু ধৈর্য ও সহানুভূতি সহায়ে আমি যদি নিজেকে সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার করতে পারতাম! কিন্তু হায়, আর তো এই সুযোগ ফিরে পাওয়া যাবে না। একমাত্র সান্ত্বনা, এতে কেবল আমারই ক্ষতি—কিন্তু কী ভয়ানক সে ক্ষতি!

দেখো, আমি স্বামীজীকে এমন কথা বলেছিলাম—তিনি যদি 'আচার্য' শব্দটিকে যথার্থ করে না তোলেন, তবে তাঁর মনে রাখা ভালো যে, আমাদের সম্পর্ক সেক্ষেত্রে অর্থহীন—সাধারণ আর পাঁচটা মানুষের মতন। এভাবে তাঁকে তিরস্কার করে নিজেকে যেন (শামুকের মতো) শক্ত খোলের ভেতর গুটিয়ে নিলাম।

এ-ব্যাপারে স্বামীজী ছিলেন অসাধারণ। তিনি তিলমাত্রও রাগ করলেন না, শুধু আমার ছোটোখাটো সুবিধার জন্য আরও বেশি মনোযোগী হলেন। মনে হয়, তিনি ভাবলেন আমি অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত। কেবল নিজের বিষয়ে আর কিছু বলতেন না। পরদিন সকালে ফেরার পথে যখন এলেন তখন বললেন, "মার্গট, তুমি যা চাইছ, সেইভাবে তোমাকে উপলব্ধি করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, কারণ আমি তো রামকৃষ্ণ পরমহংস নই।" এ এক পরিপূর্ণ অহংশূন্যতা যা তুমি কখনও দেখোনি। কারণ এ-ব্যাপারে তিনি এতটুকু সচেতন নন। তুমি তো জান, আমাকে এই যন্ত্রণাভোগ করতেই হবে। কারণ এটি ভিন্নজাতীয় অভ্যাসের ফল। আমার আইরিশ প্রকৃতি সবকিছু প্রকাশ করতে চায়, যা হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবে না। স্বামীজীর আচার্যের ভূমিকা নিতে খুবই সংকোচ, আর আমি তাঁর কাছ থেকে ওইটি পাওয়ার জন্যই ব্যাকুল—এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে। এখানেই আমার চরম স্বার্থপরতা। মনে রেখো, বেশির ভাগ লোককে আমি বলব, আমি হিমালয়ের উচ্চ শিখরে গিয়েছিলাম,

কিন্তু তোমাকে যা বলেছি তার কিছুই অন্য কাউকে জানাব না। আমার এই তীর্থযাত্রার কথা কখনও কারও কাছে প্রকাশ কোরো না।

তোমার দর্শনের কাহিনীটি বড়ো সুন্দর—আর 'আমাদের উচ্চতম চেতনার আদান-প্রদান' এই কথাটিও এক অমূল্য সম্পদ। আমি জানি না তুমি ধ্যানের সময় বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে আসন করে বসা পর্যন্ত এগিয়েছ কিনা। আমি ইংল্যান্ডে থাকতে এটিকে কোনও গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এখানে যে-কেউ এভাবে সহজেই বসতে পারে। আর এমনটা করার সার্থকতাও আছে। এ-বিষয়ে স্বরূপানন্দ আমাকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন। ধ্যান মানে একাগ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি বিন্দুতে সমগ্র চেতনাকে একীভূত করা। কিন্তু জান, সূক্ষ্ম একটি চৌম্বক পরিমণ্ডল আছে যাতে মনঃসংযোগ করা সহজ হয়ে যায়—সুতরাং বাহ্য উপকরণেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও পশুর চামড়ার (যেমন হরিণের চামড়ার) আসনে বসলে সত্যিকারের সাহায্য হয়। এটা পারিপার্শ্বিকতা থেকে সাধককে বিচ্ছিন্ন করে—এবং ওই চৌম্বকশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। স্বামীজী কিন্তু এসব ধারণা সহ্যই করতে পারেন না। কারণ এর ফলে বাহ্য বিষয় অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে যাবে।

স্বরূপানন্দ বলেন, "তোমার সমস্ত মনকে এক সেকেন্ডের জন্যও যদি একাগ্র করতে সফল হও, তো তুমি জিতে গিয়েছ—বাকি সবকিছু আপনিই আসবে।" কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে মহান চিন্তা বা ভাব মনে জাগতে থাকে। তবে শুধুমাত্র 'পূর্ণ নিস্তব্ধতা'র অনুভূতিই যদি হয়, সেটি কি বিস্ময়কর নয়? তুমিও কি তাই মনে কর না? একে মেটারলিঙ্ক বলেন, 'গভীর সক্রিয় নৈঃশব্দ্য।'

আমার এই চেতনার গভীরে তলিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি, যদিও আমি দু-একবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এমনটি হয় বলে শুনেছি।

সম্প্রতি একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী আমাকে বলেছেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় দুটিমাত্র বিষয় ধ্যানের জন্য রাখা উচিত—গুরু এবং তাঁকে ছাড়া চাই একটি নির্দিষ্ট মূর্ত বিষয়। সর্বদা কোনও প্রতীক বা ছবির সামনে বসা চাই যাতে সমস্ত মনটি ওই ভাবে ভাবিত হয়ে যায়। মূর্ত বিষয়টির ওপর ধ্যানাভ্যাসের পর একজন নিরাকারের ধ্যান করতে সক্ষম হয়।

এইসব টুকরো টুকরো খবরে কি তোমার আগ্রহ আছে? আমি সহজে পাইনি বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সম্ভবত তুমি

অনেকদিন আগে থেকে এসব জান। আরও কিছু তোমাকে বলার ছিল—কিন্তু এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না—ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—প্রাণায়ামের কথা। একদিন রাত্রে আমার প্রায় দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম—অনেকক্ষণ ধাতস্থ হতে পারিনি। তখন শান্ত হওয়ার জন্য মনের জোরে চেষ্টা করতে লাগলাম। আর অচিরেই দেখলাম, অজ্ঞাতসারে আমার সেই অবস্থা হচ্ছে, যাকে ওরা কুম্ভক বলে। আমি সম্পূর্ণরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম। এটা খুবই আশ্চর্য, কেউ যখন কোনও আলোর ঝলক দেখতে পায়, তখনই সে নির্জনতার প্রয়োজন অনুভব করে এবং আরও অনেককিছু বুঝতে পারে যা আগে ছিল কেবল শোনা কথা।

এবার আমি থামব। এই চিঠি তোমার ও মিঃ হ্যামন্ড—দুজনের জন্য লিখছি। চিঠিখানি তোমার মতো সুন্দর ও নিঃস্বার্থ ভাবের হলে বেশ হত।

তোমার ভালোবাসার

নিবেদিতা

পুনশ্চ—আশা কবি তোমার সময় খুব ভালো কেটেছে।

॥ দুই ॥

১৩ অক্টোবব, ১৮৯৮

বৃহস্পতিবার

আমি আজ বসেছি তোমাকে শুধুমাত্র স্বামীজী সম্পর্কে আরও কিছু কথা শোনাব বলে, অথচ কী করে যে আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না। তিনি গতকাল এখান থেকে চলে গিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে লাহোরে তাঁর দেখা হতে পারে আবার কলকাতা পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত নাও দেখা হতে পারে।

পনেরো দিন আগে একাকী চলে গিয়েছিলেন আবার যখন আটদিন পরে ফিরে এলেন তখন তিনি ঐশীভাবে অনুপ্রাণিত সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না কারণ তাঁর সেই ভাব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাহলে আমার কলমকে নিঃশব্দে কথা বলা শিখতে হবে।

তিনি শিশুর মতো মায়ের কথা বলছিলেন—অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বর ছিল দেবতার মতো। তাঁর এই ভাবগম্ভীর ও আনন্দময় উপস্থিতির প্রভাব আমাকে নির্জনে সরে গিয়ে সারাক্ষণ একান্তভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে প্রেরণা দিচ্ছে।

"আমরা নক্ষত্রের উৎস দেখেছি, এবং তার কিছু তাৎপর্যও জেনেছি।"

এই অনুভব, যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন এবং সেই দিব্যদর্শনে ভরপুর হয়ে আছেন, একমাত্র তাঁর সান্নিধ্যের গুণেই সম্ভব। এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে লোকসেবার কাজ যেন অসম্ভব! "একমাত্র মা-ই" সব করেন। (নির্জনবাস থেকে) ফিরে এসে বললেন, "স্বদেশপ্রেম বা আর সবকিছুই ভ্রান্তিমাত্র। সবই কেবল মা...। সব মানুষই ভালো, কেবল আমরা সকলের কাছে পৌঁছাতে পারি না। আমি আর শিক্ষা দিতে যাব না। অপরকে শিক্ষা দেওয়ার আমি কে?"

নীরবতা, তিতিক্ষা ও অন্তর্মুখীনতা এখন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এই অন্তর্মুখ অবস্থা ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এ যেন এমন অবস্থা যখন মনে হয়—সচেতন ভাবে মাকে শরণ না করলে প্রতিটি মুহূর্ত বিফল হয়ে যায়।

* * *

সেই অনুপম গ্রীষ্মের দিনগুলির দিকে যখন ফিরে তাকাই আমি অবাক হয়ে ভাবি কী করে আমি এমন দুর্লভ উচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছিলাম। ওই সময় এক গভীর ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে আমরা ছিলাম আর সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বর আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

গতকাল সকালের শেষ কয়েক ঘণ্টা যখন তিনি মায়ের গান গাইছিলেন আর আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম, এমনকি সামান্য নড়াচড়া করতেও সাহস করিনি।

এখন তিনি প্রেমের মূর্তবিগ্রহ। এমনকি তিনি অত্যাচারী বা অপরাধীর ওপরও বিরূপ হতে পারছেন না। সবই এখন শান্তি, আত্মত্যাগ ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ। "স্বামীজী আর নেই, চিরতরে চলে গেছেন"— একথাগুলোই তাঁর মুখে শেষ শুনেছিলাম।

॥ তিন ॥

[কিছু পাতা পাওয়া যায়নি]

১৩ অক্টোবর, ১৮৯৮

'মৃত্যুরূপা মাতা' কবিতাটি লেখার সময় থেকেই তিনি গভীর ভাবাবেশে পূর্ণ ছিলেন। শেষে তিনি কাউকে না জানিয়ে একাকী পবিত্র তীর্থ ক্ষীরভবানীর

উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে আটদিন ছিলেন—তারপর এক বিকেলে যখন ফিরে এলেন তাঁর মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত—তাঁর মুখের সেই ভাব দেখে মনে হল নিশ্চয় সেখানে অপার্থিব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন—যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি সারাক্ষণ মায়ের কথা বলছিলেন আর এ-ও বলছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরতে চান।

সেসময় থেকে আমরা তাঁকে খুব কমই দেখতে পেতাম। একা থাকতেন। আর বলতেন, "আমি তো মায়ের কোলের শিশুমাত্র।" আমি কী করে তোমায় সেসব কথা বোঝাব! কিন্তু এখানে থাকলে তুমি যে ভাবে সবটুকু অনুভব করতে আমি সেভাবেই তোমাকে জানাতে চাই। আমি মনে করি, তুমি আমার কথাগুলোকে নিছক সংবাদ বলে নেবে না, এগুলি তোমার কাছে অতি পবিত্র বিষয় হবে।

আমি অনুভব করছি, এক অপার্থিব ভাবাবেগ তাঁকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। তিনি হয়তো আর কোনওদিনই পাশ্চাত্যে যাবেন না, এমনকি শিক্ষাও দেবেন না। তাঁর এই মৌন-অবলম্বন বা চির উপরতিতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবিকই তাঁর ক্ষেত্রে এটা শক্তির পরিচায়ক নয়, নিজের এই ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। আমার বিশ্বাস, একদিন এই ভাবটিও কাটিয়ে উঠবেন। আবার বিশ্বের সামনে শান্তি ও জ্ঞানের মহান উৎস হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁর আগের সংগ্রামী মনোভাব, মজা করার প্রবণতা—সব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে এখন এক বিশ্বব্যাপী বিরাট আত্মার শান্ত, মহান ভাব ফুটে উঠছে—যিনি যন্ত্রণায় কত ক্ষতবিক্ষত, তবু প্রেমময়। সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশে একটি শব্দ উচ্চারণ করাও যেন অপরাধ। অথচ মজার কথা হল এই যে, তাঁর সামনে রসিকতা করতে বা কোনও সরস গল্প বলতে বাধত না আর সেসব শুনে আমরা সকলে হাসতাম। তা না হলে সেই দিব্যভাবময় পরিবেশে সকলেই প্রায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে থাকত। তোমাকে কি আমি আরও একটু বলব? শেষ যে কথাটি তাঁর মুখে উচ্চরিত হয়েছে তা হল : "স্বামীজী চিরদিনের মতো চলে গেছেন, আর ফিরবেন না, আর জেনে রাখো, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা এক ধরনের আশীর্বাদ।"

স্বামীজীর মুখে কারও বিরুদ্ধে কোনও রূঢ় ভাষণ ছিল না। এইরকমই একটা মহান উচ্চ অবস্থায় খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

তিনি বলেছেন—'মৃত্যুরূপা মাতা' কবিতায় বর্ণিত প্রত্যেক অবস্থার অভিজ্ঞতাই তাঁর হয়েছে। আর গতকাল এর অংশবিশেষ আমাকে দিয়ে আবৃত্তি করালেন।

তিনি বলছিলেন এবং যেহেতু তিনি শুধু মায়ের কথাই বলছিলেন, মনে হচ্ছিল এক একটা শব্দের মধ্য দিয়ে অনন্তের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। চলে যাওয়ার আগে আমার অন্তরকে জগন্মাতার নিত্যসান্নিধ্যে যেন পূর্ণ করে গেলেন। গতকাল তাঁকে আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলাম না। আমরা—তুমি আমি সবাই—এক মহান ছন্দের অংশ যা আমাদের ধারণার চাইতে অনেক বড়ো; ঈশ্বর করুন আমরা যেন নিজের জায়গার উপযুক্ত হতে পারি।

তিনি গাইছিলেন... "শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি ভবসংসার বাজার মাঝে... ঘুড়ি লক্ষের দুটি একটি কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।।"

"পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধূলি লয়ে" ইত্যাদি।

রবিবার আমাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, "এইসব দেবতার রূপ কেবল সূর্য ও প্রকৃতি সম্পর্কিত পুঁথি-পুরাণে বর্ণিত আছে তা নয়, তাঁদের শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা দর্শন পাওয়া যায়।

॥ চার ॥

১৬ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
৯ মার্চ (১৮৯৯)

প্রিয় নেল,

তোমার সুন্দর চিঠিখানির জবাব এক্ষুণি না দিলে তার মজাটাই মাটি হয়ে যাবে। তাই হাতে অজস্র কাজ থাকা সত্ত্বেও লিখতে বসেছি।

ভারি চমৎকার চিঠি লেখ তুমি। বলো তো এমন করে লিখতে কোথায় শিখতে পারি? সামান্য সাংবাদিকতার সাহায্যে কি শেখা সম্ভব? মনে হয় না, কারণ লেখার শৈলীর চেয়ে ভাবটাই যে বেশি সুন্দর।

গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় তোমার চিঠিখানি নিয়ে শ্রীমার (সারদা দেবী) কাছে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গিনীদের শোনালাম।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝেই তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে 'আহা' বলে উঠছিলেন এবং বিশেষ এক ভঙ্গিমায় আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। এসব ভাব যে কী গভীরভাবে তাঁদের মনকে স্পর্শ করে তা বোঝাতে পারব না। একটিমাত্র চিঠি লিখে তুমি যে কতখানি করলে! এখানেই শেষ নয়,—তোমার চিঠি যখন এল তখন এখানকার বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের অল্পবয়স্ক দুজন বসেছিল। কারণ, আমরা সবাই মঠে স্বামীজীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের জন্য যাচ্ছিলাম। এখানে বলে রাখি, এই অভিজাত পরিবারটি এতকাল সবকিছু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। অতি সম্প্রতি আমাদের আপনজন হয়ে উঠেছেন। তোমার চিঠির দু-একটি অংশ শোনামাত্রই তাঁরা অভিভূত। আর দেখো, ওঁদের মধ্যে একজন মেয়ে ও আর একজন ছেলে—সম্পর্কে ভাই-বোন—ওঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য সম্পর্কে এই অন্তঃপুরবাসিনীদের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। তাই ওঁদের কাছে তোমার চিঠির এত কদর !

তোমার জন্য শ্রীমায়ের কাছে একটু আশীর্বাণী প্রার্থনা করলাম। মা তাঁর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন তোমাকে। তিনি তোমাকে সত্যিই তাঁর মেয়ে মনে করেন। কিন্তু এর থেকে বেশি অভিব্যক্তি কিছু আশা কোরো না। ভাবকে চিন্তার জগতে আনার প্রয়োজনীয়তা এঁদের কাছে ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এঁদের অনুভূতি অত্যন্ত গভীর কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ কম। কোনও ভিনদেশির মনে সাড়া জাগানোর মতো নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করার অভ্যাস এঁদের নেই।

অনুভূতির ক্ষেত্রে শ্রীমার গভীরতা অসীম। মার ওই ছবিখানির কথা জান তো? সেই প্রথম মা চোখ তুলে তাকিয়েছেন বয়স্ক কোনও অপরিচিত পুরুষের (ফোটোগ্রাফারের) দিকে—প্রথম দাঁড়িয়েছেন অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টির সামনে। অথচ দেখো, আত্মসচেতনতার লেশমাত্র নেই তাঁর চোখেমুখে। বিয়ের সময় মার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ। বিয়ের পর থেকে তাঁকে অনবগুণ্ঠিতা দেখেননি কেউ—না স্বামীজী, না স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। পুরুষভক্তেরা আসেন অন্তঃপুরের দরজায় তাঁর পাদপূজা করতে। দাঁড়ান দোরগোড়ায় বা দৈবাৎ কখনও ঘরের ভিতরে। তখনই মায়ের মাথায় নামে ঘোমটা। যদিও মাঝে মাঝে ঘোমটা এমন বড়ো করে টেনে দেন যাতে তাঁর নতদৃষ্টি সত্ত্বেও ফাঁক দিয়ে একনজরে তিনি তাদের দেখে নিতে পারেন। এই নিয়ে মাকে কতই না

ক্ষেপিয়েছি। এখনও দরজার বাইরে কোনও পুরুষভক্ত এসে দাঁড়ালে আমার কথাগুলো মনে পড়ায় হাসির দমকে মা নিঃশব্দে কাঁপতে থাকেন।

কিন্তু ব্যাপারটি খুবই মজার হয়। কোনও পুরুষভক্ত মাকে দর্শন করতে এলে মার কোনও সাধুসন্তান বা ভৃত্য কেউ একজন সিঁড়ির শেষ ধাপ অবধি এসে জোরে হেঁকে বলে—'অমুক এসেছে মাকে প্রণাম জানাতে।' অমনি সারা ঘর নিশ্চুপ হয়ে যায়, কথাবার্তা থেমে যায়, এমনকি হাতের পাখাও থেমে যায়, মাথার ঘোমটা নেমে আসে—পরনের শাড়িখানি সর্বাঙ্গ ঘিরে ফেলে। ঘরের মাঝখানে মেঝেতে হয়তো কোনও মহিলা বসে আছেন—তাঁর পিঠ দরজার দিকে ঘুরে যায়। সবই ঘটে কী নিঃশব্দে! পুরুষভক্তেরা এসে দাঁড়ান দরজার বাইরে, মার উদ্দেশে মাথা ঠেকান দোরগোড়ায় বা ভিতরে এসে মার পায়ে প্রণাম করেন। হয়তো কোনও ভক্ত সদ্য এসেছেন কলকাতায়, মার জন্য কিছু হাতে করে এনেছেন অথবা কোনও ভক্ত বাইরে কোথাও যাবেন—যাওয়ার আগে মার আশীর্বাদ নিতে এসেছেন। মা জিজ্ঞাসাবাদ করেন নিচুগলায়—পাশে বসা মহিলাটি (সাধারণত গোলাপ-মা) মার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। তারপর পুরুষভক্তটি মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালে মা-ও হাত তুলে আশীর্বাদ করেন আর ভক্তটিও তখন খুশি হয়ে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া বদলে যায়, ভাবভঙ্গি সব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আবার কথাবার্তা এবং হাতপাখা নাড়ানো শুরু হয়, মাথার ঘোমটাও খুলে যায়। গোটা ব্যাপারটি ভারি মজার লাগে আমার।

একবার ভাবো দেখি মায়ের কথা! কী অসামান্য আত্মবিলুপ্তি! ভাবলে অবাক লাগে। মাথার ঘোমটাটি না খসিয়ে, পলকের জন্যও তাঁকে মুখখানি না দেখিয়ে, নিরন্তর স্বামীর সেবা করে গেলেন! কেন এই আড়াল? তাঁর মুখখানি মনে পড়লে পাছে স্বামীর সাধনায় বিঘ্ন ঘটে তাই? তাই কি নিজেকে এমন আড়াল করে রাখা?

নেল, তুমি তো জান আমার আপন পরিবারের লোকদের প্রতি আমি কী নিষ্ঠুর ব্যবহার করে চলেছি। দিন দিন ওরা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার মনপ্রাণ যে এখন ক্রমশ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে, এসব কথা আমি ওদের লিখব কী করে! ওরা যেসব পারিবারিক বা সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে চিঠি লেখে সেইরকম ব্যাপার আমার এখানে তো কিছু নেই। আমি লেখার মতো কথা খুঁজে পাই না। তাই আমার চিঠিতে লেখার বিষয় ক্রমশ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আমি কী করব বলো!

মা কালী প্রসঙ্গে আমার বক্তৃতার একখানা কপি তোমাকে পাঠানোর ইচ্ছে আছে। দেখি, যদি জোগাড় করতে পারি। তুমি কিন্তু এই ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় বলে জানবে। উইম্বলডনের গোঁড়া সম্প্রদায়ের কানে কথাটা পৌঁছে গেলে নিম-এর ক্ষতি হতে পারে। পরে একসময় হয়তো তাঁরা জানতে পারবেন। আশা করি ততদিনে নিম জীবনে দাঁড়িয়ে যাবে।

লোকে অবশ্য আমাকে রেহাই দিচ্ছে না—আক্রমণ চলছেই। একটা কথা ওরা ভুলে যাচ্ছে—আগে তো মা কালীর পুজো, তারপর রামকৃষ্ণভাবের উপলব্ধি। সে উপলব্ধি হয়তো হবে সহস্রাব্দ পরে। ততকাল মা কালীর পুজো চলতেই থাকবে—চলবে নিরবধিকাল। কালী বা 'স্বর্গস্থ পিতঃ' যে নামেই ডাকি না কেন, তিনি সাড়া দেবেনই, যেমন তোমার নাম করলে তুমি সাড়া দাও। ভয়-ভক্তিতে বা ভালোবাসায়, তাঁকে ডাকলেই হল—তাঁর সাড়া মিলবে।

আর বলিদানের ব্যাপারে বলব—অনভ্যস্ত চোখে এসব ব্যাপার অরুচিকর ঠেকতে পারে, মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মেও তো এসব ছিল—এখন না হয় পার হয়ে এসেছে সে যুগ। ইহুদির ধর্ম (বলিদান) এবং যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা কি অনুরূপ ব্যাপার নয়? কালীপুজোয় বলিদানের প্রথা প্রচলিত থাকলেও সব পুজোয় বলিদান আবশ্যিক নয়। তাছাড়া সাধনমার্গে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই এসব বিধি-বিধান অবান্তর হয়ে পড়ে।

মূল কথা হল, ভারতে ধর্মের ক্ষেত্রে নিজের রুচি অনুযায়ী চলা যায়। তবে সবরকম ভাবনা এবং অনুষ্ঠানেরই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে যাতে তুমি তোমার ভাবের অনুকূলে অধ্যাত্মপথ বেছে নিতে পার।

বড়ো আশা করে আছি, তুমি আসবে—ফার্ম কলোনি গড়ে তুলবে। এসবের জন্য তোমাদের মতো লোকেদেরই তো দরকার। ভাবী কালে যারা প্রচারের কাজে যোগ দেবে তারা হবে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাদের হতে হবে শিক্ষাদাতা। তারা দেবে, আবার নেবেও।

এমন একদিন আসবে যখন ইংল্যান্ড আর ভারত মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। সেদিনটি আমরা হয়তো চোখে দেখে যাব না। তবু দুই দেশ এক হবেই—আমি নিশ্চিত জানি হবে।

দুই দেশকেই তুমি ভালোবাস জেনে কী যে ভালো লাগছে! কাকে বেশি ভালোবাস বলো তো? দুটি দেশ মিলে অনেক অভাব মিটিয়ে দিচ্ছে তাই নয়

কি? নিজেকে স্বামীজীর কন্যা জেনে আমি যতটা খুশি, য়ুমের বান্ধবী জেনেও প্রায় ততটাই।

বর্তমানে স্বামীজীর স্বাস্থ্য অনেকটা ভালো—তিনি এখন পাশ্চাত্যে যেতে বিশেষ আগ্রহী। আশা করছি এপ্রিল মাসে রওনা হতে পারবেন। স্টার্ডিকে লিখেও দিলাম।

স্বামীজী তোমার চিঠিখানি পড়েছেন—যেসব চিঠির জন্য তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করেন, এটা তার অন্যতম। অনেকে জানেই না তাদের তিনি কত ভালোবাসেন আর তারা সরাসরি তাঁকে চিঠি লিখলে তিনি কত খুশি হন!

ভালোবাসা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি এখনকার মতো। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখো।

নিবেদিতা

পুনশ্চ : মনে পড়ে কি—সেবার গ্রাহাম রোডে যখন আমি 'ভারতীয় যোগী'র কথা বলেছিলাম তখন জি—কেমন করে বলে উঠেছিল : "আমি বলছি, দেখো—যেখানে আমরা কেউ নেই সেখানে তুমি ঘটনাকে বড়ো বাড়িয়ে বল।" আর এখন দেখো, সেই ভারতীয় যোগীটি আমাদের জীবন কতখানি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন!

জীবনব্রত

ভারতবর্ষে এসে নিবেদিতা শ্রীগুরুর নির্দেশিত কাজে অগ্রসর হন। ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮ কালীপূজার পুণ্যদিনে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন স্বয়ং শ্রীমা সারদা দেবী। বিদ্যালয় শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই নিবেদিতা দেখলেন পরিস্থিতি ক্রমেই কঠিন ও প্রতিকূল হয়ে উঠছে। তীব্র অর্থাভাবের মধ্যে বাগবাজারের অতিসাধারণ, অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে ভগিনী নিবেদিতার একক সংগ্রামের কোনও তুলনা ছিল না। অন্যদিকে তিনি দেখেছিলেন নিরন্ন ভারতবাসীকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখসমৃদ্ধির প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণে খ্রিষ্টীয় সমাজ সক্রিয়। ব্রিটিশ শাসনের এই দিকটি নিবেদিতার অজ্ঞাত ছিল। স্বামীজী এই ব্যাপারে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন। তিনিও মর্মাহত।

ইতিমধ্যে কলকাতায় প্লেগ মহামারীর রূপ নিয়েছে। এই সঙ্কটকালে স্বামীজীর প্রেরণায় বিদেশিনী মার্গারেট এগিয়ে এসেছেন সেবাকাজে। পল্লীর দরিদ্র প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে তাঁর প্রবল আগ্রহ।

মঠ-মিশনের শুভানুধ্যায়ী এবং নিজের বিশিষ্ট বান্ধবী মিসেস সারা বুলের কাছে লেখা প্রথম পত্রে নিবেদিতা কয়েকটি কথার আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব—একদিকে তিনি এদেশের মানুষের সেবা ও স্ত্রীশিক্ষার কাজে নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করতে ব্যাকুল, অন্যদিকে চরম আর্থিক অনটন—মনে আশঙ্কা, হয়তো তাঁকেও স্বামীজী বিদ্যালয়ের কাজ স্থগিত রেখে ইউরোপে ফিরে যেতে বলবেন। সেইসঙ্গে নিবেদিতা এও লিখেছেন মৃত্যুপথযাত্রী প্রাণপ্রতিম গুরুভাই যোগানন্দ স্বামীর সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা, নিজেদের ভগ্নস্বাস্থ্য, মঠ-মিশনের সর্বত্র আর্থিক সঙ্কট ইত্যাদি বহু সমস্যা সত্ত্বেও স্বামীজীর সমগ্র হৃদয় জুড়ে রয়েছে স্বদেশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা।

পরের দুটি পত্র মিস ম্যাকলাউডকে লেখা। নিবেদিতার কয়েকশত পত্রের অধিকাংশই এঁকে লেখা। বলা বাহুল্য পত্রগুলির বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে ছিলেন স্বামীজী। এই পত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এর মধ্য দিয়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী নিবেদিতার অন্তরতম সত্তার পরিচয় ঘটে। আর পাওয়া যায় সমকালীন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা—যা রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস।

১৮৯৮-এর ২৫ মার্চ দীক্ষাদানকালে স্বামীজী মার্গারেটের নাম দিয়েছিলেন 'নিবেদিতা'। ঠিক তার একবছর পর তিনি নিবেদিতাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন—এই দিনটির একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ আমরা পাই শেষোক্ত পত্রটিতে।

॥ পাঁচ

১৬ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
[৬ মার্চ, ১৮৯৯]
বুধবার, সন্ধেবেলা

প্রিয় গ্র্যানি,

কয়েক মিনিট আগে, না, বোধ হয় এক ঘণ্টা আগে, ভারত ও পৃথিবী সম্বন্ধে আমি এতটাই হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম যে শুয়ে শুয়ে 'The Master Builder' বইখানা পড়তে শুরু করলাম এবং সেইসঙ্গে চায়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু এখন আমি সুরাপানে চাঙ্গা অসুরের মতন। চার-পাঁচ স্লাইস মোটা মোটা মাখন-মাখানো পাঁউরুটির শক্তিতে উঠে বসে চিঠি লিখছি।

স্বামীজী এখন নিজের মঠে আছেন। ফলে আমি যেন আমার বাবাকে ফিরে পেয়েছি, যাঁকে হারিয়েছিলাম যখন আমার বয়স দশ বছরও হয়নি। বাস্তবিকই তিনি এখন খুব শান্তিতে আছেন—আহা, কী শান্তি, মাধুর্য, শক্তি!

ভারতবাসীকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার বিষয়টি নিয়ে স্বামীজী গতকাল নিজের মনের কথা বলেছেন বলে শুনেছি। একি সত্যি হতে পারে—মিশনারিরা নাকি যুক্ত মূলধন (জয়েন্ট স্টক) নিয়ে নতুন উদ্যমে কোম্পানি

খুলছে? ‘ইন্ডাস্ট্রীজ’ কিনছে? জোর করে সেইসব সংস্থার কর্মীদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করছে? একি কখনও সত্যি হতে পারে? উঃ, কী ভয়ানক লজ্জার কথা! “হে যিশুখ্রিষ্ট! তোমার নাম নিয়ে কী কাণ্ডই না হচ্ছে!” মাদাম রোলাঁ শুনলে নিশ্চয় এই কথাই বলতেন।

শুনেছি গতকাল স্বামীজী স্বগতোক্তি করেছেন : “কীভাবে আমরা জনসাধারণের ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করতে পারি! অবশ্যই সব থেকে আগে প্রয়োজন আহারের সংস্থান। কেমন করে তা করব?”—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর এসব কথা শোনার পর অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এখন আমার কাছে ঠাকুরের কথার অর্থ টেনে স্বামীজীর ওই ব্যাখ্যাটাই স্পষ্ট হচ্ছে : “ ‘সব ধর্মই সত্য’—একমাত্র এই বিশ্বাস ভারতবাসীকে ধর্মান্তরগ্রহণের গ্লানি থেকে বাঁচাতে পারে। তারা খ্রিষ্টান হলেও আপত্তি নেই যদি তারা নিজের সবটাই বজায় রাখে আর পরিবর্তে দু-মুঠো খেতে পায়, সেইসঙ্গে সহানুভূতি।” কিন্তু সত্যি বলতে কি, এর কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা বেশ কিছু যুবককে উদ্দীপ্ত করতে পারি, যারা জনকল্যাণ ও মানবিকতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে সর্বত্র সাম্যভাব ছড়িয়ে দেবে।

স্বামীজী আমায় বলেছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই বক্তৃতা দিতে হবে। সেজন্য যেসব শক্তি বর্তমান জগতকে আলোড়িত করছে, সেগুলো নিয়ে আমিও ভাবছি—বাগ্মিতার দ্বারাও কিছু কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে। এইভাবে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।

[কিছুক্ষণ পরে]

একটু আগে তাঁকে দেখলাম। তিনি বললেন, “আমি এখন আবার কাজের মেজাজে ফিরে এসেছি।” স্বামী সারদানন্দকে অর্থসংগ্রহের জন্য বম্বে যেতে হবে। স্বামীজী নিজেই মঠের কাজ চালিয়ে নেবেন। সকলকেই বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিছু ছেলেকে মাধুকরী করতে পাঠাবেন কারণ তাদের ভরণপোষণের ভার নেওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বামীজীর মনে ভয়ানক সংগ্রাম চলছে। যোগানন্দের অসুস্থতা এবং তাঁর নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য বাড়তি খরচের বোঝা ঘাড়ে পড়েছে। যোগানন্দ স্বামীর জন্য প্রতিদিন প্রায় দশ টাকা খরচ হচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, তিনি নিজে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর শিষ্যেরাও সেই অপরিসীম কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে যাক, তা তিনি কখনওই চান না। মানুষ তৈরি করা তাঁর ব্রত। কিন্তু তাঁর

ধারণা—খাওয়া-পরা ও একান্ত প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটিয়ে দিলে কাজ আরও ভালোভাবে হবে। অপরিণত মনের পক্ষে অতিরিক্ত কঠোরতা ক্ষতিকারক। বুঝতে পারছি, তাঁর এইসব কথা কতখানি সত্য—কত ভয়ংকরভাবে সত্য।

এর আগে সপ্তাহে দুদিন করে মঠে পড়াতে যেতাম। এখন খরচ কমানোর জন্য সপ্তাহে একদিন যাচ্ছি।

ঘুরেফিরে ভারত ও ভারতের জনসাধারণের জন্য তিনি চিন্তা করেই যাচ্ছিলেন। তাঁর মন বিভিন্ন দিকে এত দ্রুত ধাবমান হচ্ছিল যে, আমি কদাচিৎ তাঁর চিন্তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলাম।

অন্নসংস্থানের জন্য নতুন কী উপায় করা যায়, কীভাবেই বা কলোনি গড়ে উঠবে, মানুষ তৈরি করার প্রারম্ভিক শর্ত হিসেবে কীভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হবে, ভারতের প্রাচীন শিল্পগুলির জন্য কী করে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার তৈরি করা যাবে, কেমন করে অর্থসংগ্রহ করে ব্যবসার গোপন কৌশলগুলি (ট্রেড সিক্রেট) আয়ত্ত করে ব্যাপকভাবে তার প্রয়োগ করা সম্ভব হবে—ইত্যাদি অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন।

'আমি যেন স্বামীজী বা কারও জন্য উদ্বিগ্ন না হই'—তোমার এই মিষ্টি নির্দেশ কী করে পালন করি, বলো? আমি এখন বুঝতে পারছি যে, আমার ভারতে থাকাটাই অন্যদের ওপর বোঝার মতো। য়ুম তোমাকে সব কথা বলবে, আমার সামনে কী ভয়ানক ভবিষ্যৎ! কিন্তু কাজ থেকে সরে যাওয়া তো কাপুরুষতা। কথাটা স্বামী সারদানন্দের কাছে তুলেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সেদিন স্বামীজী তোমার ইউরোপে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন।" শুনে মনে হল, আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, এদেশে আমার অনেক কাজ করার আছে। কিন্তু এখন আমি কিছুই জানি না। মনের মধ্যে সেই কথাগুলি উঠছে যা য়ুমকে বলেছিলাম। সেকথা মা-ই বলতে পাবেন, "বৎস! আমাকে খুশি করার জন্য তোমার অনেক কিছু জানার দরকার নেই। শুধু আমাকে একান্ত আপনার জেনে ভালোবেসো।" টাকার প্রয়োজন, অন্য কোনও কারণে নয়—প্রয়োজন স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য।

যদি সমস্ত জগৎ একসঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকারবোধ ছাড়তে পারত, নিজের জন্য কিছুই না রাখতে চাইত, তাহলে আশ্চর্য এক নৈতিক বাতাবরণ মুহূর্তে সবকিছুকে বদলে দিত।

যখন স্বামীজী আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন নারীকণ্ঠের একটানা সুতীব্র বিলাপধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। মেয়েটি রাস্তার উল্টোদিকে একটি কুঁড়েঘরে থাকে। আমি তার কাছে ছুটে গেলাম। জড়িয়ে ধরে বললাম, "আমার গুরুদেব অসুস্থ। তোমার এই একটানা কান্না তাঁকে আরও কষ্ট দিচ্ছে।" সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি একবার শুধু 'মা মাগো' বলে চুপ করে গেল। বহু বছর আগে তার যে-ছেলেটি মারা গিয়েছিল, তারই জন্য এই বিলাপ। নিজের বলতে তার এইটুকু পরিচয় ছিল যে, সে একটি সন্তানের জননী। হায়! ছেলেটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আর কিছুই রইল না! আমার হৃদয় এদের জন্য কিছু করবে বলে কত না ব্যাকুল! যতক্ষণ আমি এখানে আছি, যতটা পারি করব। যদি চলে যেতে হয়, তাহলে আরও বেশি দরকার, অল্পসময়ের মধ্যে যা-কিছু করণীয় তা শেষ করার। তারপর কে জানে কী হবে।

আজ প্রথম একটি অনিচ্ছুক ছাত্রীকে ধরে-বেঁধে আনতে পারলাম। শিক্ষয়িত্রী হিসেবে এটা আমার প্রথম সাফল্য। কদিন আগে মেয়েটি যখন স্কুলে এল, তখন সে যেন এক খুদে শয়তান, আজও তিনবার ধ্বস্তাধ্বস্তির পর যখন স্কুলে পৌঁছাল তখন দেখি সে খুশিতে ঝলমল করছে। আমি যে কী আনন্দ পেলাম! আমি তো প্রায় ধরে নিয়েছিলাম যে, এইসব ডানপিটে মেয়েদের জয় করার কৌশলই আমি হারিয়ে ফেলেছি।

আমার এই চিঠি কেবল নিজের স্বার্থে নয়। প্রিয় সারা! আমি বুঝতে পারছি, এখানে কাজকর্ম কেমন হচ্ছে তা জানার জন্য তুমিও উৎসুক। মনে হচ্ছে, স্বামীজী শিগ্‌গির পাশ্চাত্যে চলে যাবেন। সবকিছু ঠিক তেমনই আছে, যেমনটি তুমি দেখে গিয়েছ। ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত, তখন যে-কোনও পরিবর্তন সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। তবে প্রতিদিনই কিছু না কিছু সমস্যার সমাধান হচ্ছে। যা প্রয়োজন তা নিশ্চয় ঘটবে। এছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। একটা বড়ো ধাক্কা খেলাম মিসেস কলস্টন আসবেন না জেনে। একসঙ্গে দুজন থাকলে অনেক কিছু সহজ হত। যাহোক, তাঁর নিজের জন্যই তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠবেন, এই আশা।

যদি অভয়ানন্দ (যে-মার্কিন মহিলাকে স্বামীজী সন্ন্যাস দিয়েছিলেন) হঠাৎ এসে হাজির হন, তাহলে কলকাতায় তাঁর বক্তৃতার অনেক সুযোগ রয়েছে। অভয়ানন্দ এসে পড়তে পারেন ভেবে স্বামীজী আতঙ্কিত। কারণ আমার ধারণা, স্বামীজীর সংশয় আছে যে, সম্ভবত বেশিদিন সেই মহিলা অপরের

সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবেন না। আরও ভয়, উনি রাজনৈতিক বিতর্ক বাধিয়ে বসবেন। তবে যদি আসেন, কাজের অভাব হবে না। বাস্তবিকই কলকাতায় এখন অনেক বড়ো বড়ো কাজ করার সময় এসেছে। একথা শুনে কি তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

তোমার সুন্দর চিঠিটার জন্য ধন্যবাদ। প্রিয় সারা, তোমার কাছে কত ভালোবাসা পেয়েছি, কত না কৃতজ্ঞ আমি তোমার কাছে! অথচ তুমি যখন এখানে ছিলে, তখন সে-ঋণ শোধ করার চেষ্টা করিনি। এখন বোধহয় বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেল! তবু তোমার ভালোবাসা যে আমি অনুভব করেছিলাম সেকথা জানানোর সময় চলে যায়নি। যখন আমাকে তুমি তোমার এক অবাধ্য সন্তান ভাবতে, তখনও কিন্তু আমি মনে মনে নিজের ব্যবহারে লজ্জিতই হতাম। তুমি যদি জানতে আমি তোমার কাছে যা পেয়েছি, তা কতটা অন্তর থেকে গ্রহণ করেছি, তাহলে বুঝতে এখন আমি কী বলতে চাইছি। আমি খুব খুশি যে, দিল্লী এবং আমার দেশ ওই ব্যাপারে অবশেষে তোমার মনকেও জয় করে নিয়েছে। সত্য নয় কি যে, নিকলসন ভারতীয়দের এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য নিজের জীবন যতটা দিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্যের জন্য ততটা নয়? সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর সমাধির সামনে বসে বুঝতে পারলাম, তাঁর জীবনটা যেন এক উত্তাল জোয়ারের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে। হয়তো তাঁর অজান্তেই। এখন মৃত্যুর জ্যোতির মধ্যে তিনি আমার চিন্তাকে সমর্থন করছেন। স্বামী সারদানন্দ বললেন, ৫৭ নং রামকান্ত বোস লেনের গৃহস্বামী বইটি (নিকলসনের জীবনী) কিনেছেন। জেনারেল প্যাটারসন আমাকে এক কপি পড়তে দিয়েছেন। সুতরাং এক্ষুণি আর কেনার দরকার নেই।

শ্রীযুক্ত ঘোষ ইবসেনের সাহিত্য পড়ে কত না আনন্দিত! তাঁর 'Brand' নাটকটি ভালো লেগেছে। তারপর কোথা থেকে আমার জন্য একটি 'The Master Builder' বই এনে দিয়েছেন। সদানন্দ আজকাল আর আমার কাছে আসে না। শ্রীযুক্ত ঘোষের প্রতি তার আগের ভালোবাসা ফিরে এসেছে। তুমি চলে যাওয়া অবধি সে ওই মন্দিরেই ফুল দিচ্ছে! এখন আমি এত ব্যস্ত যে এটা একরকম ভালোই হয়েছে। তার সময়মতো সে আবার ফিরে আসবে।

প্রিয় গ্র্যানি, আমার অনেক অনেক ভালোবাসা ও ধন্যবাদ।

ইতি
তোমার স্নেহের কন্যা
মার্গট

॥ ছয় ॥

১৬ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
১২ মার্চ, রবিবার সকাল
সময় : ৭.২০ মি. (১৮৯৯)

প্রিয় য়ুম,

ঘণ্টাখানেক আগে নিম-এর কাছ থেকে এক দীর্ঘ পত্র এসেছে। অনুমান করতে পার, পত্রের বক্তব্য কী ছিল? হ্যাঁ, তোমার চিঠিতে ওই কথারই উল্লেখ আছে যদিও ভিন্ন সুরে।

ভাবছি নিম-এর চিঠিটা তোমার কাছে পাঠাব না। সেটা উচিতও হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না-পাঠিয়ে থাকতে পারব কিনা সন্দেহ!

আমার দিক থেকে তোমাকে আর কী বলার আছে! আমার কাছে তুমি 'ভগবানের মতো'—না বলতেই সব বুঝে নাও, ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না।

শুধু এটুকু বলতে চাই—গত দশ বছর ধরে জীবনের প্রত্যেকটি নিগূঢ় ঘটনার নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে তুমি আমার হৃদয়ের ভাব লাঘব করে দিয়েছ। কত সময় সংশয় জেগেছে—আমি কোনও অলীক আহ্বানে ভুল করে এপথে আসিনি তো! আজ মনে হয়, সেগুলো ছিল জীবনগ্রন্থের একটি করে পাতা উল্টে যাওয়া—যার প্রতিটি পদক্ষেপেই অলক্ষ্য থেকে নির্দেশিত। আমার শুধু একটিমাত্র আশা ও প্রার্থনা তোমার কাজে সকল উদ্যোগ যেন নিখুঁত ও সুচিন্তিত হয়। আমার ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলে বলে কোনওদিন তোমাকে আক্ষেপ করতে না হয়! অবশ্য আমি জানি, জীবনের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। প্রত্যাশা না রেখে উদারভাবে মহৎ কর্ম করে যাওয়াই তোমার স্বভাব। বলতে পার, এ ব্যাখ্যা একেবারেই আমার নিজস্ব।

এইমুহূর্তে তোমার প্রীতির স্পর্শ পেতে কী যে ইচ্ছে করছে। এখানে বসে আমি এখন অবোধ শিশুর মতো চোখের জল ফেলছি!

প্রিয় য়ুম, প্যারিস সম্পর্কে আর কোনও কথা না তোলাই ভালো। তুমি তো অগাধ সম্পত্তির মালিক নও যে সেই অনিঃশেষ সঞ্চয় থেকে ক্রমাগত গ্রহণ করে আমার সখ মিটিয়ে যাব! যদি প্যারিসে আমাকে প্রয়োজন হয়, তবে

তবে রোজগার করে পাথেয় জোগাড় করব অথবা মিস মূলার তো আছেনই—তাঁর কাছে না হয়, ফেরার খরচ চেয়ে নেব। তুমি ভারতের জন্য আমায় দায়মুক্ত করেছ, সেইসঙ্গে লাঘব করেছ আমাব হৃদযের ভার। বাকি জীবনটা দিয়ে আমি প্রমাণ করব যে, তোমার আস্থার একেবারে অযোগ্য আমি নই।

অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পবিত্রতা ও বীর্যের সম্মিলিত বল পরাহত হয়েছে—এমন কথা আমি মেনে নিতে পারি না। তোমাদের দু-জনকে (মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল) পরস্পরবিচ্ছিন্ন করে আমি ভাবতেও পারি না। আশা করে আছি, শিগ্‌গিরই শুনতে পাব, তোমরা আবার মিলিত হয়েছ। যখনই তোমাদের কথা ভাবি, তখনই তৃতীয় আর একজনের অস্তিত্ব ছায়ার মতো সেইসঙ্গে ভেসে ওঠে—ভারতবর্ষে বসে সে শুধু এখন লিখেই চলেছে—কারণ (আমাকে নিয়ে) আসলে দলটা তো তিনজনেরই ছিল—তাই নয় কি? বাস্তবিক, জগৎটা যে এত তাড়াতাড়ি উদ্ধার পাবে অর্থাৎ ত্রাণকর্তাকে পেয়ে যাবে—তোমার এই কথাটি খুবই ঠিক।

প্রিয় য়ুম, এই কথাটাই ঘুরেফিরে মনে আসছে অথচ আরও কত কথাই না বলার ছিল! তোমাকে চিঠি লিখব ঠিক করে আজ সকালের কাজ শুরু করেছিলাম। তখন কী জানতাম যে আজকের ডাকে তোমার চিঠিই আগে এসে যাবে।..

স্বামীজীর সঙ্গে গতরাত্রে দেখা হয়েছিল। মঠের এক সাধু বিকেল চারটেয় এসেছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' (Awakened India)-এর জন্য স্বামীজীর সাক্ষাৎকার নিতে চাই শুনে ছ-টার সময় তাঁর সঙ্গে ফিরতি নৌকায় যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। ঠিক হল, ফেরার পথে আমি নিজের ব্যবস্থামতো আসব। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন বলে সদানন্দ ওই নৌকায় গেলেন। এটা ভালো হল। আমরা হেঁটেই ফিরলাম। এলাহাবাদ থেকে শুক্রবার একটা চিঠি পেয়েছি। ওই ব্যাপারেও স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনা করে আমার কর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন ছিল।

আমরা বেলুড় মঠে পৌঁছেছিলাম রাত আটটায়। 'রাজা' (ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে 'রাজা' বলে উল্লেখ করতেন) তখন গাছের নিচে ধুনির পাশে বসেছিলেন। সাধুদের মঠে একজন মহিলার প্রবেশের পক্ষে তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। আমি বজরার ছাদে কম্বল বিছিয়ে বসেছিলাম। সেখান থেকে আর উঠলাম না। স্বামীজীই দেখা করতে বজরায় উঠে এলেন।

(সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় স্বামীজী বললেন), "জ্ঞান মার্গটি, সবচেয়ে কম বাধা যে পথে আসে সে পথটার কথাই কয়েকদিন ধরে সমানে ভাবছি। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্তিমাত্র। সবটাই আপেক্ষিক। আমার কথা যদি বল, আমি আর ও নিয়ে ভাবতে চাই না। কয়েকটি খাঁটি চরিত্রের মানুষকে নিয়েই জগতের ইতিহাস। একটা মানুষও খাঁটি হলে জগৎ আপনিই তার পদানত হয়। কোনও কিছুর সঙ্গে আপোস করার জন্য আমি কখনও আদর্শকে নিচে নামাব না। এবার থেকে আমি সোজাসুজি নির্দেশ দেব।"

বুঝতেই পারছ, এর উত্তরে আমি কী ভেবেছিলাম এবং বলেছিলাম। কারণ, তিনি যেমন এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমন স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন। আর বাস্তবিকই এটা একটা সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘরূপে গড়ে উঠতে চলেছে। কতকগুলো দুর্বলচিত্ত মানুষকে সুবিধে করে দেওয়া এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। এসব চিন্তায় স্বামীজীর মন পূর্ণ ছিল। সন্তোষিণীর প্রসঙ্গ উঠতে তাঁর এই ভাবনা স্পষ্ট প্রকাশ পেল। এর আগেও স্বামীজী বিধবা আশ্রম খোলা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এ-পথে গেলে সমাজের দিক থেকে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে কম।

তারপর প্লেগ সম্পর্কে কথা উঠল। এ-অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দিয়েছে এবং বাংলার সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ছে। প্লেগ-আক্রান্ত এলাকায় সেবার জন্য দু-তিনটি ছেলেকে পাঠাতে মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ এসেছে। আমিও এ-ব্যাপারে তাঁকে অনুরোধ করলাম—তিনি বললেন, যারা নিজের থেকে যেতে আগ্রহী, এমন দু-তিনজনকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের পর বাংলার বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হবে। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানাবে, উৎসাহ দেবে আর নির্ভুল সংবাদ মঠে পাঠাবে। তাদেরই মধ্যে একজন বলেছিল—সম্ভবত সেই সুন্দর কালো ছেলেটি—এ-কাজে সর্বপ্রথম যে নিজেকে বলি দেবে, সেই হবে মহান আদর্শের ভিত্তিস্তম্ভ।

আমি যেন মানসনেত্রে দেখতে পাচ্ছি—একটা মহান ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হাসিমুখে তারা একে একে মৃত্যুবরণ করছে। এদের ত্যাগ নতুন প্রজন্মকেও প্রাণিত করবে। স্বামীজীর কাছে আত্মমর্যাদাই বড়ো কথা, আমার কাছে ঐতিহ্য। আমরা ওই ছোটোখাটো মানুষ ডঃ রাইকে চাই।

স্বামীজী জানালেন ইতিমধ্যে গুজরাট থেকে এক হাজার টাকা এসেছে। উনি দৃঢ়নিশ্চয় যে ওঁর পরিকল্পনা সফল হবে। দক্ষিণেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি-

নির্দেশ করে বললেন, শ্রীশ্রীমা ও আমার জন্য সেখানে একটা স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে চান। সে-আবাসে আমার ছাত্রীদেরও (স্বামীজীর প্রস্তাব ছিল নিবেদিতার ছাত্রীরা আসলে শিক্ষাব্রতী হবে) রাখতে পারব। এবং তাদের জন্য (Practising School-এর শিক্ষাব্রতীদের জন্য) আশেপাশের গ্রাম থেকেই পড়ুয়ারা আসবে।

স্বামীজী বললেন দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য আরও ভালো ও উন্নত হচ্ছে এবং সেটার কারণ হল গরম আবহাওয়া। ফলে উনি জুন পর্যন্ত কলকাতায় চালিয়ে যেতে পারবেন। পরিহাস করে আরও বললেন, "লোহিত সাগরের সাধ্য নেই যে এই হিন্দুটিকে মারে।" শরীর আর একটু চাঙ্গা হলেই উনি রওনা হয়ে যাবেন। আর এখন উনি পাহাড়ি শীতের কথায় আতঙ্কিত—এমনকি, সেভিয়ারদের দীক্ষাদানের জন্যও সেখানে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছেন না!

এলাহাবাদের ব্যাপারটা থেকে স্বামীজী আমাকে একেবারেই মুক্তি দিয়েছেন। ওদের প্রস্তাবগুলো কেমন ভাসা-ভাসা—তার থেকে সঠিক কিছুই যেন নির্ণয় করা যায় না। যাহোক, আমার কর্মক্ষেত্র এখানে।

আগামী কাল সোমবার—সকালে আমি মঠে যেতে পারি। কারণ কালই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা (আগামী রবিবার সাধারণ উৎসবের দিন।) কিন্তু আমি যাব না বলায়, মনে হল, স্বামীজী যেন খুশিই হলেন। তাই ভাবছি মঠে না গিয়ে (আগামী কাল) যদি আমাদের আদরের মাতাঠাকুরানীকে আনতে পারি! যদি তিনি এসে স্কুলের বাচ্চাগুলোর কল্যাণে একটু বিশেষ পুজো করে দেন! নিজে ঘোরাঘুরি করে শক্তিক্ষয় করার চাইতে এটাই বরং ভালো হবে। য়ুম, তাঁকে মা বলে ডাকতে তুমিই তো শিখিয়েছ! তার আগে পর্যন্ত আমি ভাবতাম, আমার ওপর আমার বাড়ির সেই ছোট্টো মায়ের দাবিই সবচেয়ে বেশি যিনি আমার মনটাকে টেনে রাখতেন! তাছাড়া অভয়ানন্দ আসছেন এ সপ্তাহেই—তাঁর নৌকাভ্রমণ ইত্যাদির বন্দোবস্ত আমারই করার কথা।

তোমাকে আমি জানিয়েছিলাম কি, বম্বেতে অভয়ানন্দ রুপোর পেটিতে মানপত্র-সহ বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন? নিঃসন্দেহে মাদ্রাজেও বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু স্বামীজী ও আমার প্রতি তাঁর অখণ্ড নীরবতা—আমাদের টেলিগ্রাম বা পত্রাদির কোনও উত্তর আসেনি। আলাসিঙ্গা আমাকে স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতাগুলির অনুলিপি ও গুডউইনের একখানা ফটো পাঠিয়েছেন। তুমি যদি না পেয়ে থাক, আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

আগামী ২৫ মার্চ শনিবার আমাকে আজীবন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। বললেন গতকাল সকালে উনি দু-জন মঠবাসীকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য দিয়েছেন। আহা, যদি তোমাকে সময়মতো জানাতে পারতাম। আগের বারের অনুষ্ঠানের ঠিক এক বছর পর এটা হবে।

এরপর সেই আশীর্বাদধন্য স্বরূপানন্দের প্রসঙ্গে আসছি। এ-পর্যন্ত সবকিছুই ঠিক হয়েছে। এটা খুবই আশ্চর্যের যে একদিকে তাঁর প্রচণ্ড অনভিজ্ঞতা আবার অন্যদিকে লোকব্যবহারে তিনি কত উদার, ভদ্র ও মার্জিত।

সরলা আর Countess Carmavan-এর কথা তোমাকে বলেছি মনে হয়।... এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি। যদি আগামী গ্রীষ্মে দুজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে ছোটো একটি তাঁবুসহ পদব্রজে ভ্রমণে যাওয়ার অনুমতি পাই—সেটা সমীচীন হবে, না ভুল হবে? প্রথমে তো এটা চিন্তা করেই বিস্ময়ে আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। তারপর ভাবলাম একেবারে একা বেরোনোর চেয়ে দুজন সঙ্গী নেওয়া ভালো যাঁরা একটু তফাতে থাকবেন। আবার ভাবছিলাম আদৌ দুজন সঙ্গী পাওয়া যাবে কিনা। না পেলে আমার যাওয়ার প্রশ্ন নেই। আমি সদানন্দ ও আর এক জনকে নিয়ে যেতে চাই...। আসলে এসবে বিশেষ কিছু যায় আসে না, তুমি তা জানই। তবে কিনা দুনিয়াটা বড়োই ছোটো আর আমার দিক থেকে কোনও অসতর্ক পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ কাজের অনেক ক্ষতি করে দেবে।

ডাক যাওয়ার আগে আরও কথা বলার আছে। অবশ্য আজই সব শেষ করা যাবে না। ঘড়িতে এখনই পৌনে ন-টা।

তোমার স্নেহের
মার্গট

পুনশ্চ—প্রিয় য়ুম, 'লকেট' ফল আবার উঠেছে। খুব গোলাপজাম খাচ্ছি। আঁটিগুলো অ্যালবার্টকে পাঠিয়ে দেব! মনে হচ্ছে জগতটা যেন শুধুই ভালোবাসায় ভরা—কাউকে ধন্যবাদ জানানো অবান্তর।

গতরাতে স্বামীজী একটা কথা বললেন, "প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্বরূপ আমরা এখনও জানি না। যখন সেই যুগের উদয় হবে তখন আর দেখার প্রয়োজন হবে না কোন পথে বাধা কম আসবে। তখন প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকবে মহৎ কাজ করার।"

তাঁর শেষদিকের কথাগুলো যদি শুনতে! স্বামীজী বললেন, "যতদিন তুমি ওই পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করবে ততদিন আমি এভাবে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে যাব।... একটা কথা তোমাকে বলছি, যে নিজের মাকে ছেড়ে এসেছে, তাকে কিন্তু এত সহজে প্রলুব্ধ করা যায় না। তোমাকে আরও মনে করিয়ে দিতে চাই,... আমার mission (ব্রত) রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্ত নয়—আর কিছুও নয়। আমার উদ্দেশ্য এই জাতির মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।" আমি বললাম, "স্বামীজী, এ-কাজে আমি আপনাকে সাহায্য করব।" শুনে তিনি বললেন, "আমি জানি, তাই তো সাবধান করে দিই।"

॥ সাত ॥

১৬ নং বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলকাতা,
বৃহস্পতিবার, ১৮৯৯
[৩০. ৩. ৯৯]

প্রিয় য়ুম,

গত শনিবার আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেওয়া হল। তোমাকে এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে চিঠি লেখার ইচ্ছেটা সবসময়ই মনে মনে ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার আর দরকার নেই। তবু জানানো উচিত।

সকাল আটটায় মঠে পৌঁছে মন্দিরে যাই। সেখানে আমরা মেঝেতে বসলাম। যতক্ষণ না পূজার ফুল এসে পৌঁছাল ততক্ষণ রাজা আমাকে বুদ্ধের কথা শোনালেন। তিনি বললেন, জাতককাহিনীর মর্মার্থ হল, পাঁচশত বার অপরের জন্য জীবন দান করলে তবেই বোধিলাভ করা সম্ভব।

ঠিক সেই মুহূর্তে কথাগুলো কী মধুর সুরের ঝঙ্কারই না তুলল মনে। তারপর পূজার সব উপকরণ আনা হলে তিনি আমাকে কীভাবে পূজা করতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন। ওইসময় তিনি অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে পূজার প্রতিটি বিধির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। যে ছোট্টো সাদা ফুলটি তিনি আমাকে মাথায় ধারণ করতে দিয়েছিলেন সেটি তোমার জন্য তুলে রেখেছি। পরে তোমার জন্য ওই ফুলটি তাঁকে দিয়ে হোমাগ্নির ভস্মে স্পর্শ করিয়ে নিয়েছি। ওই ফুলের ওপর ছোট্টো গোলাপী চিহ্নটি চন্দনের। দেখতে পাচ্ছি, ফুলটির সাদা রঙ এখন ঝলসে

গেছে। গতকাল যে কবিতাটি পড়েছি তার একটি ছোট্টো পঙ্‌ক্তি তোমাকে লিখে দিয়েছি। আমার মনে হয় এটি যেন প্রভুর মহত্ত্বের সুন্দর প্রকাশ। সেই পঙ্‌ক্তি হল : "আমিই সেই গ্যাব্রিয়েল যে (এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কথা বলছি) ভগবৎসান্নিধ্যে রয়েছে।" একজন অবতারের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে পূজা শেষ হল। দুর্ভাগ্যবশত অবতারের নাম ঠিক মনে করতে পারছি না। যখন পূজাবেদীটি ফুল দিয়ে সাজাচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন, "এখন একটু ফুল আমার বুদ্ধকে দাও। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে চায় না।"

পূজা শেষ হলে আমরা হোমের জন্য নিচে এলাম। এইসময় স্বামী অভয়ানন্দ (স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা যিনি তাঁর কাছে সন্ন্যাস পেয়েছিলেন) এল। আমরা দুজনই সাধুদের সঙ্গে প্রাতরাশ করলাম। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মঠেই ছিলাম। তারমধ্যে আমি ঘণ্টাদুয়েক স্বামীজীর সঙ্গে কাটিয়েছি।

সে (অভয়ানন্দ) বড়োই অদ্ভুত। স্বামীজীর কোনও কথা শোনার তার ধৈর্য নেই। একটি বই নিয়ে চলে গেল—আর মঠ থেকে চলে যেতে পারছে না বলে খুব বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। মেঝেতে বসে হাত দিয়ে খাওয়া নিয়ে স্বামীজীর সামনেই বিরূপ মন্তব্য করতে ছাড়ল না।

আমার মনে হয় সে স্বামীজীকে যথার্থ ভালোবাসে না। আর তার মতে আমার ভালোবাসা অত্যন্ত নির্বোধের মতো এবং আবেগপ্রবণ! কারণ হল, স্বামীজী যা খেতে দেন আমি তাই খাই এবং তিনি যা বলেন আমি তাই করি। তাঁর সহজ সরল বিনম্র কথায় আমাকে প্রভাবিত হতে দেখে ওর মনে হয় যে এতে মুগ্ধ হওয়ার কিছু নেই কারণ এরূপ সরলতা তাঁর (স্বামীজীর) স্বভাবজাত। আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পারছে যে, আমি তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করি—আর এ-কথা তো সত্য! অভয়ানন্দের প্রতি স্বামীজীর এমন উদার, মধুর, বিনম্র আচরণ আমার কল্পনাতীত। নিউইয়র্কে ক্লাস নেওয়ার সময় স্বামীজী একবার সমাধিস্থ হয়েছিলেন—সে ঘটনা স্মরণ করে তিনি (স্বামীজী) তাকে (অভয়ানন্দ) বলেন, "সেটি আমার বোকামির জন্য ঘটেছিল, শিক্ষাদানকালে ভাবস্থ হওয়ার অধিকার কোনও শিক্ষকের নেই।" অথচ অভয়ানন্দ মনে করে স্বামীজীর কাছে পাওয়া এটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। আর দেখো, স্বামীজীর ওই মুখের কথাটাকেই সে মেনে নিল! যাই হোক, আমার আর এইভাবের আলোচনা চালাতে ভালো লাগছে না। কিন্তু তোমার কাছে মনের ভাব প্রকাশ না করে পারব না।

আমি একজন ব্রহ্মচারিণীমাত্র, সন্ন্যাসিনী নই। মঙ্গলবার আমার এক সপ্তাহের কাজ থেকে একটু সময় বের করে অভয়ানন্দকে প্রাতরাশের জন্য গ্রেট ইস্টার্নে নিয়ে যেতে হল, আর গাড়িতে করে কলকাতা ঘুরে দেখাতে হল। বেশ কিছু টাকার অপব্যয়ও হল, তাই নয় কি? শুক্রবার সে বক্তৃতা দেবে একটি থিয়েটার হলে। সোমবার পরমহংসদেবের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হোমে আমাদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু মোহিনীবাবুর বাড়ি পৌঁছে অভয়ানন্দ যাবে না বলে বেঁকে বসল এবং বাড়ি ফিরে গেল। এতে আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। আমি একাই গেলাম, সময়টা খুব ভালো কাটল। আজ রাতে মোহিনীবাবুর বাড়িতে ছোটো-খাটো একটি হোম হবে। সদানন্দ আর আমি সেখানে যাচ্ছি চাঁদনী রাতে ধ্যান করব বলে। স্বামীজীকে সব কথা বলেছি—ওঁর সানন্দ অনুমোদনও পেয়েছি। যারা সারারাত জেগে ধ্যান করার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ঈর্ষা করি জেনে স্বামীজী আমার প্রতি বিশেষ সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

* * *

মঙ্গলবার অপরাহ্নে যোগানন্দ মারা গেলেন। সেসময় প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, "কেমন বোধ করছ, ভাই? কষ্ট হচ্ছে?" উত্তরে তিনি বললেন, "আমি তো সর্বক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান চাইছি, কিন্তু আমার মন ঈশ্বরের সাকার চিন্তায় আকৃষ্ট। গীতার শ্লোক পড়ে শোনাও আমাকে।" তাঁরা তাঁকে গীতাপাঠ করে শোনালে তিনি বললেন, "আর এখন কোনও কষ্ট নেই। সবকিছু বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হচ্ছে।" তারপর হঠাৎ সজোরে 'ওঁ রামকৃষ্ণ' বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

অপূর্ব মহাপ্রয়াণ! নয় কি?

স্বামীজী যোগানন্দকে দেখতে এলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন এই আশঙ্কায় গিরিশবাবু অনেক বলে কয়ে তাঁকে মঠে ফেরত পাঠালেন। সেজন্য তাঁর (গিরিশবাবুর) কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম, তাঁর চোখে জল। যোগীন-মা যোগানন্দের অক্লান্ত সেবা করেছেন মাসের পর মাস। তিনি মেঝেতে শুয়ে আছেন—মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই। অনেকক্ষণ ওখানে ছিলাম। পঞ্চাশ-ষাট জনের সমবেত 'হরি ওঁ' মন্ত্র শুনতে পেয়ে মা আমাকে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দেখতে বললেন।

সে দৃশ্য খুবই মহান! মাথায় গেরুয়া রঙের রেশমী পাগড়ি-সহ স্বামীজীর ছড়িয়ে দেওয়া ফুলে সর্বাঙ্গ ঢাকা মরদেহটি সদানন্দ এবং অন্য আর একজন তুলে ধরতেই কর্পূর জ্বালিয়ে তাঁকে আরতি করা হল। ঘরের ভিতরে ও বাইরে দাঁড়ানো বহুজনের কণ্ঠে পুণ্য নাম-গান ধ্বনিত হতে লাগল।

সদানন্দের মুখখানি তখন যদি দেখতে! সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সে যেন একজন ঋষি। কিন্তু ওপরতলায় কান্নার রোল উঠল, সে-কান্না নিচের পূজারতির ধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল। এতকাল যিনি ছিলেন গৃহের কর্তা তিনি আজ চিরতরে গৃহ ছেড়ে চললেন, তাই মহিলারা কাঁদছিলেন। যোগীন-মায়ের হিমশীতল নীরবতা যেন গলে গেল, মনে হল মা এবং যোগীন-মার হৃদয় বুঝি ভেঙে যাবে। যোগানন্দের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর জন্য কোমল শয্যা প্রস্তুত ছিল। শয্যায় বিছানো ছিল হলুদ ফুল আর তাঁর দেহটি ঢাকা ছিল সাদা ফুলে।

শ্মশান-ঘাটে চিতা সাজানো হল। সমবেত সকলে তাঁর উদ্দেশে অনেক কিছু বলছিল। তারপর ব্রহ্মানন্দ চিতায় অগ্নিসংযোগ করার আগের মুহূর্তে সবাই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, কোনও অপরাধ যদি তাঁর প্রতি ঘটে থাকে, তার জন্য।

সদানন্দ বলছিল, "অগ্নিতে সমর্পিত তাঁর মুখখানি যেন একেবারে শিবের মতো।"

প্রতিক্রিয়া দেখা গেল গতকাল। পুরুষমানুষেরা তীব্র শোক অনেকটাই সংযত করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। গতকালই ছিল সত্যিকারের শোক দিবস। সদানন্দ তাঁর কথা ছাড়া আর কোনও কথাই বলতে পারছিল না।

মৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন বাস্তবিকই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

এস. (সদানন্দ) আমাকে এক মুমূর্ষু বালকের কথা শোনাল। শ্রীশ্রীমা তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে বলেন। একথা শুনে সে বলে ওঠে, "তবে কি মৃত্যু আমার শিয়রে?" কথাটা এড়িয়ে গিয়ে ওঁরা বলেন, "মা যে আদেশ করেছেন।" তখন সে বলে, "মাকে প্রণাম, তাঁর আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। চলো তবে।" তাকে শয্যাসমেত বাইরে নিয়ে আসা হল, মা এসে দাঁড়ালেন বারান্দায় এবং চেয়ে রইলেন তার দিকে। ত্রিগুণাতীত গঙ্গামাটি দিয়ে তার সর্বাঙ্গে রামকৃষ্ণ নাম লিখে দিলেন, লিখলেন কৃষ্ণনাম ও আরও সব দেবতাদের নাম। সে কিন্তু আঙুল চালনা লক্ষ্য করেই বলে উঠল,

"না একটা নাম বাদে বাকি সব মুছে ফেলো—যে নাম নিয়ে এতদিন বেঁচেছি, সে নাম নিয়েই আমায় মরতে দাও।" তার কথামতো কাজ হলে সে দৃষ্টি দিয়ে বিদায় চেয়ে নিল মায়ের কাছে। এবার তাকে নিয়ে ঘাটের অভিমুখে যাত্রা করা হল। সারাটা পথ সে বেশ আনন্দে কথা বলে চলল। ঘাটে পৌছাতে না পৌছাতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

(যোগানন্দের দেহ নিয়ে) গত মঙ্গলবার যতক্ষণ ওঁরা ঘাটে ছিলেন ততক্ষণই প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া দাপাদাপি করছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক লেগেছিল। স্বামীজী ততক্ষণে নিরাপদে মঠে পৌঁছে গেছেন। মনে হচ্ছিল যেন সেই ঝড় তার সংগীতময় রথে বহন করে নিয়ে চলেছে প্রয়াত আত্মাকে।

সেদিনের পর থেকে রাজার সঙ্গে দেখা হয়নি। আগামী কাল অভয়ানন্দের বক্তৃতা শুনতে আসবেন কিনা, তা-ও জানি না। 'ইন্ডিয়ান মিরর' কাগজের সম্পাদককে বক্তৃতাসভায় চেয়ারম্যান হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

স্বরূপানন্দ আমাকে বললেন যে, তিনি (স্বামীজী) কথা দিয়েছেন শ্রী ও শ্রীমতী সেভিয়ারকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য (আলমোড়া হয়ে) মায়াবতী যাবেন। তাঁদের পক্ষে এটা খুবই আনন্দের, তাই না? আমি অনুমান করি তাঁর এই যাত্রা শেষ হবে পাশ্চাত্যযাত্রায়। তিনি তো এখনও বলছেন আবহাওয়াটা তাঁর পক্ষে ভালো। স্নিগ্ধ বাতাস মারাত্মক তাপকে প্রশমিত করে।

আমি দু-সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি—খানিকটা প্লেগের কারণে আর খানিকটা আমার সত্যিই খুব প্রয়োজন ছিল বলে। আমি বড়োই অবসন্ন বোধ করছিলাম। আশা করি এমন সুন্দর বিশ্রামের পর আগামী সপ্তাহে পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করতে পারব।

শ্রদ্ধেয়া মা (মাদার সেভিয়ার) আমাকে ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকালটা কাটিয়ে আসতে বলছেন। আমার ফিরে আসার ব্যাপারটা তিনি দেখবেন। কিন্তু তার ফলে আমার কাজে যে বাধা পড়বে!

তোমার প্রিয় সন্তান
মার্গট

পরের ডাকে তোমার একখানি চিঠি পাব আশা করছি।
আর একটি কথা বলার আছে।
আগামী কাল গুডফ্রাইডে।

আজ রাতে ভবানীপুরে চাঁদের আলোয় বসে স্মরণ করব গত বছর এদিনটিতে আমরা একসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়েছিলাম।

যোগানন্দের মৃত্যুতে মা সম্ভবত শীঘ্র দেশে চলে যাবেন বেশ কিছু দিনের জন্য—ছ-মাস বা একবছরের জন্যও হতে পারে।

গতকাল Countess-কে দেখলাম। সে খুব মুশকিলে পড়েছে—কেবলই বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রবঞ্চনার কথা বলছে। সে জানাল তার কাছে এক পয়সাও নেই। 'মহাবোধি সোসাইটি' এই মুহূর্তে যেন মস্ত এক তাসের ঘরের মতো যা ভেঙে পড়ার মুখে। এটা কার দোষ? আমি তা জানি না। এমন এক মহিলার সঙ্গে কোনওরকম সংস্রব রাখা আমাদের কাছে এক ভয়ের ব্যাপার। তার বেশ মাথার গোলমাল এবং তার ওপর অস্থিরমতি, আর একসঙ্গে একজনের মধ্যে এই দুটি থাকলে তা রীতিমতো ভীতিপ্রদ। একটি ভালো লক্ষণ এই যে, সে ধর্মপালের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে না। আমাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই আঘাত সত্ত্বেও তার ব্যবহার যাতে ধর্মবহির্ভূত না হয় তার জন্য সে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, স্বামীজী যদি আমাকে বাড়ি ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যেতে বলেন তাহলে আমি কী করব! আহা বেচারি! আমি ওকে সাহায্য করতে চাইছি, স্বামীজীকে এ-ব্যাপারে না জড়িয়ে।

জনস্বাস্থ্যের জন্য সদানন্দ অমানুষিক পরিশ্রম করছে। অভয়ানন্দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সদানন্দ মনে করে, "আমরা অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষদের দেখেছি আরও কাউকে ভালো দেখার আশা করি না। যেমন সেভিয়ার দম্পতি, গুডউইন, আমার প্রিয় পূজনীয়া এম. এবং আমাদের Grandee." সে আমাদের বড়ো প্রিয়—আমি তাকে ভালোবাসি! অভয়ানন্দের অভিযোগ যে, সব সন্ন্যাসীই নাকি আমার অনুগত দাস।

স্বজন-পরিজন

মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা ভারতের ও নিজের বিষয়ে সবকিছু জানাতে উৎসুক। ভগিনী নিবেদিতার এই পত্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায় তিনটি প্রভাব—সমসাময়িক ব্রাহ্মসমাজ ও ঠাকুর পরিবার, খ্রিষ্ট-প্রচারক এবং স্বামীজীর আদর্শ—যার মধ্যে রয়েছে কালী ও প্রতীকতত্ত্বের উল্লেখ।

স্বামীজীর কাজের জন্য নিবেদিতা নিজের মা, ভাই ও বোনকে অসহায় অবস্থায় ফেলে এসেছেন—সেই গভীর বেদনার কিছু প্রকাশও এখানে পাওয়া যায়। নিবেদিতার গর্ভধারিণী মা যে কতখানি ছিলেন তাঁর কাছে—তার অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মায়ের কাছে লেখা এবং মায়ের মৃত্যুর পর লেখা ছোটো ছোটো পত্রদুটিতে।

প্রথমপর্বে ভারতবাসকালে টুকরো টুকরো ঘটনার অনুপম বর্ণনায় আমরা তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিবেদিতার মানস ক্রমাভিব্যক্তির পরিচয়ও পাই।

॥ আট ॥

১৬ নং বোসপাড়া লেন
সোমবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯
২-৩০ মিঃ

আমার প্রিয় জয়,

প্যারী থেকে তোমার পত্রখানি আজই এসেছে—আমাকে এখনই তোমার চিঠির উত্তর লিখতে হবে। গত দুই রাত্রি প্রায় জেগেই কাটিয়েছি, সুতরাং উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু লিখে উঠতে পারিনি। অবশ্য এতে খুব একটা অন্যায় হচ্ছে না, কারণ আজ তো সপ্তাহের সবে আরম্ভ (সোমবার), নতুন করে আরম্ভ করার স্বাধীনতা আছে।

তোমার চিঠির প্রথম অংশ পড়ে নিঃশব্দে হাসলাম—বিশেষ করে যেখানে তুমি আগামী ১৯০০ সালে প্যারী ভ্রমণকে ঘিরে তোমার মনোহর কল্পনাগুলি বর্ণনা করেছ। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক চাঁদের অন্যদিকটির মতো। অবশ্য বলতেই হবে, তুমি বর্ণনাটিকে চমৎকার ভাবে জীবন্ত করেছ। যখন পড়লাম, 'তোমার জন্য আমরা একজোড়া দস্তানা কিনেছি' তখন, ভগবান জানেন কেন, কান্নায় ভেঙে পড়লাম— এখন সে-কথা ভেবে নিজেই আশ্চর্য হচ্ছি। তবে এখনই তোমাকে একটিবার দেখার জন্য যে-কোনও মূল্য দিতে পারি। তোমাকে যা বলতে চাই তার খুব অল্পই চিঠিতে প্রকাশ করা চলে। লিখতে লিখতে কেবলই ভাবি, পরের চিঠিতে তোমাকে সব জানাব—তবু নামমাত্র লেখা সম্ভব হয় অথচ বাকি সব না বলা থেকে যায়। এইমাত্র আলমোড়া থেকে 'big brother' একটি হৃদয়বিদারক পত্র দিয়েছেন, "তুমি একমাস নীরব রয়েছ। এটা অসহ্য!" আমি কিন্তু খেয়াল করিনি।

যাই হোক, ভারতে আলোড়ন জাগাতে এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে আমি সবই করব। এই মুহূর্তে একটি বক্তৃতা তৈরি করা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা। এই সপ্তাহের বক্তৃতার কর্মসূচী—মঙ্গলবার : খ্রিষ্টান মিশনারিদের কাছে 'ইতিহাস', বুধবার : ব্রাহ্মসমাজে 'Training in the Concrete', রবিবার : মিনার্ভা থিয়েটারে 'The Young India Movement'।

গতকাল, রবিবার, সকালে আমি (জোড়াসাঁকোর) ঠাকুরবাড়িতে স্বামীজীকে নিয়ে যাই। স্বামীজী তোমার কোনও খবর না পেয়ে অধৈর্য। বললেন, "আহা, আমি তো ওদের সঙ্গে যেতে পারতাম! বেশ মজা হত তাহলে। কিন্তু না গিয়েই বোধহয় ভালো হয়েছে। মিস মূলারের সমালোচনা উত্তেজনার সৃষ্টি করত—আর এখন তো মে-জুনের মধ্যেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।" আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে, আমিও তাঁর সঙ্গে একমত। আর এ-ও জানি, তুমিও নিশ্চিত ভাবছ যে সবকিছু ভালো-র জন্যই ঘটেছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ সেন্ট সারাকে লিখে পাঠাচ্ছি—সে এটিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে গ্রহণ করবে। আমি সত্যই আশা করি যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আমার 'বিশেষ প্রিয় ছেলেটি'র (যদিও বয়স ২৬, তবুও বালকের মতো) সাহায্যে একটি নতুন যুগের সূচনা সম্ভব। স্বামীজী ঠাকুর পরিবারের সদস্যাদের উপস্থিতিতে রামমোহন রায়কে নিয়ে বহু-প্রতীক্ষিত আলোচনা করলেন।

প্রিয় য়ুম, তুমি তো বলে থাক, দুই-একজন হিন্দুকে আমরা এত অজস্র ভালোবাসা দেব যা সমস্ত হিন্দুজাতির পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। কিন্তু সত্যিই হিন্দুজাতি কত না মহৎ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছে! এই মুহূর্তে আমার সামনে তিনজন দেবোপম মানুষ উপস্থিত—স্বরূপানন্দ, মিস্টার পাদশা এবং ডঃ বোস। আমার পক্ষে বলা মুশকিল কোনজন শ্রেষ্ঠ। আমি তিনজনকেই শ্রদ্ধা করি। মিসেস বোস তাঁর স্বামীর পরিপূরক যেমন Mrs. Apperson তাঁর স্বামীর ক্ষেত্রে। কেবলমাত্র মানুষ হিসেবেই তিনি (ডঃ বোস) তুলনাহীন। Mrs. Apperson এবং Mr. Olive-এর মধ্যে আমি এই দুর্লভ গুণের আভাসমাত্র পেয়েছি। Mr. Olive-কে হয়তো কোনওদিন তোমার দেখার সুযোগ হবে না। সেদিন বিকালে আমি নির্বোধের মতো প্রগল্‌ভ হয়ে শিকারী দলের সঙ্গে আমার যোগ দেওয়ার কথা বলছিলাম। আমি জানতাম এতে তিনি কষ্ট পাবেন। তবু গোঁ-ভরে নিজের মত ধরে রইলাম। তখন তিনিই আমার আক্রমণের লক্ষ্য। হঠাৎ তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন—তাঁর মুখ রাগে ও উত্তেজনায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। উচ্চকণ্ঠে বললেন, "কেন তুমি এত নির্মম! তোমার এইসব ভালো বই পড়ার কী অর্থ যদি তুমি হৃদয় দিয়ে কিছু অনুভব করতে না পার!" কথা শেষ করে তিনি বারান্দায় গিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন। আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। আমি বুঝলাম, তাঁর কথা খুবই সত্য। তবু আমি খুশি যে অমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলেছিলাম। কারণ শুধু সেইজন্যই তাঁর ভিতরের মহত্ত্বকে ঝলসে উঠতে দেখলাম। আমার মনের ওপর তার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। কথার শক্তি বড়ো সীমিত। বুঝতে পারছি সেই মুহূর্তটিকে বিন্দুমাত্র তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারছি না। তবু বিশ্বাস করি, তুমি বুঝতে পারবে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে, "এই অভিজ্ঞতাটি য়ুমকে জানাতে হবে।"...

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে লাগলেন। আমার কালীর ওপর বক্তৃতা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের একটা ভিত্তি রচনা করেছিল। সুতরাং প্রতীকতত্ত্বকে ঘিরে আলোচনা চলছিল। এমন সময় মোহিনীবাবু এসেছিলেন। স্বামীজী বললেন, "বেচারা মোহিনী, ও কোনওদিন প্রতীকতত্ত্বের ইতিহাস পড়েনি। সুতরাং বুঝতে পারবে না নৈসর্গিক প্রতীক কোনও কাজের নয়। দেখো, আমাকে একটা বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে

গিয়েছিলাম—তাঁকে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু তাঁর সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে খুবই অপছন্দ করতাম। ছ-বছর ধরে দিনরাত তাঁর সঙ্গে এক প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছিল। আমি তাঁকে বলতাম—আপনি আমাকে যা যা করতে বলছেন, তার আমি এতটুকুও গ্রহণ করছি না। তিনি বলতেন—তাতে কিছু এসে যায় না, শুধু করে যাও, দেখবে তার একটা নিশ্চিত ফল পাবে। সবসময় আমার ওপর তিনি অগাধ ভালোবাসা ঢেলে দিতেন। এমনভাবে আমাকে কেউ ভালোবাসেনি, পিতা নয়, মাতা নয়, আর কেউ নয়। তার সঙ্গে শ্রদ্ধাও মেশানো ছিল। আমার সম্বন্ধে তাঁর এক ধরনের উঁচু ধারণা ছিল। আমার মনে হয় তিনি ভাবতেন যে, ভবিষ্যতে ছেলেটি বিশেষ কেউ হয়ে উঠবে। ফলে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত সেবার কোনও কাজ আমাকে করতে দিতেন না। তাঁকে একটু বাতাস করা বা অনুরূপ সেবা—কিছুই নিতেন না। কিন্তু মোহিনীর সেরকম কিছু ঘটেনি।''

প্রিয় জয়, আমি জানি এ-ধরনের টুকরো টুকরো ঘটনা তোমার খুব ভালো লাগে। আমাদের বাড়ির উলটোদিকে মাটির ঘরে গত শনিবার রাতে একটি বালিকার অতি করুণ মৃত্যু হল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম ও তাকে মারা যেতে দেখলাম। অসুস্থ স্বামী যোগানন্দকে শোকার্তদের ভয়াবহ কোলাহল থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আমি সেখানে রয়ে গেলাম। মহিলাদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। প্রথমে তো কিছুই করতে পারলাম না। পরে তারা ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ায় একটু সুবিধে হল। সেই মৃতা বালিকার মা শ্রান্ত হয়ে তার নিজের গর্ভধারিণীর উদ্দেশে বার বার করুণকণ্ঠে বলতে লাগল, ''মা, আমার মেয়ে কোথায় গেল?'' এইরকম একটি মুহূর্তে ক্রিশ্চান মিশনারিদের ভয়ংকর অসহায় অবস্থার কথা ধারণা করতে পারলাম। কন্যাহীনা মায়ের মাথাটি আমার হাঁটুর ওপর ন্যস্ত ছিল। আমি তাকে বললাম, ''শান্ত হও, তোমার সন্তান এখন জগজ্জননীর কাছে—সে এখন মা কালীর কাছে।'' কথাটা শুনে আশ্বস্ত হয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তখন আমি তাকে যে ভাঙা ভাঙা ভাষাতেই সান্ত্বনা দিতে পারলাম—এতে আমি খুব তৃপ্ত। ঠিক সেইসময় আমি নিজেকে তাদের একজন বলে ভাবতে পারছিলাম। আদর্শ, ধর্ম, বিশ্বাস বা অন্য কোনও পার্থক্য রইল না। তারা তো ঠিক সেইরকম আশ্বাসই চেয়েছিল, যেমনটি আমরাও অনুরূপ পরিস্থিতিতে চেয়ে থাকি। বালিকাটি এখন জগজ্জননীর ভালোবাসায় শান্তি পেয়েছে। সেখানে শুধুই আনন্দ ও বিশ্রাম। আমি তারপরও

ঘণ্টাখানেক মৃদুস্বরে কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের নামগান করলাম। লক্ষ্য করলাম কালীর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম যেন বেশি আপনার। মাঝে মাঝেই কান্নার রোল উঠছিল, কিন্তু জানি সেটা স্বাভাবিক। পরের দিন সকালবেলা স্বামীজীর কাছে এই অভিজ্ঞতার কথা একটু জানালাম। আমি কৃতজ্ঞ যে, আমি 'তাদের ভাষাতে কথা' বলতে পারলাম। আরও বললাম, যে-সত্য আমি প্রচার করছিলাম সেটি যে সঠিক তার প্রমাণ পেলাম। তিনি বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ জগতকে এই শিক্ষা দিতে এসেছিলেন যে আমরা যেন প্রত্যেকের সঙ্গে তার নিজের ভাষায় কথা বলি; তিনি একমাত্র অবতার যাঁর জীবনে এর প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেখেছি।" এর জন্য কি কেউ আমাদের অনুপম খ্রিষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে?

ম্যাক্সমূলরের বইয়ের আমার করা সমালোচনা শনিবারের স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে—দু-কলমব্যাপী। এটা খুবই ভালো হয়েছে। এম্প্রেস পত্রিকার লোকেরাও, ৩৫ ছাতাওয়ালা লেন, বৌবাজার স্ট্রীট—নেটিভ পাড়ার জীবনযাত্রা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে দিতে বলেছে। আমি এখানে আমার বাসস্থান সম্বন্ধে একটা ভালো রচনা লিখে পাঠিয়েছিলাম, সেটা ডাকের গোলমালে হারিয়ে গিয়েছে। সুতরাং গতকাল আমাকে আবার লিখে দিতে হল এবং যা তা করে লিখেছি। কারণ, তুমি যে আমার একজন পাঠিকা সেই বোধটি—প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বার কাজ করেনি।

এই চিঠি পাওয়ার অনেক আগেই তুমি আমেরিকায় পৌঁছে যাবে। আগামী কালই কেন রওনা হচ্ছ? আশা করি তোমার লন্ডনবাস সুখকর হয়েছে এবং আমেরিকা যাওয়ার পথে সমুদ্রযাত্রাও উপভোগ করবে।

তুমি কি আমার আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে কোনও সুখবর দিতে পার? আমি যেন বড়ো বেশি স্পর্শকাতর হয়ে গিয়েছি—তাদের হস্তাক্ষরে কোনও চিঠি পেলে আশঙ্কায় কেঁপে উঠি। আমার ইচ্ছা হয় পড়ার আগেই সেটা পুড়িয়ে ফেলি। বাস্তবিক তাদের সম্পর্কীয় সবকিছুতেই আমি নির্বোধের মতো নার্ভাস হয়ে পড়ি। কিছুদিন আগেই আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছিল স্বগৃহ ও স্বজনদের জন্য কাতর হয়েছি কিনা। তখন আমি তাকে বললাম, কোনও ভয়ংকর ঘটনা আমার অজান্তে তাদের সকলকে অন্য জগতে না নিয়ে যাওয়া অবধি আমি স্বস্তি পাব না। আমি জানি এটা একেবারেই অর্থহীন কিন্তু আমার পক্ষে যুক্তিবিচার করতে যাওয়া বৃথা। আমি চাই এই চিন্তাটিকে দূরে

সরিয়ে রাখতে, ভুলে যেতে চাই তাদের অস্তিত্ব। আমার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ, এই মনোভাব সত্ত্বেও আমি এখানকার জীবনকে ভালোবেসেছি। তুমি কি একটি অসুস্থ মনের চিকিৎসা করতে পার? তা যদি পার, তাহলে, প্রিয় জয়, তুমি আমার মনটিকে সারিয়ে তোলো। আমার মনটিকে একটু তুলে ধরো যাতে সকলের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি যাই ভাবি না কেন, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আমার মনোযোগের ওপর নির্ভর করছে না—যদিও আমার প্রায় সেইরকমই একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রিয় জো, এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি কারণ কাজ করতেই হবে—পারি বা না পারি।

মার্গট

তোমাকে আর মিসেস বুলকে লেখা পত্র দুটি একসঙ্গে পাঠানো নির্বুদ্ধিতা কিন্তু আমার একটিমাত্র খামই আছে। তাছাড়া এতে কিছু লাভও হতে পারে। তোমাকে অনেক কথা বলার ছিল। আজকে সদানন্দ তোমার উল্লেখ করে যখন বলল, "আমার আদরের মা জননী মিস ম্যাকলাউড", তখন কথাটি খুব গভীরে স্পর্শ করেছিল। ওঃ, কথাটার সবটা এখন মনে পড়ছে : "যে সহনশীলতা আমরা তোমার মধ্যে, আমার আদরের মা জননী মিস ম্যাকলাউড আর গ্র্যানির মধ্যে দেখেছি" ইত্যাদি। আমার ইচ্ছে করছিল সেই বালিকার মৃত্যুর সময় যদি তুমি থাকতে! বিশেষ করে সেইসময় যখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—মনে হল সে-কণ্ঠস্বর 'একজন সৈনিকের, একজন সজ্জনের'। তিনি বলছিলেন, "শুনলাম, সিস্টার নিবেদিতা নাকি এখানে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে এসেছি।" তিনি যেন আমার পাশে অশ্বারোহী প্রহরীর মতো দাঁড়ালেন। কী যে ভালো লেগেছিল! ...তাঁর উপস্থিতি কেবল শক্তির উৎস নয়, অপরূপ শৌর্যেরও প্রকাশ। সত্যিই অনুপম। মনে হচ্ছে, তোমাকে বলার মতো কথা অফুরন্ত।

সর্বদাই তোমার নিজ সন্তান

মার্গট

মিসেস কলস্টনের কাছ থেকে সুন্দর চিঠি পেয়েছি। পরের সপ্তাহে উত্তর দেব। অর্থই একমাত্র অসুবিধা। অপরদিকে, যদি আমাকে যেতে হয়, তিনি কি আমার জায়গা নিতে পারবেন?

॥ নয় ॥

১৬ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯

প্রিয় লেডি সারা,

এখন রাত্রি দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। কাল ডাক যাওয়ার দিন কিন্তু কাল একেবারেই সময় পাব না। এদিকে তোমাকে কথা দিয়েছি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা লিখে পাঠাব।

গত রবিবার সকালের কথা। গাড়ি বেশ সকাল-সকাল এসেছিল এবং আমরা আটটার আগেই ঠাকুরবাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। জান তো, বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন আর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে থাকেন না। তিনি জোড়াসাঁকোয় চলে এসেছেন। তাঁর বাসনা, যে-গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। এ-বাড়ির একটি সুন্দর সাদামাটা ছোটো ঘরে তিনি বাস করছেন। ঘরটি ছাদের ওপর—বেশ রোদ আসে।

ওঁদের পরিবারের দু-একজন পথ দেখিয়ে ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী মহর্ষির সামনে এসে হাতজোড় করে বললেন, "প্রণাম"। আমি তাঁকে দুটি গোলাপ ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম। বৃদ্ধ মানুষটি আমাকে সংক্ষেপে আশীর্বাদ জানিয়ে স্বামীজীকে বসতে বললেন। এরপর তিনি দশ মিনিট ধরে বাংলায় অনুযোগের সুরে স্বামীজীকে কিছু বললেন। তাঁর কথা শেষ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। স্বামীজী অত্যন্ত বিনীতভাবে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তিনিও আশীর্বাদ জানালেন। আমরা আগের মতো তাঁকে অভিবাদন করে নিচে নেমে এলাম।

স্বামীজী হয়তো তখনই ফিরে যেতে পারতেন কিন্তু আমাদের সেটি অভিপ্রেত ছিল না। আমরা ড্রইংরুমে এসে বসলাম। সেখানে 'মিস টেগোর' (সম্ভবত মহর্ষি-কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর আত্মজা সরলা ঘোষাল) স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ক্রমে পরিবারের অন্যান্য সদস্য—প্রধানত পুরুষেরা সমবেত হলেন। স্বামীজী নিজে চা খেলেন না কিন্তু আমাকে দিতে বললেন। তিনি একটি পাইপ গ্রহণ করলেন এবং এইসব ছোটো ছোটো ঘটনা ও কথাবার্তায় দশটা বাজল। শ্রীমোহিনীমোহন চ্যাটার্জী ন-টায় এসে পৌঁছেছিলেন।

আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল প্রতীক উপাসনা—বিশেষত কালী উপাসনা। আলোচনার প্রথমেই স্বামীজী বললেন আধুনিক ভারত যাঁদের জন্ম দিয়েছে, রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রতীক উপাসনা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কী ছিল সে-কথাও উঠল। তারপর 'বামাচার'-এর প্রসঙ্গ এলে আমার ক্ষণিকের জন্য মনে হল এই বুঝি স্বামীজী প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। তিনি সুরাপান ইত্যাদি বামাচার প্রথার অনুকূলে রামমোহনের একটি উদ্ধৃতি দিলেন। সে অকাট্য যুক্তির সামনে কেউ প্রতিবাদ করতে পারলেন না অথচ এই অভিমত তাঁরা যে সমর্থন করছেন না, এটাও সুস্পষ্ট ছিল। আমার বিশ্বস্ত বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) এই অভিমতের পক্ষে কথা বলে প্রতিপক্ষের সম্মিলিত আক্রমণের লক্ষ্য হলেন। আলোচনা আরও অনেক দূর গড়াল। শেষে স্বামীজী নরম সুরে সব মতগুলির সমন্বয় করে বললেন তাঁদের চিন্তাধারা প্রকৃত হিন্দু ভাবাশ্রয়ী সন্দেহ নেই কিন্তু অন্যান্য মতগুলিকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। প্রতীক উপাসনার ক্ষেত্রে এইসব বিভিন্ন ধারা হিন্দুধর্মের সনাতন আদর্শের সঙ্গে যুক্ত।

আগের দিন রাতে স্বামীজীকে আমি বলেছিলাম যে, ব্রাহ্মদের সকলের অনুযোগ তাঁরা স্বামীজীকে চেনার কোনও সুযোগ পাচ্ছেন না। উত্তরে স্বামীজী বললেন, যে-কোনও দিন তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করতে প্রস্তুত। পরে বলেছিলেন, ‟আগামী কাল ঠাকুরবাড়িতে যাচ্ছি, আশা করি তার ফল ভালোই হবে।”

উভয় পক্ষই পরস্পরের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। স্বামীজী ও তাঁর স্বজাতির মানুষদের মধ্যে একরকম প্রত্যক্ষ যোগসূত্র হতে পারায় আমিও বেশ আনন্দ বোধ করছিলাম। আমি হিন্দু হলে এটা কখনওই সম্ভব হত না। বিদায় নেওয়ার সময়, ঠাকুর পরিবারের অনেকে বলাবলি করছিলেন যে তাঁরাও একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে সদলবলে মঠে যাবেন। আগামী কাল রক্ষণশীল হিন্দুদের পুরোধা নাটোরের মহারাজা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন। অবশ্য এসবই অর্থহীন যদি না জীবন ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি মনে-প্রাণে সেটাই চাই। একটি ছাব্বিশ বছরের যুবককে নতুন ভাবধারার মধ্যে টেনে আনা সহজ কথা নয়, এর ভিতরেই রয়েছে সার্থকতার প্রতিশ্রুতি।

প্যারিস থেকে লেখা তোমার সুন্দর চিঠিখানি খুবই সাহায্য করেছে। আগামী শনিবার স্বামীজী শেষ পর্যন্ত আমাকে পি. কে. রায়দের ওখানে চায়ের

নিমন্ত্রণ রাখতে নিয়ে যাচ্ছেন। ইচ্ছে করে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে— যদিও আজকের ভারতে যেসব নারী নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন তাঁরা সমগ্র নারীজাতির উন্নতির ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করছেন।...

টেলিগ্রাম এসেছে যে আগামী কাল অভয়ানন্দ (স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা মাদাম লুই) বোম্বাই পৌঁছাবে। স্বামীজী তাকে টেলিগ্রামে জানিয়েছেন যে, সে যেন সর্বপ্রথম মাদ্রাজে গিয়ে বক্তৃতাদি করে। যেহেতু ১৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব, আশঙ্কা হচ্ছে, অভয়ানন্দ স্বামীজীর কথা অগ্রাহ্য করতে পারে। সে হয়তো সোজা কলকাতায় এসে হাজির হবে এবং আমার এখানেই উঠবে। প্রিয় মিসেস বুল, এছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছি না।

সদানন্দ যথার্থই একজন দেবদূত। সন্তোষিণী এখন আমার সহকারী হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু তার পক্ষে এখানে রাত কাটানো সম্ভব হবে না। আমাকে সাহায্য করতে সদানন্দ সর্বদা প্রস্তুত। এক সপ্তাহ আগে রেলওয়ের একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী হিসেবে উগান্ডা চলে যাওয়ার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল। আপাতত সে-ইচ্ছা মুলতুবি রাখতে হয়েছে। কারণ যাওয়ার আগে সে দেখতে চায় সন্তোষিণী এখানে স্থায়িভাবে থেকে স্কুলের কাজকর্মে আমাকে সাহায্য করছে কিনা। ইতিমধ্যে স্বামীজীও তাকে মঠে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং সদানন্দের উগান্ডা যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়েছে।

সদানন্দের মুখে মাঝে মাঝে আমার ছোটোখাটো প্রশংসা শুনতে পাই, তবে কেমন যেন মনে হয় কথাগুলি গিরিশবাবুর কথার প্রতিধ্বনি, যিনি সম্প্রতি আমার অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছেন। আমার সময় ও স্মৃতি অনুকূল হলে গিরিশবাবু ও আমার কথোপকথন যদি তোমাকে লিখে পাঠাতাম তবে তুমি তা শুনে হেসে উঠতে। সম্প্রতি গিরিশবাবুর সঙ্গে একদিনের আলোচনা আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল। সেখানে এমন একজন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ উপস্থিত ছিলেন যিনি সমানে উত্তেজনা বাড়াচ্ছিলেন। তাঁর অভ্যাস লোকের আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়া এবং আমরা যে কথাগুলি এড়িয়ে যেতে চাই সেগুলিকেই তুলে ধরে প্রবল প্রতাপে নিজের মত জাহির করা।

স্বামী সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ এখন গুজরাটে। শুনেছি তাঁরা খেতড়ির রাজার সঙ্গে দেখা করেছেন।... রবিবারে আমাকে মিনার্ভা থিয়েটারে নব ভারতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে ভাষণ দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের পর অভয়ানন্দ কয়েকটি অথবা সব বক্তৃতাই দেবে।

তোমার চিঠি আমি স্বরূপানন্দকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমায় ধন্যবাদ দেওয়ার চেষ্টা আমি করব না কিন্তু তোমার সুন্দর নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করব। আমার আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত মহলে তোমার সহৃদয় স্পর্শ আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তারা হয়তো তোমায় উপযুক্ত সম্বর্ধনা দিতে পারেনি কিন্তু আমার শুধুমাত্র আশা যে তারা অন্তত একটু চেষ্টা করেছিল।

একান্ত প্রিয় গ্র্যানি আমার,
তোমার কন্যা মার্গট
রাত্রি ১১টা ৫ মি.

॥ দশ ॥

১৬ নং বোসপাড়া লেন
সোমবাব, সকাল
[২৮-২-১৮৯৯ (?)]

প্রিয় জয়,

দুটো ক্লাস নিতে হল না। সুতরাং তোমাকে কিছু সময় দিতে পারি। স্বামীজী সিমলা স্ট্রীটে গেছেন তাই তোমার চিঠি নিয়ে এখনই তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। আমার বক্তৃতায় যোগ দিতে তিনি কাল বিকেলবেলায় এসেছিলেন—তাঁর পক্ষে এতটা করা অভাবনীয়, তাই না? বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন, আজও কলকাতায় রয়ে গেলেন। কারণ সরলা ঘোষাল তিনটের সময় আমার কাছে আসছে। গত সন্ধ্যায় ঠাকুর পরিবারের লোকেরা ও মোহিনী মঞ্চে আমাকে ঘিরে ছিলেন। স্বামীজীর অনুমতি নিয়ে রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্র ঠাকুরের উল্লেখ করেছিলাম। গত দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের এই আনুগত্য একটা বড়ো ঘটনা।

আমার সেই ছেলেটি অর্থাৎ সুরেন্দ্র একাই এসেছিল (সঙ্গে নাটোরের মহারাজ ছিলেন না) এবং আমরা তিন ঘণ্টা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। সে প্রকৃত অর্থেই একজন 'hero' এবং আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত। তার সমস্ত সত্তায় জাতীয়তাবোধ জাগ্রত। আমি এই কথার দ্বারা কী বলতে চাই

তা তুমি বুঝবে। সুরেনকেও আমি আমার প্রিয় মন্টেগুর মতোই স্নেহ করি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে শ্রদ্ধা। স্বামীজী খুব খুশি হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, গতকাল আমার বন্ধুরা বাঙালি পরিচ্ছদে এসেছিলেন। তিনি সরলাকে স্নেহ করেন। গতকাল রায় দম্পতির কাছ থেকে চায়ের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমার বিশেষ অনুরোধে স্বামীজীও আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু মিসেস রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন (সুতরাং চায়ের নিমন্ত্রণে যেতে হয়নি)। স্বামীজী বললেন, "মার্গট, আমিও একটু মিস্টিক (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে), যখন মিসেস রায়ের অসুস্থতার কথা শুনি, তখনই মনে হল—ঈশ্বরই জানেন কোনটি ভালো। তুমি তো জান, যা আমার পক্ষে মঙ্গলকর নয়, এমন পরিস্থিতি থেকে তিনি আমাকে সর্বদাই রক্ষা করে থাকেন।" বাস্তবিক, আমার মনঃকষ্ট ও সরে আসার ব্যাপারে মিসেস রায় ও মিঃ মুখার্জী যে নীবব সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তাতেই সমস্ত ব্যাপারটি মর্মান্তিক সমর্থন লাভ করেছে। ওঃ এটা না হলেই ভালো হত। তোমার কী মনে হয়?

মিস ম্যানিং মাদ্রাজ থেকে মাদুরের কয়েকটি প্যাকেট পাঠিয়েছেন। তিনি খুব ভালো, তাই না? তুরীয়ানন্দ ও সারদানন্দ গুজরাটে রয়েছেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে সরাসরি কোনও খবর পাইনি। কিন্তু কেউ কেউ বলছে তাঁরা খেতড়ির রাজার সঙ্গে দেখা করেছেন।

আমার ছোট্টো মসলিনের গাউনটা পরে বক্তৃতা দিতে যেতে চেয়েছিলাম। প্রিয় জো, কিন্তু কিছুতেই তা পারলাম না। দুদিনই আমি ব্রহ্মচারিণীর কাশ্মীরী গাউনটিই পরেছিলাম। আশা করছি তোমাকে আর সেন্ট সারাকে কালীর বিষয়ে বক্তৃতা পাঠাতে পারব। সেটি ছাপা হয়ে গিয়েছে শুনছি।

আমার ইচ্ছে তুমি বা মিঃ লেগেট এম্‌প্রেস পত্রিকার গ্রাহক হও। আমি যতদূর জানি এটি কলকাতার একমাত্র পত্রিকা যাতে অনেক ছবি থাকে। এম্‌প্রেস পত্রিকা আমার প্রবন্ধ নিয়ে ছবি দিয়ে ছাপতে চায়। সুতরাং গ্রাহক হলে তোমরা এখানকার সরকারি জীবন ও অন্যান্য ঘটনার মোটামুটি খবর রাখতে পারবে। ঠিকানা—এম্‌প্রেস অফিস, ৩৫ ছাতাওয়ালা লেন, বৌবাজার, কলকাতা। অথবা থ্যাকার স্পীঙ্ক এন্ড কোং-এর মাধ্যমে।

সুরেন্দ্র তাদের জমিদারি সংক্রান্ত যেসব পরিকল্পনার কথা আমাকে বলেছে, সেইগুলি তোমাকে জানাতে ইচ্ছে করে—আর কলকাতার উপকণ্ঠের অধিবাসী এক দরিদ্র লোকের কথা, যার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ভারতে একটি

টেকনিক্যাল স্কুল খোলা ইত্যাদি। ভারতবর্ষ মৃত নয়, সুপ্তও নয়—আমাদের ও রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বাদ দিলেও খুব বেশিরকম জীবন্ত এবং ভারতবর্ষ খুব দ্রুত আধুনিক হচ্ছে।

ইংল্যান্ড ও তোমার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আর একটা কথা আছে।

একজন মিশনারি মহিলার এখানে এসে দেখা করার সময় নেই বলে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। লেডি সারার পত্রের একটি কথা অনুসারে চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। আমি গিয়েছিলাম। ডঃ ম্যাকডোনাল্ডের বাড়িতেই তিনি রয়েছেন ও একটি স্কুল করেছেন। ব্যবহার খুব মধুর, একদা উইম্বলডন হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি মনেপ্রাণে একজন শিক্ষাবিদ, অনেক বই আমাকে পড়তে দিয়েছেন ও আমার কিছু পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। ইতিহাস বোঝার জন্য সাহায্য চাইলেন এবং বললেন, "আমার সাহস থাকলে, তোমাকে আমার স্কুলে পড়াতে ডাকতাম।" অপ্রত্যাশিত জায়গায় একটি নতুন বন্ধু পেলাম। ইংরেজ ভদ্রলোকটি এসেছিলেন এবং গতকাল বেলুড় মঠে যান। যে-কোনও ইংরেজ আমাদের কাজে যোগ দিলেই ভালো—আর এই ভদ্রলোকটির তো যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য সদ্‌গুণ রয়েছে।

স্বামীজী বললেন, ভালো করে ঘুমাতে পারলে বেঁচে যান—এখানে আসার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব—কিন্তু ভদ্রলোক তো ঝাড়া দু-ঘণ্টা বসে রইলেন।

আমার বক্তৃতা শেষ হলে আমি প্রবেশ দ্বারের কাছে এলাম। স্বামীজী সেখানে সরলা ও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। সরলার সঙ্গে কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমাকে দেখামাত্র স্বামীজী উচ্চকণ্ঠে বললেন, "মার্গট, তুমি অসম্ভব ভালো বলেছ।" আমার খুব মজা লাগল। স্বামীজীর এমন করে বলাটা খুব চমৎকার, তাই না? সমস্ত সমালোচনা বা অন্যান্য ইঙ্গিত ছিল গাড়িতে বলার জন্য, সকলের সামনে শুধু বললেন—আমি অসম্ভব ভালো বলেছি। তাঁকে দেখার জন্য ভিড় হয়েছিল, তিনি আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবেন বলে আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, "না, আমি তোমার পরে যাব। ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত সকলকে দেখাতে চাই।" খুব নিচু স্বরে এইটুকু নির্দেশই ছিল যথেষ্ট।

* * *

এবার, আমার প্রিয়তম য়ুম। লন্ডন থেকে তোমার প্রথম পত্র এসেছে। ডাক-টিকিটটিকেই আমি অতি আদরে গ্রহণ করলাম। ছাপমারা রয়েছে—

ডোভার স্ট্রীট। কী সুন্দর! কিন্তু হায়, আমি তো বুঝতে পারছি, তুমি একেবারেই সুস্থ নও বরং বিধ্বস্ত। এটা তোমার ধারা। বিরাট খরচ করে ভ্রমণের শেষে ভেঙে পড়। এখন আমার মনে হচ্ছে, শ্রীনগরে চিনার গাছগুলির তলায় আমাদের ছোট্টো তাঁবুতে তুমি যত ভালো ছিলে—এমনটি আর কোথাও কখনও ছিলে না। তোমার সঙ্গ সেখানে আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে। আমি খুবই আশা করছি স্বগৃহে পৌঁছে তুমি আবার পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

মনে হচ্ছে, মিসেস জনসনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। তোমার পরের পত্রটিতে উইম্বলডনের সংবাদ থাকবে। লন্ডনের বিষয়ে আমি এখন নিশ্চিন্ত কারণ আমি দেখছি যা-কিছু দেওয়া হচ্ছে তার মধ্য থেকে তোমাকে ভালোমন্দ বিচার করে নিতে হবে। আমার মনে হয় না মিসেস কিম্‌লিফকে আমি চিনি, তিনি কি 'আমেরিকান মহিলা' নামে যে ভদ্রলোককে ডাকা হয়, তাঁরই স্ত্রী?

প্রচণ্ড গরম পড়েছে, আমার ঘড়িটাও ভুলভাল চলছে। মাথাটাও শূন্য মনে হচ্ছে। আপাতত এটাই আমার একমাত্র কৈফিয়ত।

এই সপ্তাহে মিসেস কলস্টনকে লিখতে পারব, আশা করি। যদি আমাকে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হয় তবে তাকে আমার জায়গা নিতে হতে পারে।

স্বামী অভয়ানন্দ বম্বেতে। আজ সেখানে তাঁর বক্তৃতা আছে। তারপর মাদ্রাজে। শেষেরটি এখানে—১৯ মার্চ। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে। তিনি শরৎকালে যখন স্বদেশে ফিরবেন তখন মাদ্রাজ হয়ে যাবেন, সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে—কলকাতা (ভৌগোলিক বিচারে) দার্জিলিঙের কাছে। এখানে তিনি আমার কাছেই থাকবেন—স্বামীজীকে কোনওরকম তর্কাতর্কির হাত থেকে মুক্তি দিতে এছাড়া আর তো কোনও বিকল্প নেই। আমি তো Miss. M.-কে সহ্য করেছিলাম—এখন দেখতে হবে এটাও পারি কিনা। যদি আমি না পারি, তবে বুঝতে হবে আমার নিজের মধ্যেই পরিবর্তন এসেছে।

কিন্তু আমার শোয়ার ঘরে লেখার জন্য একটা ছোট্টো টেবিল দরকার। তোমার বিছানা ও পূজার ঘর তাঁকে দেব। স্বামীজীর যে কত দুশ্চিন্তা আমি তা বুঝতে পারছি। তিনি বলছেন, "অভয়ানন্দ সেভিয়ারদের বা কারও কাছেই যেতে পারবে না।" আমি আশা করছি যে ফেরার টিকিট তিনি করে আসছেন। স্বামীজী তাঁর রেল ভাড়ার টাকার জন্যও চিন্তিত।

বুধবার সকাল—দুদিকে লেখার পক্ষে চিঠির কাগজটি জঘন্য—মনে হয়, এর তলায় সাদা কাগজ রাখলে তুমি পড়ে নিতে পারবে।

এই সপ্তাহে ঠাকুর পরিবারের একটি কন্যার বিবাহ—গত রবিবারে প্রাক বিবাহ ভোজে গিয়েছিলাম। কাল রাত্রে বিবাহ বাসর আর বৃহস্পতিবার প্রীতিভোজ বা যাকে এরা 'ফুলশয্যা' বলে তার নিমন্ত্রণ। তোমার কাছে সব বর্ণনা করব না কারণ এম্‌প্রেস পত্রিকার জন্য এই বিষয়ে লিখব। গতকাল তোমাকে ও লেডি সারাকে 'কালীর ওপর বক্তৃতা' পাঠিয়েছি, আর ম্যাক্সমূলরের 'রামকৃষ্ণ' বইটির রিভিউও তোমায় পাঠিয়েছি।

আরও কতদিন ধরে এই দীর্ঘ চিঠিগুলি লিখতে থাকব জানি না। একজনকে লিখতেই আমার জীবনের সবসময় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বেচারা স্বরূপ—তাঁর প্রতিবাদের কথাও তোমাকে জানিয়েছিলাম। যাই হোক, তাঁকে একটা ছোট্টো চিঠি দিয়েছি।...

প্রিয় জো, আজকের মতো বিদায়। আমার মনে হচ্ছে, স্কুলের সময় প্রায় হয়ে গেছে।

তোমার মার্গট

॥ এগারো ॥

৭ এভিন্যু, কেম্ব্রিজ, মাস.
১৭ নভেম্বর, ১৯০৮

মা আমার,

সবে ভোর হয়েছে। নিমের বাড়িতে তোমার অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকার দৃশ্যটা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না। তোমার ওখানে এখন বেলা এগারোটা। আমার হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরে তোমাকে যদি একটু আরাম দিতে পারতাম। মাগো, ভগবান সব জায়গাতেই আছেন। তোমার কষ্টটা যদি একটু কমত। আবার তোমাকে বলতে ইচ্ছা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, স্বামীজীর কথা, (দক্ষিণেশ্বরের)বাগানে তাঁদের অপূর্ব জীবনের কথা। তাঁদের জীবনযাত্রাই অন্যকে বিশ্বাস করায় যে ঈশ্বরই সব হয়েছেন। তা আমরা বুঝতে পারি আর না পারি। ওঃ তোমাকে তাঁরা কীভাবেই না সাহায্য করতে পারতেন। শুধুমাত্র একটু স্পর্শ অথবা চোখের একটা চাহনি, একবার তাঁদের দর্শন, তোমাকে সব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে পৌঁছে দিত। তখন তোমার হৃদয়ে শান্তি আর গভীর আনন্দের

অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই থাকত না। মাগো, আমাদের সবটাই ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

আমরা সবাই তোমাকে কত ভালোবাসি, আর তুমিও কতই না ভালোবাসো আমাদের। তুমি এতবছর ধরে আমাদের জন্য কত কষ্ট না সহ্য করেছ, কিন্তু কোনওদিন কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করোনি। এ কোনও লোকদেখানো ভালোবাসা নয়, এ হল সেই ভালোবাসা যা শাশ্বত। যখন এই চিঠিটি তোমার কাছে পৌঁছাবে, তখন তুমি হয়তো যন্ত্রণায় এত কাতর যে চিঠি পড়ার মতো অবস্থা তোমার নাও থাকতে পারে। মাগো, আমি সবসময়ই প্রার্থনা করছি যাতে তোমাকে যন্ত্রণা ভোগ না করতে হয়। তোমার যন্ত্রণা যদি আমি নিতে পারতাম!

আমার মিষ্টি মা, আদর্শ ভালোবাসা হল পরিপূর্ণ প্রশান্তি, যখন আমি আমার ছোটো ধ্যানঘরে তোমার জন্য প্রার্থনা করতে যাই, আমার মন তখন ঠিক এরকম এক শান্তভাবে ভরে ওঠে।

মা আমার, ঈশ্বর তোমায় সর্বক্ষণ ঘিরে থাকুন। এ জগৎ স্বপ্নবৎ, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। হে শিব, আমার তরী তুমি ওপারে বেয়ে নিয়ে চলো।

॥ বারো ॥

৩ নং ওক এভিনিউ,
হোয়ার্ফডেল স্থিত বার্লি, ইয়র্কস,
৩০ জানুয়ারি, ১৯০৯

প্রিয় য়ুম,

গত মঙ্গলবার সকালে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেইসময় তাঁর পাশে ছিলাম শুধু নিম আর আমি। আমি মৃদু স্বরে 'হরি ওঁ' মন্ত্র শুনিয়েছি যাতে এটিই তাঁর শোনা শেষ শব্দ হয়। ভগবানের কত দয়া যে ঠিক সময় আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর কাছে। বৃহস্পতিবার মা বলেছিলেন, এবার তিনি 'পরিপূর্ণ শান্তিতে' মরতে পারবেন। যে চব্বিশ ঘণ্টা আমরা একসঙ্গে ছিলাম, লক্ষ্য করে দেখেছি মায়ের অন্তরাত্মা সম্পূর্ণভাবে পরপারের অভিমুখী। শুক্রবার সকাল থেকেই তাঁকে ওষুধ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল। তিনি 'ভারতীয়দের ন্যায় মৃত্যুবরণ' করছেন এটিই ছিল তাঁর শেষ বোধগম্য

কথাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মনে হয়, তিনি অগ্নি-সংস্কারের কথা বলেছিলেন, যা তিনি চেয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকালে সৎকার করা হল। আমাদের যাজক অতি সুন্দর পাঠ করলেন—শুধুমাত্র এইটুকু পরিবর্তন করে—"অগ্নিতে সমর্পিত হোক ওঁর দেহ, পুনরুত্থানের নিশ্চিত আশ্বাস নিয়ে।" আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছিলাম এই ভেবে যে তাঁর দেহমুক্ত আত্মার পুনরুত্থান তো হলই শুধু তাঁর জীর্ণবাসটি পুড়ে ছাই হল।

মায়ের অভাব যে কী তা বলে বোঝানোর নয়। মনে হচ্ছে, সবই যেন কেমন অকারণ, অর্থহীন। এবার আমার কর্তব্য যথাসম্ভব শীঘ্র ও নীরবে ভারতে ফিরে যাওয়া। আমি বুঝিনি, আমার জীবনে তাঁর অবদান কতখানি। এখন দেখি, শুধুমাত্র তিনি (মা) ছিলেন বলেই কত কিছু সম্ভব হয়েছে আমার জীবনে। কিন্তু আমার আদরের ছোট্টো মা, এই মৃত্যু যেন তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ লগ্ন। তাই এখন নিশ্চয় তিনি বালিকার মতো আনন্দে উদ্বেল। আর কী উদার, কী ভালোবাসাময়, নিঃস্বার্থ ছিলেন তিনি। মা এখন রয়েছেন এমন এক স্তরে যেখান থেকে একের পর এক ভালোবাসার ঢেউ এসে তাঁকে নিয়ে যাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে—পৌঁছে দেবে পরমধামে।

ধন্য মাগো, ধন্য তুমি। আর আমার কিছুই বলার নেই।

একান্ত তোমার
মার্গট

লেডি ইসাবেল (লেডি মার্জেসন) আমাকে একটি ভারি মিষ্টি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।

কর্মের সূচনা : স্ত্রীশিক্ষা

নিবেদিতা প্রতিপদে অনুভব করলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষার কাজটি স্থায়ী ও কার্যকরী করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অর্থের এবং সেইসঙ্গে চাই যোগ্য কিছু সহকর্মী। শ্রীমতী কলস্টনকে লেখা প্রথম পত্রটিতে নিবেদিতা সহকর্মীর জন্য ব্যাকুল হলেও ভারতবাসের কঠিন বাস্তব দিকটি তাঁর কাছে তুলে ধরতে ভোলেননি।

দ্বিতীয় পত্রটি শ্রীমতী অ্যালবার্টা স্টার্জিসকে লেখা। তিনি ছিলেন মিস ম্যাকলাউডের বোনঝি এবং মিসেস বেটি লেগেটের প্রথম পক্ষের সন্তান—পরবর্তী কালে আর্ল অফ স্যানডুইচকে বিবাহ করে লেডি স্যানডুইচ হন। অ্যালবার্টা স্বামীজীর একান্ত স্নেহভাজন এবং তাঁর সব কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে নিবেদিতার সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯০৭ সালে নিবেদিতা আবার ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় যান। বর্তমান পত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে সেসময় তিনি অ্যালবার্টার মাধ্যমে তাঁর বালিকা বিদ্যালয়টির জন্য অর্থলাভের প্রত্যাশা করেছিলেন। সেইসঙ্গে জানতে পারি তিনি তৎকালীন পটভূমিতে কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। বুঝেছিলেন ভারতের মেয়েদের জন্য প্রকৃত শিক্ষা কী হতে পারে।

তৃতীয় পত্রটিতে নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের কৃতিত্বে যে কত খুশি হতেন তারই পরিচয় পাই।

॥ তেরো ॥

১৬ নং বোস পাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
১ মার্চ, ১৮৯৯

প্রিয় শ্রীমতী কলস্টন,

আপনার চিঠির উত্তর না দিয়ে আর একটি সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। যদিও সম্ভবত আর কয়েক দিনের মধ্যেই মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আপনার দেখা হবে এবং তাঁরা আপনাকে এ-কাজে উৎসাহ দেবেন। এদেশে অফুরন্ত কাজ। শুধুমাত্র এখানে উপস্থিত থাকাটাই অনেকখানি। আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না—স্কুলের কাজে আপনার সাহায্য আমার কতটা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল কাজটির প্রসার চাই। কয়েকজন আবাসিক ছাত্রীকে রাখতে আমি আগ্রহী কারণ তাহলে অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটবে এবং সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে বাস করতে পারব। মেয়েরা এখানে আসতে ও থাকতে ইচ্ছুক। যদি তাদের কিছু সংস্থান করা যেত! আমরা দুজনে মিলে একজনের চেয়ে হাজার গুণ বেশি কাজ করতে পারতাম, তাতে পরিশ্রম বা ক্লান্তিও হাজার গুণ কম হত, কিন্তু আসল প্রয়োজন টাকার। কঠিন সমস্যা সেটাই। যদি আপনি আসতে পারতেন, আপনাকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাতাম। কিন্তু আমি সে-ঝুঁকি নিতেও ভয় পাচ্ছি কারণ যে-কোনও দিন কাজ চালাতে না পেরে আমাকেই হয়তো এখান থেকে চলে যেতে হতে পারে। এখানে লেখালেখি, দেখাসাক্ষাৎ, বক্তৃতা, সামাজিকতা রক্ষা, ক্লাস নেওয়া, স্কুলে পড়ানো, পুস্তক সমালোচনা ও আরও কত শত অন্যান্য কাজ। আমাদের যদি অনেক টাকা থাকত, তাহলে দার্জিলিঙের পাহাড়ে একটি ছোটো কুটির করে সম্পাদনা ও লেখালেখির কাজ কত-না আনন্দের সঙ্গে করা যেত। আর এ-কথা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে বোঝাতে হবে না যে, স্বজাতি কোনও বিবাহিত মহিলার সাহচর্য ও সাহায্য আমাকে কতই না স্বস্তি ও শক্তি জোগাত। অনেক বিদ্রূপ ও ব্যক্তিগত আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারতাম। মিস ম্যাকলাউডের মুখে আপনি সবই শুনবেন তবু আমিও আপনাকে এই কথাগুলি বলে রাখতে চাইছি। আপনি এখানে এলে কেবল যে ইউরোপীয়ান সমাজ ও তার আরামদায়ক জীবনযাত্রা

থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন তা নয়, তারা আপনাকে রীতিমতো ঘৃণা করবে, এমনকি সেই সমাজ আপনার নামে কুৎসা রটাতেও পারে। অপরদিকে হিন্দুরা আপনাকে অফুরন্ত ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে।

এবার আর্থিক প্রসঙ্গে আসি। এখানে কত সামান্য টাকায় যে কত বেশি কাজ সম্ভব হয়, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। যেমন ধরুন, আমার মতো জীবন যাপন করলে বছরে পঞ্চাশ পাউন্ড যাদের আয় তেমন অনেক মানুষ নিজেকে বেশ ধনী ভাবতে পারেন। শুনেছি দার্জিলিঙে বাড়ি ভাড়া খুব বেশি; অন্যান্য অপরিহার্য খরচের সঙ্গে সেখানে গ্রীষ্মকালীন অবসর যাপনের উপযুক্ত কোনও আস্তানা আমার কাছে সমান জরুরি—মনে তো হয় না এটা কোনও অন্যায় আবদার। আমার অবশ্য সেখানে কোনও দিন যাওয়া হয়নি। এ-বিষয়ে কোনও মিশনারি বন্ধুর পরামর্শ নিলে বোধহয় ভালো হত। চিন্তা করে দেখুন—যদি স্কুলের জন্য আমার বছরে একশ পঞ্চাশ পাউন্ড (সাতশ পঞ্চাশ টাকা) থাকত, আমি আমার খরচ-সহ পাঁচজন ছাত্রীর শিক্ষা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

প্রিয় শ্রীমতী কলস্টন, আপনার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যাপারে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার ভাগ্য আপনাকে ভারতে নিয়ে আসবে। এদেশে আমাদের সব কাজের পিছনে থাকে জগৎকল্যাণ এবং ব্যক্তিগত কর্তব্যপালন—এই দুটি ভাবই কাজ করে। ভারতের জন্য আমেরিকার তুলনায় ইংল্যান্ডের অনেক বেশি কাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু জাতিগত বৈষম্য যে কী ভয়ংকর বাধা! সেক্ষেত্রে আমেরিকানরা অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। আমি বিশ্বাস করি ক্রমে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এদেশ যদি যথার্থ আপনার কর্মক্ষেত্র হয়, তাহলে আপনা থেকেই সব বাধা অন্তর্হিত হবে। কিন্তু শুধু মৃত্যুবরণ করার জন্য আসবেন না। সেটা হবে সাঙ্ঘাতিক। কলকাতায় অল্পবিস্তর প্লেগের আক্রমণ আবার দেখা দিয়েছে। প্লেগাক্রান্ত অঞ্চলের কাছাকাছিই আমাদের বাসস্থান। সুতরাং আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকবেন। রোগীর সেবা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে কিছু কাজ করা যায়। তবে এই নয় যে, ওই কাজ আমাদের করতেই হবে, শুধু এই মেয়েদের কতকগুলি সাধারণ অভ্যাস, রোগের সময় কিছু কিছু সাবধানতা অবলম্বন যে কতটা জরুরি তা শেখাতে হবে। রোগাক্রান্ত হলে সামান্য সেবারও অনেক মূল্য এখানে। মনে করুন, অনেকখানি সময়

দিয়ে রোগীর দেহে ওষুধ লাগিয়েছেন, সযত্নে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। কিন্তু যেই তাদের দৈনিক ঠাণ্ডা জলে স্নানের সময় হবে, একটুও চিন্তা না করে তারা ব্যান্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে দেবে এবং স্নানের সঙ্গে ওষুধ ধুয়ে ফেলবে অর্থাৎ আপনার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। এ-ধরনের কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে একটি শক্তিই কার্যকরী হতে পারে, তা হল শৈশব থেকে বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদের শিক্ষিত করে তোলা।

আপনি কেবল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অনেক কাজ করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, বাংলা বলতে পারলে সবশ্রেণীর মধ্যে কাজের আরও সুবিধে হত। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়। আমি তো এত মাস পরেও কেবল কোনও কোনও বিষয়ের ওপর সামান্য ভাবে বাংলা ভাষায় আলোচনা করতে পারি। এই অসুবিধে আপনার কাছে তেমন বড়ো বলে মনে হবে না।

স্বামী অভয়ানন্দ ভারতে এসেছেন। এতদিনে সম্ভবত বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ যাত্রা করেছেন। তিনি ১৯ মার্চের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছাবেন এবং আমার বোসপাড়া লেনের ছোটো বাড়িটিতে গ্রীষ্মকাল কাটাবেন—যতদিন তিনি এখানকার গরম সহ্য করতে পারবেন—কারণ আর কিছুদিনের মধ্যে গরম অসহ্য হয়ে উঠবে। আপনি হয়তো আমার মতন এখানকার গরমে খুব বিস্মিত হবেন না, কিন্তু শীতল আবহাওয়ার অভাব আপনি আরও বেশি অনুভব করবেন।

আমি যতই উৎসুক থাকি না কেন, আমাকে নিশ্চিন্ত করার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় কর্মী আমি কখনওই পাব না। সকলকে তাদের নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করার পরও অনেক কিছু করণীয় থেকে যাবে। সুতরাং আপনার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি—আপনি আসুন, আসুন, চলে আসুন। শুধু চূড়ান্ত অর্থাভাব সহ্য করার মনোভাব নিয়ে আসবেন।

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা যদি ভাবেন এখানে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হবে। কারণ ভারতবর্ষ সত্যিই অতি পবিত্রভূমি। এখানে না এলে আমিও তা বিশ্বাস করতাম না। কারণ যথার্থভাবে আমাকে কেউ ভারত বিষয়ে অবহিত করেনি।

প্রিয় শ্রীমতী কলস্টন, আপনার চিরদিনের
নিবেদিতা

পুনশ্চ—আমি খুব খুশি হব, যদি আপনি এই চিঠিখানি মিস ম্যাকলাউডকে পড়ে শোনান ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন।

॥ চোদ্দো ॥

'সিমরিক' জাহাজ
২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮

প্রিয় অ্যালবার্টা,

তোমার চিঠিটা আজ সকালে ক্যুইন্‌স্ টাউনে এসেছে। আমি খুবই আনন্দিত হয়ে উত্তর দিচ্ছি। কেন স্কুল করা দরকার—এটা বুঝতে না পারাটাই যে প্রধান অসুবিধে—আমি সেটা ধরতে পারিনি; তুমি এত খোলাখুলি জানিয়েছ বলে ধন্যবাদ। আমি তোমাকে সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রাচ্যদেশের সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানে যে বর্তমানে এবং আগামী বহু বছর যাবৎ এদের প্রধান সমস্যা হল স্ত্রীশিক্ষা। এম. পীয়ের লোটি এবং বাহাইদের (উদার মুসলিম সম্প্রদায়) কথা ছেড়ে দিলেও সচিত্র সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত তুরস্ক ও মিশর দেশের বেলায় একই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। ভারতবর্ষে প্রত্যেকে, এমনকি সরকার পক্ষও এই সমস্যাকে স্বীকার করে। ভ্রান্তদৃষ্টি থেকে হলেও ভারতের বেলায় এই স্ত্রীশিক্ষা মিশনারিদের দ্বারাও জনপ্রিয় হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের ঘোষণাকে অভ্রান্ত বলা যায় না। কারণ কোন মূল্যবোধের ওপর প্রাচ্য বালিকাদের জীবন গড়ে তোলা হয় তার সঠিক বিচার করতে তারা অসমর্থ। এদিকে প্রাচ্য পুরুষ প্রতিদিন আধুনিক চিন্তায় যেভাবে ভাবিত সেখানে মেয়েরা তাতে একেবারেই অংশ নিতে পারে না, অন্তত সে ভূমিকা বলার মতো কিছু নয়। ফলে পুরুষ ও নারী সামাজিক জীবনে দুটি ভিন্ন জগতে বাস করছে। সহযোগিতার পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন (পরস্পরের চাহিদার প্রতি সহানুভূতিহীন)। সুতরাং অনুমান করতে পারি, একে অপরকে অপরিহার্য মনে করতেও অপারগ। তুমি বুঝতেই পারছ তার ফলে জায়া ও জননীর প্রেরণা এবং প্রভাব ক্রমশ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। সুস্থ সমাজজীবনের উচিত ছিল নারীর উজ্জ্বল, বীরত্বপূর্ণ গুণগুলিকে তুলে ধরা; তার পরিবর্তে যুগের পর যুগ ধরে নারীর অজ্ঞতা আর ভীরুতাকে বেশি বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। সমাজের নৈতিক ও বৌদ্ধিক অবক্ষয় অনিবার্য। একমাত্র সমাধান পুরুষ এবং মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা তাঁদের সামনে মহৎ, উদার নতুন জীবনাদর্শকে তুলে ধরবেন। এইখানেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন।

প্রাচ্যবাসীরাও জানে একথা কতখানি সত্য। মানসিক সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে স্ত্রীজাতির সাহচর্যের জন্য পুরুষের মধ্যে এতখানি ব্যাকুলতা আর কখনও দেখিনি। মেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাকে স্বাগত জানাতে তারা খুবই উৎসুক। অল্পসংখ্যক সর্বগুণান্বিতা মেয়েদের—যতদিন তাদের সংখ্যা বিরল থাকবে—পুরুষরা যে উৎসাহ দেয় এবং যেভাবে উচ্চ প্রশংসা করে তাতে যে কোনও মেয়ের মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। তুমি অনেক পড়েছ বলেই ভালো করে জান, প্রাচ্য দেশ তাদের মেয়েদের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা ও উচ্চ ধারণা পোষণ করে। তাই আমার বিবৃতিগুলি তোমাকে বিস্মিত করবে না যা অনেক লোককে করে থাকে। অধিকাংশ লোকই বিকৃত ধারণার দ্বারা বিভ্রান্ত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচ্য নারী কীভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে?

কিছু প্রচেষ্টা অবশ্যই হয়েছে। নানা বিভাগে বিভক্ত এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনের অধীন এই ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। একটি জেলা বা একটি প্রদেশ সম্বন্ধে অনেকেই হয়তো অনেক কিছু জানে, কিন্তু এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা সর্বভারতীয় ধারণা করতে পারে না। তবে মিঃ র‍্যাটক্লিফ, লাজপত রায়ের কাছ থেকে পাঞ্জাবের তথ্য পেতে পারেন। 'ইন্ডিয়া' সংবাদপত্রের সম্পাদক মিঃ কটন বম্বে এবং মাদ্রাজের কথা বলতে পারবেন। মিসেস র‍্যাটক্লিফের কাছ থেকে বঙ্গদেশের সংবাদ পাব। স্ত্রীশিক্ষার জন্য সরকার কী পরিমাণ টাকা খরচ করেছেন তার সঠিক ধারণা করতে পারব এইসব তথ্য থেকে। এই বছরে সংসদের অধিবেশনে বলা হয়েছে যে সরকার ভারতবর্ষের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তিন লক্ষ পাউন্ড খরচ করেছে। এর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য খরচ হয়ে থাকবে নামমাত্র। আমার ধারণা সরকার মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশ কিছু করার চেষ্টা করেছিল। আমি আরও জানি তারা কলকাতা ও বম্বেতে দুয়েকটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করে। নিজেরা সরাসরি দায়িত্ব না নিয়ে এই সাহায্য তারা হয় ক্রিশ্চান মিশনারি স্কুল অথবা সাম্প্রদায়িক ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত স্কুলগুলিকে দিতে চেয়েছে। সুতরাং ভারতীয় মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশনারি বিদ্যালয়গুলির ওপর নির্ভরশীল।

যাই হোক, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষার ফল কল্যাণপ্রদ না হয়ে মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্ত্রীলোকের আদর্শ সম্বন্ধে বিদেশি দৃষ্টিভঙ্গি

নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ইংরেজ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা অথবা গোঁড়া সাম্প্রদায়িক শিক্ষাবিদরা যে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে তাতে তারা শিক্ষার্থীর মনের সঠিক বিকাশ সাধনে অক্ষম। ফলে তারা কোনটিকে উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে তুলবে, কোনটিকেই বা একেবারে এড়িয়ে যাবে তা-ও ঠিক করতে পারে না। এ-পর্যন্ত ভারতীয় নারীকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা কমবেশি ক্ষতিকর। এমনকি গোঁড়ারাও স্বীকার করবে যে শিক্ষকদের নিজনিজ দৃষ্টিভঙ্গির বৈষম্যহেতু মূল্যায়নে অল্পবিস্তর পার্থক্য ঘটে যাচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, বার্লিনের প্রাচীন পশমী শিল্প এখন দেখা যায় কেবল মিউজিয়ামে। আজ তার স্থান নিয়েছে অ্যানিলিন দিয়ে রঙ করা পশমী বস্ত্র যা স্থূল রুচির পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ না করে কেবল পুস্তক পাঠ করতে শিখলে নিছক সস্তা ইন্দ্রিয়পরতাকে অসংযত প্রশ্রয় দিতে পারে। শিক্ষকরা অজান্তে দিয়ে থাকুন অথবা অনিচ্ছাতেই দিয়ে থাকুন, পরিচিত আদর্শের বদলে বিদেশি আদর্শ শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। তখন তারা প্রশংসাযোগ্য বিদেশি গুণগুলির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে চপলতা, বিলাসিতা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত গুণগুলির অনুকরণ করে।

আমার মনে হয়, এই পরিণতির কিছু কিছু যে কেউ স্বীকার করবে। আমি দুয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছি। আসল কথা হল শিক্ষা একটি বিকাশ—যা ভেতর থেকে হওয়া উচিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আন্তর সংগ্রাম এবং শিক্ষার্থীর ইচ্ছার দৃঢ়তাই কার্যকরী হয়। যারা শিক্ষাকে একটা বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করে না, তারাই অন্যরকম চিন্তা করে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা জানি, কেবল নিজেদের প্রচেষ্টাই এগিয়ে নিয়ে যায়। বাইরে থেকে জগতের যাবতীয় শিক্ষাকে হাতুড়ি ঠুকে ঢোকানোর চেষ্টাটা বৃথা, সেটা যদি এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাকে একান্ত প্রতিহত বা বিনষ্ট নাও করে। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি, উভয় দিক থেকেই এটি সমান সত্য যে, শিক্ষাকে অবশ্যই ভিতর থেকে আসতে হবে।

এর থেকে বোঝা যায়, যেসব বিদেশিদের কাছ থেকে বৌদ্ধিক শিক্ষাগ্রহণ করা হবে, আগে সেই শিক্ষকদেরই শিক্ষার্থিসমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হওয়া চাই। তখনই শিক্ষা গ্রহণ সফল হবে। এই প্রসঙ্গটি পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে তুমি ভালোভাবে জেনেছ। যেমন সিল্ক-বয়ন-শিল্পকে হিউগনটের (Huguenot) রিফিউজিরা ইংল্যান্ডে এনেছিলেন। আর উল ব্যবসা ফ্ল্যান্ডার্স (Flanders) থেকে ফ্লেমিংসের (Flemings) দ্বারা ওয়ার্মসে (Worms)

এসেছিল। সিসটারশান (Cistercian) সন্ন্যাসীরা ভালোভাবে ল্যাটিন আয়ত্ত করতেন আর নর্স (Norse) ভাষাটা ব্যবহৃত হত কেবল লেখার বেলায়, ইত্যাদি।

ভারতীয় পুরুষরা কিছু বিশিষ্ট ইংরেজকে ব্যক্তিগতভাবে ভালোবেসে আধুনিক ইংরেজি পড়তে আগ্রহী হয়। শিক্ষক হিসেবে তারা কতটা হিন্দুসমাজে গৃহীত হবে সেটা নির্ভর করত তাদের দেওয়া শিক্ষা ব্যবহারিক দিক থেকে কতটা উপযোগী তার ওপর—এই কথাটা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরি। কারণ মেয়েদের শিক্ষায় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি—জীবনের রুচিবোধ, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শবোধ, ধারণা প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক দিকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। এইটুকুই দাবি করছি। আমরা এমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেছি যাতে ভারতবাসী আমাদের সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করে। প্রথমে তাদের আপনজন বলে গৃহীত হয়েছি এবং পরে তাদের এমনভাবে প্রস্তুত করছি যাতে তারা নিজেদের চেষ্টায় জ্ঞান আহরণ করতে পারে। বলা বাহুল্য, আমাদের সাহায্যে যে বিদ্যা তারা লাভ করছে সেটা এখনও প্রাথমিক স্তরের। তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক অবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখেই তারা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। বয়স্কা মহিলারা অনেকে আসায় অল্পবয়সী মেয়েরাও অভিভাবিকা পায়। আমাদের সঙ্গে বাস করে না বলে এখানে আসার জন্য ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না। আমাদের ওপর তারা নির্ভরশীল নয়, আমরাও তাদের জন্য দায়ী নই। তাছাড়া তাদের পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও সমালোচনা আমরা করি না। আমরা বিধবাদের পুনর্বিবাহে সাহায্য করছি না কিংবা সরল মাতামহীরা রুচিবিরুদ্ধ মনে করবেন এমন ইউরোপীয় রীতিতে বালিকাদের অভ্যস্ত করাচ্ছি না। বরং আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব শিষ্টাচার মেনে চলার অধিকার আছে। ভারতীয় সবকিছুকে শ্রদ্ধা করে ভারতীয় ধরনে সেটিকে সুন্দর করে প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমরা ধর্মশিক্ষা দিই না। বিশ্বাস করি সে শিক্ষা তারা আপন আপন গৃহেই পাবে। তাদের পরিচিত আদর্শগুলি খোলা মনে আলোচনা করি, এড়িয়ে চলি অপরিচিত বিষয়গুলি।

এইভাবে আমরা বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ভাবাদর্শ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছি যাতে মনে হয় ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষা একজন ভারতীয় নারীর দ্বারাই সাধিত হচ্ছে, যা ছাত্রীর সমাজজীবনকে বিচ্ছিন্ন বা ধ্বংস না করে

তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সহজ শোনালেও ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ নতুন, ইতিমধ্যে অনেকেই এর অনুকরণ করছেন। এটিকে নানা দিক দিয়ে এমনভাবে উন্নত করতে চাইব যাতে আমাদের ধারণা অনুযায়ী স্কুলের যে দক্ষতা ও মান হওয়া উচিত তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি। কয়েক বছর এগিয়ে পরিকল্পনা করব যাতে যতটুকু সংস্থান আছে তার যথাযথ প্রয়োগ করা যায় আর তারজন্যই আমরা অর্থসাহায্য চাইছি। এই লম্বা চিঠিখানি পড়তে নিশ্চয়ই তোমার অনেক ধৈর্যের দরকার হয়েছে এবং তারজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

তোমার মার্গট

(পর পৃষ্ঠায় আছে একটি সংক্ষিপ্ত নোট)

মিসেস র‍্যাটক্লিফ, ১৭ চ্যাপহাম ম্যানসন, নাইটিঙ্গেল লেন, এস ডবলিউ, আমাকে লিখেছেন... তিনি নিবেদিতা গিল্ডের সাম্মানিক সম্পাদিকা হতে সম্মত আছেন এবং আমাকে সাহায্য করবেন। এই সাহায্যের চেষ্টা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করছি।

॥ পনেরো ॥

(এই চিঠির প্রাপক কে তার কোথাও উল্লেখ নেই। মনে হয়, চিঠির প্রথম ও শেষের অংশ পাওয়া যায়নি।)

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯

...আমি দেখছি স্কুলে এখন প্রায় ষাট থেকে সত্তর জন মেয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ষোলো থেকে আঠারো বছরের বিবাহিত ও বিধবা মেয়েরাই বেশি বুদ্ধিমতী। এরা বেশির ভাগই ছাত্রী, দু-একজন পড়ানোর জন্য সামান্য টাকা পায়। তারা বাংলায় বেশ ভালো, যতদিন যাচ্ছে ইংরেজিতেও বেশ সড়গড় হয়ে উঠছে। আমি প্রতি সপ্তাহেই বিভিন্ন বিষয়ে তাদের বলি। যখন আমি ইতিহাস আর ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছু বলি, তখন দেখি ওরা বেশ বুঝতে পারে, তাছাড়া দেখি নতুন নতুন ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনাও করতে পারে।

কুমারস্বামীর বইটি পড়ার পর, আমি এখন বুঝতে পারি এই মেয়েদের হাতে আঁকা স্বতঃস্ফূর্ত নকশাগুলোর মূল্য কত অসাধারণ। এদের হাতে তৈরি কাগজের

কাজ আর মাটির কাজের যে ছোট্টো একটা 'সংগ্রহ' আমি করেছি, তা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। ছুঁচের কাজ এখনও বলার মতো কিছু হয়নি তবে এটা সত্য, নকশাগুলো কিন্তু একেবারেই ওদের নিজস্ব। কিছু কিছু প্রশংসা করার মতো কাজও তুমি পাবে। এবিষয়ে মেয়েদের মধ্যে ধারণা ও আগ্রহ গড়ে উঠেছে।

তারা নিজেদের স্বামীজী ও মায়ের আশ্রিতা বলে মনে করে। ছাত্রীর পাশাপাশি তারা কিছুটা শিষ্যাও বটে। আমি যখন বাইরে গিয়েছিলাম, কৃস্টিনই তখন এইসব কাজকর্ম শুরু করেছিল, এসবের পেছনে তার একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা আছে।

এটা ছাড়া স্কুলের আরও দুটো শাখা আছে। দুটো মিলিয়ে মাসে তিন পাউন্ডেরও কম খরচা হয়। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে টাকার অভাবে হয়তো ও-দুটো অচিরেই বন্ধ করে দিতে হবে। আমি ওলিয়াকে লিখেছি একটির জন্য মাসে দু-ডলার করে দিতে আর মিসেস ল্যাম্বকে লিখেছি অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করতে। দেবমাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে নিউইয়র্কের কয়েকজনের কাছেও সাহায্যের জন্য লিখেছি।

আমি নিশ্চিত, আমার এই প্রস্তাবে কেউ বিস্মিত হবে না। অন্তত ওলিয়া তো নয়ই। কিন্তু ঘটনা হল, চিঠিগুলোর মধ্যে একটারও উত্তব আসেনি।

তুমি যখন এই চিঠি পাবে তখন মিঃ লেগেটের মৃত্যুসংবাদ পুরোনো হয়ে গেছে। এরকম একটা ঘটনা যে কতটা আঘাত দিতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না।

আমার ধারণা এ তাঁর পক্ষে আদর্শ মৃত্যু। ব্যথা নেই, ভয় নেই, দারিদ্র্য নেই, যদিও শেষ কথাটা মনে হবে তাঁর জন্য অযৌক্তিক। কিন্তু আমি জানি ধনী লোকেরা সারাজীবন এই ভয়েই মরে। তিনি কিন্তু এসব কিছু থেকে রেহাই পেয়েছেন।

ভারত উপাসনা

নিবেদিতার ভারতপ্রেমের তুলনা ছিল না। শ্রীগুরুর পদতলে বসে তিনি এই পুণ্যভূমি ভারতকে জানার দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন।

ভারত ছেড়ে তিনি জাহাজে পাশ্চাত্যে চলেছেন স্বামীজীর সঙ্গে। ভারত-চিন্তা তাঁর হৃদয়কে মথিত করে তুলেছে—তারই আভাস পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধদুটিতে। 'Letters about India' নামের প্রবন্ধ দুটি ১৮৯৯-এর আগস্ট মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লেখাগুলিকে 'Letters of Sister Nivedita' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের Appendix-1899-এ সংযুক্ত করেছেন।

তৃতীয় পত্রটিতে ফুটে ওঠে পরাধীন ভারতের যন্ত্রণা ও মিশনারিদের বিকৃত প্রচারের জন্য তাঁর অস্থিরতা, ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের সেবা, জগৎসভায় ভারতের শাশ্বত ঐশ্বর্য তুলে ধরার ঐকান্তিক আকুতি। আজ তাই নিবেদিতার চোখ দিয়ে ভারতকে চেনার প্রয়োজন সর্বাধিক।

॥ ষোলো ॥

সিলোন ছেড়ে
২৭ জুন ১৮৯৯

আমরা ডোনড্রা অন্তরীপ পরিক্রমা করে চলেছি। সারাদিন ধরে সিলোনের (বর্তমান শ্রীলঙ্কার) পূর্বতট ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। নারকেল বন, সবুজ প্রান্তর, গোলাপরাঙা আলোয় পাহাড়ের চূড়া, ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের সারি—কী শোভা!

এখন শান্তির লগ্ন। প্রতিদিন সূর্যের আলো যখন ম্লান হয়ে আসে, সমুদ্র যেন নিজের মনে নতুন সুরে কথা বলে। তরঙ্গের শব্দের সঙ্গে মেশে একটা

করুণ কথা। প্রতি রাতে এবং সারা রাত ধরেই চলে জলের এই অস্ফুট কথা। কিন্তু আজ রাতে সমুদ্র যেন অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করছে একটি নাম—আর সে নামটি হল 'সীতা'। যখন বড়ো একটা ঢেউ জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ে, তখন ধ্বনি ওঠে : 'জয় সীতারাম! সীতারাম! জয়! জয়! জয়!' ধীরে সে সুর দূরে আরও দূরে মিলিয়ে যায়।

এখানে সাগরতটে ভেঙে পড়া সাদা ফেনার একটা বিশেষ অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। মনে হচ্ছে এরা যেন জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পত্নীর কারাগারটি চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে।

আমরা উত্তরদেশের (ইউরোপের) কাহিনীগুলিতে যুদ্ধনিপুণ রাজকুমারী ব্রাইনহিল্ডকে অগ্নিবলয়ে বেষ্টিত দেখি। তেমনি ভারতীয় নারীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ সীতার বেলায় দেখি, মদিরার মতো কালো সমুদ্র এবং পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া তুষারধবল ঢেউগুলি তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। এসব এবং হনুমানের আজ্ঞাবহতার স্মৃতি বিজড়িত স্বপ্নময় ভারত মহাসাগর! ওঃ সুন্দরী লঙ্কা! তোমার নারকেল বন, দারুচিনি তরুবীথি এসব নিয়ে তুমি সত্যিই, পৃথিবীর এক অপূর্ব সৃষ্টি।

বীরদের গৌরবময় যুগ ফিরে আসুক আমাদের কাছে—বীর্যহীন যুগের পরিশ্রান্ত সন্তানদের কাছে; তমোনিদ্রা থেকে আমাদের জাগিয়ে তুলুক, উদ্ধার করুক দুর্বলতা থেকে। অতীত যুগের মতো আমরা যেন আবার সাহসের সঙ্গে ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হতে পারি, নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে নিজেরাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারি।

শান্তির পরম লগ্ন শেষ হয়ে এল—এবার আমরা পশ্চিমের দিকে চলেছি, কাছেই রয়েছে Galle Point, আগামী কাল সাতটার সময় কলম্বো পৌঁছাব। আর কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রিয় দেশ ভারতবর্ষের স্মৃতিমাত্র থাকবে, সেই স্মৃতি চিরস্মরণীয় ও চিরসুন্দর এবং বাস্তবের চেয়েও বেশি সত্য। সকল বিচ্ছেদই বেদনাদায়ক। অল্পদিনের জন্য হলেও এই বেদনা কত না অসহনীয়!

আঠারো মাস আগে যখন আমি এই পথ পরিক্রমা করি, তখন আমি একজন নবাগতা বিদেশিনী মাত্র। আর আজ রাতে, মানুষ যেমন একটি পরিস্থিতির ভালোমন্দ বিচার করে দেখে, আমিও তেমনভাবে গত দেড় বছরে যা-কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে তারই হিসাবনিকাশ করছি।

প্রথমেই, আমাকে যে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে যা আমার স্বজাতীয়দের মধ্যে খুব কম জনের ভাগ্যে জুটেছে তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ভারতমাতা আমাকে তাঁর আপন সন্তানের মতো গ্রহণ করে আমার কাছে তাঁর অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপটি মেলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের অংশভাগী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কত যে দয়া করেছেন আমায়! নিজের দারিদ্র্য অথবা পূজাপাঠ কিছুই আমার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখেননি।

তার থেকেই আমার বিশেষ একটি ধারণা হয়েছে যে, এই জাতির বিচিত্র অভ্যাসের, আচার-আচরণের জন্যই অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের মধ্যে মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই জাতির চরিত্রের উন্নতির কথা যেভাবেই বলা হোক না কেন, আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে, পৃথিবীর যে-কোনও জায়গার তুলনায় এখানে নৈতিকতা অনেক বেশি।

'মহৎ' বিশেষণটি দিয়ে আমি কোনওরকম বৌদ্ধিক বা দৈহিক দক্ষতা বোঝাতে চাইছি না—বরং আমি এগুলিকে গৌণ বলেই মনে করি। আমি বোঝাতে চাই হৃদয়ের সেই উদারতা, যা মানুষকে ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডির অনেক ওপরে তুলে ধরে এবং তাকে গড়ে তোলে মানবতার নতুন প্রবক্তারূপে।

কখনও সেই উদার জীবন তার মুখে ফুটিয়ে তোলে অপূর্ব দীপ্তি। কখনও দেখি, বহুদিন ত্যাগের জীবন যাপনের ফলে সেই চরিত্রে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এক দিব্যমাধুর্য। ভারতে আমি এ-ও দেখেছি এই জীবন বিজ্ঞানসাধনাকেও অধ্যাত্মসাধনায় পরিণত করে। যে ভাবেই বহিঃপ্রকাশ ঘটুক না কেন, আমরা জানি কিছু মানুষের ধমনীতে দেবরক্ত প্রবাহিত, আর ভারতে এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের প্রত্যাশিত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

এর তিনটি সম্ভাব্য কারণ পেয়েছি। প্রথম দুটি হল হিন্দু মানসিকতায় তীব্র ভাবাবেগ এবং একাগ্রতা। হিন্দুদের অনুভবশক্তির তুলনায় পাশ্চাত্যদের সেই শক্তি যেন দৈত্যের সামনে এক বামনের মতন। প্রাচ্য জাতির নিজস্ব এক আন্তর জীবন আছে, যা তারা একান্ত সতর্কভাবে আড়াল করে চলে এবং ইউরোপীয়েরা তার সন্ধানই রাখে না। পাশ্চাত্যের মানুষ কমবেশি বিভ্রান্ত হয় এই কারণে যে উদাসীনতার আবরণ দিয়ে হিন্দুরা নিজেদের বেশ নিপুণভাবেই ঢাকতে জানে। কিন্তু বাস্তবিক এই উদাসীনতা অংশত খাঁটি। কেবল বিরল

ক্ষেত্রে এই অন্তর্নিহিত শক্তি সামান্য উদ্দীপক পেলেই উদ্বুদ্ধ হয়। আবার ভিতরের এই গোপন সুরটিকে স্পর্শ করলেই আনন্দ বা বেদনায় সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে, যার অভাবে এই জীবন অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

যাদের সঙ্গে সর্বদা আদানপ্রদান করতে হচ্ছে তাদের আসল প্রকৃতির বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা যে এত অজ্ঞ তার আর একটা কারণ আছে। কারণটি হল, যে-ভাষায় বা ভাবে ভারতীয়দের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটে, সেটি তাদের বোধের বাইরে। জাপানীরা যখন সেই শক্তি ধর্মের বদলে দেশপ্রেমের দিকে প্রয়োগ করে—তখন পাশ্চাত্য জাতি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে।

ভারতের ধ্যান বা একাগ্রতার কথা উঠলে বলতে হয়—এদেশে মানুষ শিখতে আসে যে—পবিত্রতার অন্তর্নিহিত শক্তি এখানেই রয়েছে—আর সে-কথা জানার পর শ্রদ্ধা নিবেদনের একটাই উপায়—মৌন থাকা। যখন সব স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, লোভ নিঃশেষ হয়ে যায় একমাত্র তখনই মানুষ নিজ জীবনাদর্শের বাণীমূর্তি হয়ে ওঠে, তখনই শেখা যায় ত্যাগ কাকে বলে, ভক্তিই বা কী এবং এই ব্যাপারেও ভারতবর্ষের স্থান সকলের ওপরে।

খুব সূক্ষ্ম ও উচ্চ আদর্শ না থাকলে এমন মানসিকতা লাভ করাও যায় না, আর ভারতীয়দের সেটি পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এখানে বেদের প্রভাব তত নয়। রামায়ণ, মহাভারতই এদেশের বাইবেল হয়ে উঠেছে, আর এই মহাকাব্য দুটিকে সকলে জানে। এর এক ভয়ংকর বিপরীত ছবিও আছে। কারণ কর্তব্যের এত উচ্চ ধারণা এখানে দেখি যা বিভিন্ন কর্মকে যেমন অনুপ্রাণিত করে তেমন আবার বহু লোককে অকর্মণ্য করে দেয়। কিন্তু একটা নিশ্চিত অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেটি হল সর্বদা মহাবীর, ভীম, রাম অথবা যুধিষ্ঠিরের মতো চরিত্রের স্মরণ-মননের ফলে অনেকে নিজেরা উন্নত হয়ে যায়।

সুতরাং এই মাতৃভূমির চরণে আমার ভালোবাসা ও ভক্তিপুষ্প নিবেদন করি। প্রার্থনা করি আমাকে যেমনভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন, তেমন করে তাঁর আরও অনেক বিদেশি সন্তানকে তিনি আপন করে নিন। অযোগ্য আমার ওপর তাঁর অপার মাতৃস্নেহ যেমন বর্ষিত হয়েছে, তেমনি তাদের ওপরও বর্ষিত হোক।

নিবেদিতা

॥ সতেরো ॥

মিনিকয় ছাড়ার পর
২৯ জুন ১৮৯৯

ভারতীয় সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি সভ্য ও সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন। অমানুষিক দারিদ্র্যের আড়ালে তাদের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে ধারণা করা ইউরোপীয়ানদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যে সমাজের উন্নতির মাপকাঠি হল উদ্যম, পুঁথিগত শিক্ষা ও কমবেশি আর্থিক সচ্ছলতা। অর্থাৎ যে-কোনও বস্তুকে আমরা যে রূপ দান করে ফেলেছি, সে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে আমরা সেই রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। আমরা যদি সভ্যতার চরম তাৎপর্য বুঝতে পারি, তবে আমি মনে করি আমরা সকলেই একমত হব যে, আত্মসংযম অভ্যাসই সভ্যতার ভিত্তি—এই অভ্যাস মানুষকে পশুত্ব থেকে উন্নীত করে। সভ্যতা কখনওই কয়েকটি ঘটনাপরম্পরার ওপর নির্ভরশীল নয়। এদিক থেকে দেখলে ভারতের বস্তিবাসী লন্ডন, প্যারিস ও আমেরিকার দরিদ্র জনসাধারণের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। যদি একজন নিরপেক্ষ সমালোচক আগে না জেনেও পর্যবেক্ষণ করেন, তবে তাঁরও এদের বহুকালের সামাজিক ধারাটির সম্বন্ধে স্থির ধারণা করতে কোনও অসুবিধে হবে না।

হিন্দু সংস্কৃতি যেন এক বিশাল বনস্পতি, যার শিকড় অদৃশ্যভাবে মাটির নিচে থাকে ও ক্রমাগত বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বহুযুগ ধরে এই সংস্কৃতি নীরবে কাজ করে চলেছে, বর্বরতা থেকে মানবতায় উত্তরণ ঘটিয়ে। বোধ হচ্ছে প্রতি স্তর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন জাতিকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে। ধর্মভিত্তিক ধারণা সর্বপ্রথম সমন্বিত হয়ে সম্প্রসারিত হয় শিরা-উপশিরায়। তারপর অসংখ্য প্রথা ধীরে ধীরে যুক্ত হয়েছে—কোনটার পর কোনটা সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না। ক্রমে দেখা দিয়েছে তাদের চিরকালের শান্তভাব, স্বাধীন ইচ্ছা এবং সেই প্রাচীন ভয়ংকর ছুৎমার্গ।

সুতরাং একটি মহাদেশের শিক্ষাকে তার অনিবার্য লক্ষ্যে নিঃশব্দে ও স্থিরভাবে এগিয়ে নিয়ে চলে তার দীর্ঘকাল-বাহিত প্রবণতার ধারা। এই মৌলিক কাজটির বিশালতাকে আন্দাজ করতে হলে জানতে হবে কাজটি সম্পন্ন হতে কত যুগ লেগেছে এবং কত সংখ্যক উপজাতি এখনও সীমানার

বাইরে রয়ে গেছে। যে দেশের পরিশীলিত চিন্তার সঙ্গে ধর্ম একাত্ম হয়ে আছে, সেখানে মূর্তি-উপাসনা, মন্দির-নির্মাণ প্রভৃতি যে-বিশ্বাসের ওপর অবস্থিত তার গুরুত্ব অপরিসীম। পাশ্চাত্য সভ্যতার থেকে ভারতীয় সভ্যতার ওপর নারীজাতির প্রভাব বোধ করি অনেক বেশি। এর কারণ এদেশের মানুষ, কম-বেশি নিজেকে সমর্পণ করে যে নারীর কাছে—তিনি হচ্ছেন তার মা—জীবন থেকে যাঁর প্রভাব কোনওভাবেই মুছে ফেলা যায় না।

কম করেও প্রথম দুবছর মা তাঁর সন্তানের সারাক্ষণের সঙ্গী, যতক্ষণ শিশু বাড়িতে রয়েছে—ততক্ষণ মা তার জন্য রাঁধছেন, তাকে খাওয়াচ্ছেন, আবার দিনের শেষে ঘুম-পাড়ানি গল্প বলে ঘুম পাড়াচ্ছেন। আগামী প্রজন্মের জীবনে মা-ঠাকুমার এই প্রভাব সীমাহীন। আবার এই ছেলেই যখন বিয়ে করে তখন মায়ের প্রভাব দ্বিগুণ হয়ে যায়। পাশ্চাত্যে 'আমার ছেলে আমার নিজের থাকে যতক্ষণ না বিয়ে করে, কিন্তু আমার মেয়ে চিরজীবন আমার মেয়েই থেকে যায়।' কিন্তু ভারতে ঠিক তার উলটো, এখানে বালিকা-বধূ শ্বশুরবাড়ি এসে শাশুড়ির কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে নতুনভাবে গড়ে ওঠে, আর নিজের মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তাদের ধারা অনুযায়ী জীবন তৈরি করে।

তাই বর্তমান ভারতকে দেখলে মনে হয়, যে শক্তি কেন্দ্রস্থলে থেকে তাকে চিরকাল চালিত করছে তা হল নারীর স্নেহস্পর্শ—ব্যক্তি ও পরিবার উভয়ক্ষেত্রেই। আমি প্রথম চিঠিতেই উল্লেখ করেছি যে, এ-বিষয়ে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই, তার কারণ নিজ দেশের লোকগাথা ভারতের মানুষের মনপ্রাণ ভরিয়ে রেখেছে। যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় রীতিনীতি যে ওরা যথাযথভাবে ধরে রাখতে পেরেছে তারও উৎস এই লোকগাথা। অতিথিরা কোনও বাড়িতে যদি নিয়মিত যাতায়াত করেন, তবু তাঁরা জানতেও পারবেন না ওই বাড়ির মেয়েরা কোথায় থাকেন। এই রক্ষণশীলতার ভিতরেই মেয়েদের শক্তি নিহিত, আর এই কঠোর সংযমের ফলে এঁরা এত শক্তিশালিনী।

বর্তমান ভারতের ভিত্তি—আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা, ত্যাগ; তার সবটুকুই এসেছে নারীজাতির প্রভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শক্তি, স্বাধীনতা ও মানবিকতার মতো অন্যান্য ভাব, যা এযুগের কাছ থেকে বিশ্বের মহান উত্তরাধিকার, সেইসব ভাবগ্রহণের এরাই যোগ্য পাত্র।

অন্তরের বিকাশ ছাড়া ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ উপহাসে পরিণত হয়। যারা বিচ্যুত হয়েছে জাতীয়তাবোধের আদর্শ থেকে, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবে

না কোনও প্রেরণা। হিন্দুনারীকে প্রচণ্ডভাবে কাজে লাগাতে হবে নিজের সংহত শক্তিকে। কেবল তখনই সে উদার শিক্ষানীতি দ্বারা লাভবান হতে পারবে, যা তার আত্মিক বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। হিন্দুনারী এই দায়িত্বপালনে সম্পূর্ণ সক্ষম। সন্তানদের কোনও আর্তি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না, কারণ তিনি যে ভারতীয় জননী—তাই নয় কি ?

নিবেদিতা

॥ আঠারো ॥

Lysoen, Bergen,
নরওয়ে,
১৯ জুলাই, ১৯০১

আমার প্রিয় য়ুম,

নরওয়েতে আমি একা রয়েছি। কারণ সেন্ট সারা একটি কাজে লন্ডন গেছে—সেইসঙ্গে আশা করছে যদি ওলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

তোমার পাঠানো জাপানী কাগজগুলি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ হল। মিঃ ল্যান্ড যে কী অভিভূত হয়েছেন তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। তাঁর আশ্রিতাদের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হোক তা দেখতে তিনি সত্যিই আগ্রহী। জাপানীরাও যে সহানুভূতি চায় তার উল্লেখ করে তোমার সম্বন্ধে যে সামান্য লেখা হয়েছে তা দেখে আনন্দ হল। এ-ধরনের কাগজ আমার ভারি পছন্দ—এতে ইংরেজি ও প্রাচ্য ভাষার হরফ দুই-ই ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যায়।

আমি ভারতের জাতীয় আদর্শ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছি, একথা আমেরিকা, নরওয়ে এবং এখন খানিকটা জাপান থেকেও শুনে মনে অসীম সাহস পেলাম। আমি স্বামীজীর কাছ থেকে যথার্থই কিছু পেয়েছি, তা না হলে এসব সম্ভবই হত না। আমি যদি বলি যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি এমন কিছু পেয়েছি যা এর আগে কেউ কখনও পায়নি, তোমার কাছে সেটা কি অত্যুক্তি মনে হবে? আমি যখন হিন্দুধর্মের ওপর স্বামীজীর রচনা পড়ি, এর বিশালতা আমাকে অভিভূত করে—তখন ভাবি এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ মতবাদ আর স্পষ্ট দৃঢ় কথা। অথচ স্বামীজীর

গুরুগম্ভীর জ্ঞান সেভাবে প্রকাশ করা যায় না। সেক্ষেত্রে মনে হয় আমার অজ্ঞতা এবং গভীরতার অভাবই আমার মোক্ষম অস্ত্র। স্বামীজীর বাণী এক শাশ্বত সত্য সে কথা যে আমি মনে করি না, তা কিন্তু নয়। আমি তাই-ই মনে করি—কিন্তু আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি তাঁর ওই বিশাল ও মহান বাণীর মর্ম উপলব্ধি করা এক প্রজন্মের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাদের একটা সূত্র ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

মনে হয় Boer War ব্যক্তিগতভাবে এবং সাধারণ (সমষ্টিগত) ভাবে ইংল্যান্ডের অধঃপতন সূচনা করছে। তিনি (স্বামীজী) যদি ইংল্যান্ডে থাকতেন তিনি অনেক কিছু করতেন—না করে পারতেন না। কিন্তু ইংল্যান্ড নিজে তার মহত্ত্বকে যেন খুইয়েছে। এখন সে একদল কাঞ্চনলোভী অর্বাচীন ছেলেকে প্রতিনিধিত্ব করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এসব প্রতিনিধিরা Lady Cunard-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি Lady Cunard-কে পছন্দ করি—তবে এ-ধরনের অন্তঃসারশূন্য বুদ্ধির দীপ্তি কখনও একটি জাতির শিখরে উঠতে পারে না। বরং Abraham Lincoln-এর মতন ঘরোয়া আন্তরিকতা ও সরলতা তা পারে অনেক বেশি। তাঁর সম্পর্কে এখানে একটি বই আছে। তাতে Johnson নামে একজনের কথা আছে—সে কেমন Nashville-কে রক্ষা করছিল। যখন একজন সহকর্মী officer (সেখান থেকে) সৈন্যটিকে সরিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর, তখন সে বলে—"আমি ধার্মিক নই, কিন্তু আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, Bible বিশ্বাস করি আর আমি নরকে যাব যদি Nashville-এর পতন হয়।" কী মানুষ! ওঃ ভারতে এই রকম যদি কয়েকজন থাকে!

পুণা যেতে আমি বিশেষ আগ্রহী। তবে সোরাবজীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ আমার একেবারেই নেই। আমার বরং রমাবাঈকে দেখার ইচ্ছে। তোমাকে জানাতেই হবে যে ভারতের জন্য কোনও সরকারি উদ্যোগে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। আমি মনে করি, যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, কোনও কাজই সার্থক হতে পারে না যদি তাতে জনগণের উদ্যোগ না থাকে। আমি দিনে দিনে আরও দেখছি যে ব্যষ্টির পক্ষে যা সত্য, গোষ্ঠীর পক্ষেও তা-ই সত্য। একজন শিশুকে আঁকা শেখানোর জন্য তুমি অঙ্কনশিল্পীদের নিযুক্ত করতে পার এবং শিশুটির আঁকার ওপর তাঁদের তুলির টানে চিত্রটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু এরকম হাজারটি চিত্রের চেয়ে শিশুর নিজের হাতের আঁকা-বাঁকা তুলির টানেরই মূল্য বেশি। দেশগুলির ক্ষেত্রেও এই কথাই

প্রযোজ্য। নিজেদের চেষ্টায় যে বিকাশ হয় তাদের পক্ষে সেটাই কল্যাণপ্রদ। অপরের উদ্যোগে তাদের জন্য যা করা হয় তা একটি সাজানো প্রদর্শনী।

ভারতের জন্য আমি কিছুই করছি না। আমি শিখছি এবং অপরকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করছি। দেখতে চাইছি কেমন করে চারাগাছটি বেড়ে ওঠে। আর সেটা বুঝতে পারলে, মনে হয়, ভারতকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। ভারত একদা সারস্বত সাধনায় মগ্ন ছিল। অতর্কিতে হানা দিল দস্যুদল, তছনছ করে দিল সমগ্র দেশ। ভারতের জাতীয় সুর গেল কেটে। এই দস্যুদল ভারতকে কী শেখাবে? তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে এবং ফিরতে হবে আপন সাধনায়। তাদের ফিরে যেতে হবে স্বস্থানে। আমি মনে করি, এরকমই একটা কিছু ভারতের কল্যাণের পক্ষে যথার্থ পথ। যতদিন বিদেশি সরকার রয়েছে ততদিন তাই খ্রিষ্টান বা সরকারি সংস্থানগুলির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য ভারতীয় উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন। অন্য যে-কোনও উদ্যোগ হয়তো সামান্য উপকার করতে পারে কিন্তু ক্ষতি করবে অনেক বেশি। আর এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। মানছি, আমি যে পথে ওদের কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়েছি তাতেও কিছুটা ক্ষতি হতে পারে, যেমন হয়ে থাকে বিদেশি বিজাতির কল্যাণ প্রচেষ্টায়। তবে সেটুকু ক্ষতির পরোয়া আমি করি না, কারণ তাদের শেখাচ্ছি ভালো-মন্দ সকল দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আপন পথে চলতে। এখন তাদের এটাই বিশেষ দরকার।

হে ভারত! আমার জাতির দ্বারা তুমি যে এমনভাবে নিগৃহীত হলে, কে করবে তার প্রতিকার? তোমার শ্রেষ্ঠ বীর, উদ্যোগী, সাহসী সন্তানরা প্রতিদিন যে অজস্র তিক্ত অপমানে জর্জরিত হচ্ছে তার যে-কোনও একটির প্রায়শ্চিত্তই বা কে করে?

ইংল্যান্ডে বসে ভারতের কল্যাণের জন্য কিছু করা যে কতখানি হাস্যকর ব্যাপার তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারছি না। সময়ের কী ভয়ানক অপচয়! তুমি কি মনে কর হিংস্র নেকড়ের পক্ষে শিশুর মতো কোমল হওয়া সম্ভব? তারা কি ছোট্টো মেয়েদের মতো ভদ্র ও মিষ্টি হতে পারে? ইংল্যান্ডে বসে ভারতের জন্য কাজ করা অনেকটা সে ধরনের। আমি জানি, ভারতে কাজ করা প্রয়োজন, কাজ করতেও হবে। কিন্তু সেটা কী ধরনের, জান কি? স্বামীজী, ডঃ বসু, মিঃ দত্ত—এঁদের মতো লোকের ইংল্যান্ডে যাওয়া দরকার কারণ তাঁরা বলবেন ভারতবর্ষ কী এবং কী করতে পারে। তাঁদের ওদেশে হাজারে হাজারে বন্ধু, শিষ্য ও অনুরাগী গড়ে তুলতে হবে। তারপর এখন থেকে বছর

কুড়ি বাদে যেদিন বজ্র হানা হবে (হবেই—এটা নিশ্চিত) সেদিন হঠাৎই ইংল্যান্ডের একদল নারী ও পুরুষ, যারা নিজেদের সম্বন্ধে কখনও এভাবে চিন্তা করেনি, তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলবে—"হাত গুটিয়ে সরে দাঁড়াও, এই জাত স্বাধীন হবেই।" কিন্তু সেটা তো ইংল্যান্ডকেই ত্রাণ করা হবে, ভারতের জন্য তো কিছু করা নয়। তুমি কি বুঝতে পারছ? এ কাজ কিন্তু আমার জন্য নয়। আমি মনে করি স্বামীজীই কিছু করতে পারতেন। তবে, তাঁর 'মিশন' সম্বন্ধে আমি আর কতটুকু জানি? তা পরিমাপ করা আমাদের সাধ্যাতীত।

যুম, এই মুহূর্তে ভারতের জন্য আমাদের অনেক কিছু চাই, বলা যায় যে, কী না চাই? আমরা চাই—পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা যেন আমাদের বার্তাবহ হয়। আমরা চাই—ধীর, গঠনমূলক শক্তি যা ভালোভাবে কাজে লাগানো যাবে। ভেবো না যে আমি বৃক্ষরোপণ, শিশুশিক্ষা, কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছি। কিন্তু ভারতবাসীর আবেগমথিত উচ্চ সিংহনাদ, মাতৃভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জনের আকুতিও আমরা চাই-ই। এছাড়া আমাদের চলবেই না। আমাদের প্রয়োজনগুলির কথা যখন ভাবি তখন মন নৈরাশ্যে ভরে যায়। কিন্তু যখন স্মরণ করি যে, সময় হয়েছে এবং এখন মা যা-কিছু করার করছেন—আমরা নই—তখনই আবার সাহস ফিরে আসে।

জোয়ারের সঙ্গে উজিয়ে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য—যেখানেই তা আমাদের নিয়ে যাক। মনে যা উঠছে তার সবটুকু মুখ ফুটে বলা—প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থাতেই লোহায় ঘা মারা উচিত। আমরা কি আশা করতে পারি না যে আমরা অকৃতকার্য হব না!

আমার কাজ নিজে দেখা এবং অপরকেও দেখানো। বাকিটা আপনিই হবে। এভাবে দেখাটাই অত্যন্ত কঠিন।

এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ তো আমি কী অনুভব করছি এবং কেন? বর্তমানে আমার চোখে একজন মিশনারি একটা সাপের মতো, যাকে পায়ে পিষে ফেলা উচিত। একজন মিশনারি যত ভালো কাজ করছে আমার বিচারে অন্তত, সে ততটাই খারাপ। আমি মনে করি, এসব বিষয়ে বিচার কর্‌বার জন্য এক মিনিটও আমার পক্ষে নষ্ট করা সম্ভব নয় এবং আমাকে যদি কোনও মতামত দিতেই হয় তাহলে আমি নির্বিচারে নিন্দা করব।

ইংরেজ রাজকর্মচারী নির্বোধ—সদ্য ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে খেলা করছে আর বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে যে সে ভালোভাবে সবকিছু গড়ে তুলছে।

দেশীয় খ্রিষ্টানরা নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এদের প্রতি—অর্থের লোভে যারা নিজেদের বিকিয়ে দেয়, গুপ্তচর বৃত্তি করে, এমন ভাড়াটে কর্মীদের প্রতি ভারতবর্ষের কোনও আকর্ষণ নেই, এদের জন্য কোনও সময়ও নেই। যারা ভারতকে রক্ষা করবে, নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে দেশকে যারা শেখাবে, তাদের কর্মের ধারা ভিন্ন। কংগ্রেস নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে, তা সত্য এবং কিছু ব্যাপারে ভুলও করেছে, কিন্তু টাটা ও সোরাবজীর শিল্প-উদ্যোগ থেকে তা দশ হাজার গুণ ভালো। স্বামীজীই একমাত্র মানুষ যিনি জাতীয় মানুষ তৈরির ব্যাপারে মূল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেন। আমি জানি না অন্য সব বিষয়ে স্বামীজী স্পষ্ট করে কিছু বলেছেন কিনা। মনে হয় বলেননি।

কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। ভারত যদি একবার আত্মরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে সে নিজের ইচ্ছামতো একজন বিদেশি অথবা খ্রিষ্টান, তার পছন্দমতো যে-কোনও লোককে যেখানেই হোক নিয়োগ করতে পারে। সে তো ভিন্ন কথা। বর্তমানে তারা (বিদেশিরা) ভারতের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে এবং তাকে শিক্ষার নামে আফিমের মিষ্টি সিরাপ খাওয়াচ্ছে।

আশাকরি প্রিয় য়ুম, তোমার বিশাল হৃদয়ে এসব কিছুরই স্থান হবে। ভেবো না, যে তোমার প্রিয় কারুকেও আমি প্রত্যাখ্যান করছি। কিন্তু আমি এসব চিন্তা না করে পারছি না। যদি তুমি সত্যিই তাই অনুভব কর এবং যদি তোমার মনে হয় যে আমি ভুল করছি এবং যা করছি তা বিপজ্জনক, তাহলে তোমার পাদস্পর্শ করে তোমাকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার আপন পথে চলব। আমার অন্তর্দৃষ্টি অনুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে।

সেন্ট সারা সর্বদাই দুঃখ প্রকাশ করছে, কেন তোমার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গত গ্রীষ্মে এখানে আসার জন্য ওলিয়া মিঃ লেগেটকে তেমন জোর করেনি। জায়গাটা নৌকাভ্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত এবং ঠিক এইরকম ছুটি কাটানোই মিঃ লেগেটের খুবই দরকার ছিল।

ব্রিটানিতে যা অনুমান করা হয়েছিল তার থেকে মিঃ ল্যান্ড অনেক বেশি ভালো মানুষ। মানুষের জন্য তাঁর সত্যিকারের দরদ আছে, যা আশা করা যায় না।

চরিতকথাটা আমি লিখে ফেলেছি। সে এক বিরাট কাজ! এখন মিঃ স্টেড বলছেন, ওতে ভারতের কথাই বেশি, বসু-র (ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু) কথা কম। সুতরাং ওটা চলবে না। শেষ পর্যন্ত সেটি গ্রহণযোগ্য হবে এই আশা নিয়ে আবার নতুন করে লিখছি। মিশনারিদের লেখার প্রতিবাদে আমি 'Lambs Among Wolves' এই শিরোনামে একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। সেন্ট সারা বলছে, কোনও

পত্রিকায় যদি সেটি প্রকাশিত না হয় তাহলে ডঃ জেন্‌স এটা প্রকাশ করবেন।

মিঃ দত্ত (রমেশচন্দ্র দত্ত) আমাকে যে বইটি লিখতে দিয়েছেন উপস্থিত সেটি আমি লিখছি। এখন পর্যন্ত 'Hindu Woman as Wife' এবং 'Caste' এই দুটি বিষয়ের ওপর লিখেছি। স্বামীজী বলেন, শেষোক্ত বিষয়টি তিনি খুব স্পষ্টভাবে বোঝেন না। আমি কখনই দাবি করতে চাই না যে আমি স্পষ্টভাবে বিষয়বস্তুটি প্রকাশ করতে পেরেছি—যতক্ষণ এই বিষয়ে স্বামীজীর বিবৃতিটি পড়িনি ততক্ষণ বেপরোয়া বড়াই করেছি।

মিঃ গেডেস-এর কাজ আমাকে কতটা সাহায্য করেছে—বা জীবনের শেষ পর্যন্ত আমি তা কতটা কাজে লাগাতে পারব—তা বলে বোঝাতে পারব না। ডঃ বসুর কাজের এত সমালোচনা হচ্ছে যে মনে হচ্ছে এই বিষয়ে এ-পর্যন্ত এটিই সর্বোত্তম কাজ ছিল। শরীরতত্ত্ববিদরা এত উত্তেজিত যে তাঁরা একদল চড়ুই পাখির মতো, কখনও ওই ফলাফল নিয়ে হতাশ হচ্ছেন, আবার অক্সফোর্ডের বার্চ-এর কথা শুনে তাঁরা উৎসাহিত হচ্ছেন। কারণ বার্চ বলেছেন যে ডঃ বসুর experiment তিনি করে দেখেছেন বটে কিন্তু তার ফলাফল অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে। বার্চ-এর মত তাঁকে (ডঃ বসুকে) জানাতে সাহস হয়নি। কিন্তু ডঃ বসু যে তাঁদের চিঠি লিখেছেন তাতে স্বস্তিবোধ করছি। ইতিমধ্যে তাঁরা নিজেদের প্রভাব খাটানোয় বেচারি হিন্দুকে (ডঃ বসু) সোজা কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে কিছু এসে যায় না, ওভাবে ভারতকে দমানো যাবে না। বসুকে না জানিয়ে আমি মিঃ টেগোরকে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে) চিঠি লিখেছি যে-কোনও হিন্দু রাজকুমার ডঃ বসু বা তাঁর কাজের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন কি? এটা কত ভালো হত যদি ভারতের স্বদেশি সরকার এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভার নিতেন যা সমর্থন করার উদারতা ব্রিটিশদের নেই।

বলা বাহুল্য, Bose নিজেই সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বার্চ যেসব experiment করে Bose-এর বিফলতা প্রমাণ করেছি বলে উল্লসিত হচ্ছেন, সেসব experiment তিনি (Bose) আদৌ করেননি।

* * *

বুঝতেই পারছ তুমি ভালো আছ ধরে নিয়ে তোমাকে এই দীর্ঘ পত্র লিখছি। আশা করি ভালোই আছ।

ইতি

তোমার চির আদরের কন্যা

মার্গট

পুণ্যসান্নিধ্যে

স্বামীজীর জীবনে রিজলি ম্যানরের ভূমিকা অনন্য। স্বামীজী তিনবার রিজলিতে এসেছিলেন। শেষবার স্বামীজী যখন এলেন তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তাই বিশ্রামের জন্য স্বামীজীর অন্তরঙ্গ লেগেট পরিবার ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা রিজলিতে। স্বামীজী যাতে স্বাধীনভাবে নিজের মনে থাকতে পারেন সেদিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রিজলি ম্যানরে স্বামীজী ও নিবেদিতা রয়েছেন অথচ ম্যাকলাউড নেই এমনটি ঘটেছে একবারই। আমরা জেনেছি যে মিসেস ব্লজেট নামে এক ভদ্রমহিলা প্যাসাডেনা থেকে ম্যাকলাউডকে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন তাঁদের বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট ভাই ভদ্রমহিলার গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তখনই ম্যাকলাউড ভাইকে দেখার জন্য সেখানে যান। স্বামীজী সোৎসাহে ম্যাকলাউডকে বলেন যে তিনিও বেদান্তপ্রচারের কাজে প্যাসাডেনায় উপস্থিত হবেন যদি ইতিমধ্যে ম্যাকলাউড ওখানে পৌঁছে বক্তৃতার আয়োজন করতে পারেন। ম্যাকলাউড প্যাসাডেনায় পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে দেখেন—স্বামীজীর সুবিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার ভঙ্গিতে তোলা ছবিটির নিচে তাঁর ভাই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শুয়ে আছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই ভাই দেহত্যাগ করেন। এই উপলক্ষে প্যাসাডেনা স্বামীজীর অন্যতম কর্মক্ষেত্ররূপে নির্দিষ্ট হয়। বেদান্তপ্রচারের এক নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে যায়।

ভাগ্যিস, সেইসময় রিজলিতে ম্যাকলাউড অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে নিবেদিতার কলম থেকে এই চারটি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে স্বামীজীর কতকগুলি মূল্যবান কথা। তা না হলে স্বামীজীর বিষয়ে অনেক তথ্যই অজানা থেকে যেত।

॥ উনিশ ॥

রিজলি ম্যানর
৯ অক্টোবর, ১৮৯৯

প্রিয় য়ুম,

সঙ্গের চিঠিখানি পড়ে তুমি খুশি হবে, জানি। কারণ ওই চিঠির ভাব গ্রহণ করার মতো সূক্ষ্ম বোধ তোমারই আছে। তুমি বলেছিলে তিনি লিখবেন এবং তিনি লিখেছেন—ওটি মিসেস বুলকে ফেরত দিয়ো।

আমাদের শেষ আলাপ-আলোচনার সময় আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমি বললাম, জীবনটা যে মন্দ, তা আমি এখনও ভাবতে পারি না। তোমার যাওয়ার ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সেই ধারণা মন থেকে চিরকালের মতো মুছে গেল। দেশে একজনের জীবনে কোনও একটি ঘটনা ঘটেছে—সেই বিবরণ একটি চিঠিতে পড়েই আমার ধারণা পালটে গেল। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই যে তুমি অন্যের মাধ্যমে লাভ করেছ তা এখন আমি উপলব্ধি করছি। সেটি আর এক অদ্ভুত ব্যাপার। তা-ই হয়। জীবন আমার কাছে কী, সেটিই বড়ো কথা নয়, আমার প্রিয়জনের কাছে তার কী মূল্য, সেটিই আসল।

১২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, সকাল

মাত্র একটি বছর আগেকার কথা! মনে পড়ে বারামুল্লা, জগজ্জননী মা আর সেই শেষ বিদায়। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমাদের প্রিয় গুরুদেব (আর কোন সম্বোধন তাঁর দিব্য মহিমার উপযুক্ত হবে বলো?) কেমন যেন খামখেয়ালী শিশুটি হয়ে গেছেন। আর ধূমপান না করার অভ্যাস করছেন। বলছেন, "এই অভ্যাস ছাড়তেই হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন এক ভূতে পাওয়া ক্ষ্যাপা, তাঁরই জন্য আমার জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল!" আর থেকে থেকে সেন্ট সারার প্রতি তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এসব কিছুর ভিতর দিয়ে তাঁর দিব্য মহিমা বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে, তুমি তো তা জান। গতরাতে, হঠাৎ, প্রায় দশ মিনিট ধরে মীরাবাঈয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। তাঁর স্বামী কেমন এক বিশাল মন্দির বৃন্দাবনে তাঁর জন্য তৈরি করে দিতে চেয়েছিলেন, এই শর্তে তিনি যেন জনসমক্ষে না যান—এসব কথা বলছিলেন। নির্বোধের মতো আমি বলে উঠলাম, "কেন তিনি রাজি হলেন না?" "তিনি কি আর তখন এই পঙ্কিল পৃথিবীতে বাস করছিলেন?"—এই

বলে স্বামীজী ঝলসে উঠলেন।' রাজার রাজমর্যাদা, রাজ্যপাট সম্বন্ধে তাঁর তুচ্ছ যুক্তিগুলো কি মীরার পক্ষে বোঝা সম্ভব? নিজেকে মীরার স্বামী বলে পরিচয় দিতে সাহস করা তাঁর স্থূল ও নির্মম ভাবের পরিচয় নয় কি?

১৩ অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল ১১টা

ঘণ্টা দেড়েক ধরে তিনি পায়চারি করছিলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো। আর আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন যেন ভদ্রতার আতিশয্য না করি—আবেগতাড়িত হয়ে 'আহা, কী অপূর্ব', 'কী সুন্দর' না বলি। বাইরের পোশাকী জগৎটির সম্পর্কে সদা-সচেতন হয়ে না চলি। মাঝে মাঝে বলছিলেন, "চলে এসো, হিমালয়ে। আবেগ-উচ্ছ্বাস বর্জন করে নিজেকে জানো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পার পৃথিবীর বুকে—আকাশ থেকে বজ্রের মতো। 'আমার কথা কি কেউ শুনবে' এই ধরনের কথা যারা বলে, তাদের ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। বলার মতো কথা যার আছে, তার কথা জগতের লোক কখনওই না শুনে পারেনি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠে দাঁড়াও। পারবে কি? তাহলে চলে এসো হিমালয়ে এবং শেখো।" তারপর ত্যাগের ওপর শঙ্করাচার্যের যে শ্লোকগুচ্ছ আছে, তা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। প্রতি শ্লোকের শেষে প্রতিবারই—'ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্, মূঢ়মতে!'—এই ধুয়ো তুলে গুন গুন করে আবৃত্তি করছিলেন। আবার মাঝে মাঝে মূল শব্দের পরিবর্তে বলছিলেন "...মার্গটি মূঢ়মতে!" তিনি এই আদর্শগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন—তুচ্ছ সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে—ইন্দ্রিয়ের বিরামহীন অধীনতা থেকে নিজের সত্তাকে দৃঢ়ভাবে মুক্ত রাখতে—সুকোমল শয্যা বা সুস্বাদু আহারের মতো শরতের গাছগুলিকে দেখে আনন্দিত হওয়াও যে ইন্দ্রিয়-সুখোপভোগমাত্র, তা উপলব্ধি করতে এবং মানুষের অর্থহীন স্তুতি ও নিন্দাকে ঘৃণা করতে। "তিতিক্ষা অভ্যাস করো" বারবার এই কথা বলছিলেন। যেমন—প্রতিকারের চেষ্টা না করে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা এবং কষ্টের কথা মনে না রাখা। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এক সাধুর কথা বলেছিলেন যিনি নিজের পচে যাওয়া আঙুল থেকে ঝরে পড়া পোকাটিকে মাটি থেকে তুলে সযত্নে ক্ষতস্থানে রেখে দিতেন।

গতরাতেও তিনি এ-ধরনের প্রসঙ্গই করছিলেন। দুঃখকে ও মৃত্যুকে ভালোবেসে বরণ করার কথা বলছিলেন। এস. সারা উঠে চলে যাওয়ায়

স্বামীজীর মনে হল উনি হয়তো তাঁকে আঘাত দিয়েছেন। আর মিস লুকার সেখানে উপস্থিত না থাকায় মিসেস লেগেট খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। মিসেস লেগেট বললেন, "এইসব পরিশ্রমের (গভীর আলোচনার) পর স্বামীজীর দীর্ঘ বিশ্রাম দরকার।" স্বামীজী সরাসরি আমার সঙ্গেই আলোচনা করছিলেন বলে আজ সকালেও আমি মিস লুকার-এর খোঁজ নিতে পারিনি। সেসময় শুধু মিসেস ব্রিগ্‌স উপস্থিত ছিলেন। মিসেস লেগেট এসে বসার পর আমরা দুজন ফিসফিস করে কথা বলাতেই আলোচনা মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ হল এবং সেখানেই হল আলোচনার ইতি। তিনি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন কীভাবে কেবলমাত্র বৈরাগ্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাই স্থায়িত্ব লাভ করে।

প্রিয় যুম, তোমার অভাব প্রত্যেকে অনুভব করছে, কারণ সকলের মুখেই তোমার নাম। কিন্তু ঠিক কখন, কীভাবে সবচেয়ে বেশি অনুভব করছি তা বোঝাতে পারব না। মনে হয় তোমাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেন্ট সারার। দৈনিক কর্মচক্রও যে নিছক একটি ছকে বাঁধা তা তো আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করছি। অবাক হয়ে ভাবি অ্যালবার্টাও কি এটা আমাদের চেয়ে বেশি বুঝবে না আর সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দেবে না! এটা খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষ কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ আর শুধু মাত্র এই কারণে ওই বন্ধন ছিন্ন করার মতো শক্তি তার নেই। এখানে আমি তা বুঝতে পারছি, কারণ তোমরা সবাই বল যে, "তোমার যদি কাজ থাকে তাহলে আমাদের এই আলাপচারিতায় যোগ দেওয়ার দরকার নেই।" অমনি দুটো পথ আলাদা হয়ে যায়, যার একটি আনে বন্ধন। যতক্ষণ নিচে রয়েছি ততক্ষণ আমাদের হতে হবে মার্জিত ও অমায়িক। ওপরে উঠলে সবকিছুই অগ্রাহ্য করা চলে।

কত কিছু থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন!—"এই পৃথিবীতে তোমার জীবনটা যেন হয় নিজেরই সঙ্গে নিজের একান্তে বোঝাপড়া।" গতকাল তিনি শিবের প্রসঙ্গ করছিলেন। মুক্ত-আত্মার পক্ষে ধ্যানও বন্ধনের কারণ কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য শিব সদাই ধ্যানমগ্ন। তিনি শাশ্বত অবতার। আর হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে এইসব মহাত্মাদের প্রার্থনা ও ধ্যান-ধারণা না থাকলে পৃথিবী এই মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। অর্থাৎ অন্যেরা ব্যক্ত ও মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেত না। কারণ ধ্যানই হল শ্রেষ্ঠ সেবা যা অতি সরাসরি অপরকে দেওয়া যায়।

তিনি তুষারাবৃত হিমালয় আর তার বুকে বিরাজিত বনানীর বিগলিত শ্যামলিমার কথাও বলছিলেন। কালিদাসের কাব্য থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বললেন, এ যেন, ''মহাদেবের দেহে প্রকৃতি-সতীর নিত্য আত্মাহুতি।''

অপূর্ব নয়? তাঁর (ঈশ্বরের) জন্য নিরবধি কাল ধরে নিজের জীবনকে নিঃশেষে নিবেদন করা! মেঘকে উদ্দেশ করে বলা কালিদাসের অপর একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে বললেন, পশ্চিম দিগন্তরেখায় ক্ষীণচন্দ্রের মতো শায়িত—''প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষঃ হিমাংশোঃ।''

এসব ছাড়া অনেক মজার কথাও হল। বস্টনের বিন এবং বস্টনের অন্য খাবার খেলে কী হয় তারও বর্ণনা দিলেন একদিন। ''যদি তুমি একজনের মুখের দিকে তাকাও এবং সে মুখটি তেমন ভাবলেশহীন নাও হয়ে থাকে, তবুও তা তোমার দিকে আসছে, নাকি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা বলতে পারবে না।'' তুমি কি এমন মজার কথা কখনও শুনেছ? আর তিনি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন—''তুমি যদি বস্টনের স্যাঁকা বিন বা ওই দেশের প্রচলিত অন্য কোনও খাবার খেয়ে জীবনধারণ কর, তাহলে তোমার মুখখানিও অবিকল বস্টনবাসীর মতো হয়ে উঠবে।''

আহা কী আবহাওয়া! ওলিয়া এসে পৌঁছেছে—এবং বিশ্রাম নিচ্ছে তার ঘরে। লেডি বেটি বলে দিলেন, খুব দরকার নাহলে আমি যেন তার ঘরে না যাই। সুতরাং রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখাটি, যা মাত্র দু-লাইন লিখেছি সেটা নিয়েই কসরত করে চলেছি। আহা, আমি যদি বাক্‌কুশলী হতাম!

স্বরূপানন্দের কাছ থেকে সুন্দর একটি চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, ''গ্র্যানিকে ও মাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো আর বোলো আমি আজও তাঁদের সেই খামখেয়ালী খোকাটিই রয়ে গেছি।''

মিস লুকার এই চিঠির সঙ্গে কিছু একটা পাঠাতে চাইলেন। স্বামী সারদানন্দের চিঠিও এইসঙ্গে রইল।

এই চিঠিখানি তোমার কাছে পৌঁছানোর অনেক আগেই হয়তো তোমার যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভালো বা মন্দ সবরকম ঘটনারই মুখোমুখি হয়েছ।

তোমার মতো একজন প্রদীপ্ত আত্মাকে আমাদের শুভেচ্ছা জানানোরও কোনও প্রয়োজন দেখছি না, সুতরাং শুভেচ্ছা জানালাম না।

তোমার চিরকালের খুকি
মার্গট

॥ কুড়ি ॥

রিজলি ম্যানর
১৮ অক্টোবর, ১৮৯৯
বুধবার সন্ধ্যা, নৈশ আহারের পরে,
'ইন কটেজ'

প্রিয় য়ুম,

আজকাল রাতের দিকে তুমি কী কর? কী ধরনের ভাব তোমার হৃদয় পূর্ণ করে রাখে? তুমি বিষণ্ণ না উৎফুল্ল, তুমি কি সবেমাত্র ফিরে পাওয়া ভাইটির জন্য আনন্দ বোধ করছ, নাকি তার যন্ত্রণা দেখে কষ্ট পাচ্ছ? এর কোনওটাই এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি।

গত রবিবার রাত্রে যখন আমরা সকলে নৈশভোজে ব্যস্ত, তখন মিসেস লেগেট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মার্গট, তুমি হয়তো আজ রাত্রে স্বামীজীর কাছ থেকে তোমার বিশেষ পরিচ্ছদটি লাভ করবে, কিন্তু জো হবে তাঁর বার্তাবহ।" আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলাম কথাটি কতখানি সত্য। সকলেই হৃদয়ের গভীর শুভেচ্ছা জানালাম—যেন তুমি সফলকাম হও।

গত সপ্তাহে কয়েকদিন স্বামীজীকে এমন দিব্যভাবে পেয়েছি যা বর্ণনা করা যায় না। আহা, তুমিও যদি উপস্থিত থাকতে ও কথাগুলি শুনতে! কারণ ওই কথাগুলি যখন আমি তোমায় লিখি তখন আর তেমনটি যেন থাকে না। তুমিও তা জান। ওই কথাগুলি শোনার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায় যখন তার অংশ নিতে তুমি উপস্থিত থাক। আমি জানি, স্বামীজীর কথা ঠিক ঠিক ভাবে শোনার শিক্ষা তুমিই আমাকে দিয়েছ। যাদের এখনও স্বামীজীর কথা ওইভাবে শোনার শিক্ষা হয়নি, তাদের আমি সহ্য করতে পারি না।

গত শনিবার ও রবিবার আগন্তুকেরা প্রায় সকলেই উদ্‌গ্রীব ছিল মিসেস বুলের কথা শুনতে। তাই মিসেস ব্রিগ্‌স ও আমি আচার্যদেবকে অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। মিসেস ব্রিগ্‌স সত্যিই একজন অপূর্ব শ্রোতা। একটি কথাও না বলে, একটি বারও অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে তিনি শুনে গেলেন।

রবিবার দিন মধ্যাহ্ন আহারের সময় স্বামীজী এসে তিন ঘণ্টা একা ওলিয়ার সঙ্গেই কাটিয়ে গেলেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন ওলিয়া যেন আর সেই আগের মানুষ নয়। আবার সোমবার সাড়ে দশটায় এসে তিনি সারা

সকাল কাটালেন। সঙ্গে বেদ-উপনিষদ এনেছিলেন; আর ঠিক ঠিক বলতে গেলে কেবল ওলিয়ার জন্যই জ্ঞানযোগের ক্লাস করলেন—যদিও আমাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলাম। কী অপূর্ব! নয় কি? দুপুরের খাওয়ার সময় নিউইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে অ্যালবার্টা এসে উপস্থিত।

তারপর মিসেস ব্রিগ্স ও আমি সারা দুপুর ও সন্ধেবেলা বসে তাঁর কথা শুনলাম আর সেইদিন শেষবার তাঁকে দেখলাম। কারণ তার পরদিন থেকে আগামী ১ নভেম্বর পর্যন্ত আমি নিজেকে শোয়ার ঘরে বন্দী করেছি।

তাহলে দেখছ, এই চিঠির পরে অনেকদিন তুমি আমার কাছ থেকে স্বামীজীর বিষয়ে আর কোনও খবর পাবে না। আমাকে 'কালী'র ওপর লেখাটি শেষ করতেই হবে। আরও অনেক কিছু করার আছে। এদিকে একান্তবাস করার একটা চেষ্টা করব—এই আকাঙ্ক্ষাও অনেকদিনের। আচার্যদেবই ছিলেন এই ইচ্ছাপূর্তির অন্তরায়। তাঁকে ও সেন্ট সারাকে বুঝিয়ে রাজি করালাম এবং সকলকে জানাতে হল যে আমি 'রিট্রিট' বা একান্তবাসে যাচ্ছি পনেরো দিনের জন্য। তবে অ্যালবার্টের পার্টি ও নাচের আসর ঠিকই বসবে।

আমি আবিষ্কার করলাম এই মাসে স্বামীজীর উপস্থিতি অ্যালবার্ট ও ওলিয়ার পক্ষে যথার্থ শিক্ষার কাজ করছে। এমন নির্বোধের মতো কথা কে ভাবতে পারল যে আমি এ-বিষয়ে তাদের জন্য কিছু করতে পারতাম! অ্যালবার্ট বলছে যে শেষ পর্যন্ত ফরাসী ভাষা শিক্ষার ভিতর দিয়ে সে চিন্তা করতে শিখেছে!

আজ রাত্রে আমি কালীসাধকদের ওপর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে একেবারে আটকে গেছি। রামপ্রসাদ পর্যন্ত লিখে ফেলেছি; আর ওই অংশ শেষ করে রামকৃষ্ণতে পৌঁছাতে চাইছি—কিন্তু কিছুতেই পারছি না। কয়েক পৃষ্ঠা হিজিবিজি লেখার পর ছিঁড়ে ফেললাম ও মনের দুঃখে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় নকল করতে লাগলাম। ভয় হচ্ছে তুমি হাসবে, আমার চিন্তাগুলো এখনও গুছিয়ে সাজানো হয়নি। আমার কিন্তু আশা আছে যে, এই সমস্যা বেশিদিন থাকবে না।

শুক্রবার দুপরে খাওয়ার সময় রাজা আবার শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। নিজেকে তীব্র ধিক্কার দিলেন, এইজন্য যে, সেইসব দিনে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে তাঁর অন্তর এমন বিষিয়ে গিয়েছিল যে, তিনি কেবলই খুঁজে বেড়িয়েছেন ও যাচাই করতে ব্যস্ত থেকেছেন—রামকৃষ্ণ নামের ব্যক্তিটি

যথার্থই পবিত্র কিনা! ছয় বছর এইভাবে সংগ্রাম করার পর তিনি বুঝেছিলেন রামকৃষ্ণকে আলাদা করে পবিত্র বলা যায় না কারণ তিনি পবিত্রতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময় ও মজার মানুষ ছিলেন—আর তখনও পর্যন্ত স্বামীজীর কাছে 'পবিত্রতা' শব্দের তাৎপর্য ছিল স্বতন্ত্র।

মনে হচ্ছে গত শনিবার মধ্যাহ্ন আহারের পরে আমার মনটা আবার ব্যাকুল হয়েছিল তোমার জন্য। আমি সেই ভেলভেটের নিচু সোফাতে বসেছিলাম। আর তিনি বসেছিলেন মেঝের ওপরে আলোর দিকে মুখ করে—ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমার ভালো লাগে তাঁর বসার এই ভঙ্গিটি! সম্ভবত বুয়র যুদ্ধের কথা ভেবে তিনি বিভিন্ন জাতির ভূমিকা নিয়ে কথা আরম্ভ করলেন এবং ক্রমে প্রসঙ্গটি শূদ্রসমস্যায় যখন এসে পৌঁছাল—যে সমস্যার সমাধান এখানেই প্রথম হতে পারে—সেসময় তাঁর মুখখানি উদ্ভাসিত হল এক নতুন দিব্যভাবে—যেন তিনি ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে তা যথার্থ দেখতে পাচ্ছেন। এ-যেন সেইরকম দৃষ্টি যা ফুটে উঠেছিল যিশুখ্রিষ্টের মুখে, যখন তিনি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম যুগের ভীষণতা দেখেছিলেন—যার নব অঙ্কুরগুলি রোম সাম্রাজ্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। স্বামীজী জাতির সংমিশ্রণের কথা বললেন। বললেন সেই ভয়ংকর বিক্ষোভের কথা, যার ভিতর দিয়ে পরবর্তী অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, "কলিযুগ যখন ঘনিয়ে আসে তখন এগুলি তার লক্ষণ। তখন ঈশ্বরের পরিবর্তে একমাত্র উপাস্য হয় অর্থ; সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় গায়ের জোরে আর দুর্বলকে যখন মানুষ উৎপীড়ন করে, তখনই জানবে ঘোর কলি।" তারপর আগামী ৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী জ্যোতিষীর গণনার কথা স্মরণ করে (যা তাঁর কাছে রূপকথার গল্পের মতো অবাস্তব) হেসে বললেন, "তা বলে এই কলিযুগ অত অল্পস্থায়ী হবে না।"

হ্যাঁ, আমার কাছে নোট করা আছে যে, সেই দিনটি ছিল শনিবার। ওই দিনই দুপুরবেলা খাওয়ার সময় প্রত্যেকেই বস্টনের Feneloras-এর কথা বলাবলি করছিল। মিসেস বুল স্বামীজীর দিকে ফিরে বললেন—কবিতা লেখা তাঁর প্রতিভার দুর্বল প্রকাশ, যেটার চর্চা করতে গিয়ে তিনি অনেকটা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাঁর বেহালাবাদক স্বামী মিঃ বুলের কথাও বললেন। মিঃ বুল তাঁর সংগীতের সমালোচনায় আহত হতেন না, কারণ তিনি জানতেন তাঁর সংগীতকে কখনওই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায় না। কিন্তু রাস্তাঘাট তৈরির এঞ্জিনিয়ারিং

ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই স্পর্শকাতর আর এ-ব্যাপারে সহজেই তাঁকে তোষামোদ করা যেত। তারপর আমরা খুব মজা করে স্বামীজীকে খ্যাপাতে লাগলাম। আমরা বললাম যে, ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সজাগ নন বরং অমনোযোগী। তাঁর পোর্ট্রেট আঁকার বৃথা অহংকার নিয়েও কথা হল। আমারই তিন-চারটি পোর্ট্রেট এঁকেছেন যা অন্যদের মতে আমার মতো চেহারার পক্ষেও মানহানিকর। কিন্তু এতে তাঁর ভারি স্ফূর্তি—আমাদের প্রিয় রাজা! ঠিক তখনই যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, একটা জিনিস আছে যাকে আমরা প্রেম বলি, কিন্তু আরও একটা বস্তু আছে, তা হল—এক হয়ে যাওয়া (Union) বা একাত্মতালাভ। আর এই এক হয়ে যাওয়া প্রেমের চেয়ে অনেক বড়ো। আমি ধর্মকে ভালোবাসি না, আমি ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন। ধর্ম আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমার জীবন মানেই ধর্ম। সেই জিনিসটাকে কেউ ততটা ভালোবাসে না, যার মধ্যে তার জীবন কেটেছে, যার মধ্যে সে কিছু যোগ্যতা অর্জন করেছে। যা-কিছু আমরা ভালোবাসি, সেটা আমার একান্ত সত্তা নয়। তোমার স্বামী বেহালা নিয়ে জীবন কাটালেও সংগীতকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা দেননি। তাঁর প্রাণের টান ছিল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার ওপর, যে বিষয়ে তিনি তুলনায় অল্পই জানতেন। ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এখানে, আর এইজন্যই জ্ঞানের স্থান ভক্তির ওপরে।"

সারা সকাল চেঙ্গিস খাঁর অধীনে মোগল সেনাদের নিয়ে তিনি কথা বলছিলেন মিসেস ব্রিগ্‌স ও আমার সঙ্গে। কথাটা আরম্ভ হয়েছিল law (ধর্মশাস্ত্র) বা নিয়ম নিয়ে। প্রাচীন হিন্দুদের ধারণায় এই নিয়মগুলির প্রভাব সর্বাধিক, এমনকি শাসকদের ওপরেও তা নিত্য জাগ্রত। তিনি আরও বোঝালেন বেদে দেখা যায় law বিষয়ে হিন্দুদের সঠিক ধারণা ছিল—অন্য জাতিরা এটিকে অনুশাসন (Regulation) বলেই জানে।

লাঞ্চ-এর আগে স্বামীজী আমাকে মিসেস Vaughan-এর সঙ্গে দেখা করাতে সেই প্রথম নিয়ে গেলেন। বাড়িতে ফিরে এসেই পত্নীভাবে পূজা করার বিরুদ্ধে ফেটে পড়লেন। বললেন, "মাতৃভাব অনেক বড়ো পত্নীভাবের চেয়ে। আমরা প্রাচ্যবাসীরা দু-একটা বিষয় তোমাদের থেকে ভালো বুঝি। বিবাহ সবদিক থেকেই একটা মহান তপস্যা।"

এরপর তোমাকে আর কী লিখি। গত রবিবার সন্ধ্যায় মিস স্টাম শেষবার এখানে রাতের আহার গ্রহণ করেন। আমরা স্ত্রীজাতির ওপর শোপেনহাওয়ারের

প্রবন্ধটি জোরে জোরে পাঠ করলাম। তারপরে আমি মিস স্টামকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলাম—আমাদের অভিভাবক হয়ে সঙ্গে এলেন স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দ। ফেরার সময় মৃদুস্বরে স্বামীজীকে বললাম, "রাত্রির এই নিস্তব্ধ প্রহরে আমি যেন নিজেদের পদশব্দও সহ্য করতে পারি না।" চমৎকার চাঁদের আলো। আমরা নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি, একটু শব্দই যেন এই পরম লগ্নের পবিত্রতা নষ্ট করবে। স্বামীজী বললেন, "ভারতে বাঘ যখন গভীর রাত্রে শিকারকে অনুসরণ করে, তখন তার থাবা বা লেজ এতটুকুও শব্দ করলে তাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দেয়।" বাঘ কীভাবে হাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে হাঁটে, বোঝালেন।

স্বামীজী বললেন—পাশ্চাত্য নারীদের উচিত সৌন্দর্যকে শান্তভাবে নিজের সত্তায় অন্তর্লীন করা এবং অন্য সময়ে মনের মধ্যে সেই চিন্তায় রত থাকা। তিনি মিসেস Vaughan-কে উপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যানের উপরে যে পাঠ দেন, তার থেকে তোমাকে একটি পঙ্‌ক্তি লিখে পাঠালাম, "যখন সব বাসনার লয় হয়, হৃদয়ের সব গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।"

কী অসাধারণ সোমবারের দুপুর! আমি আর মিসেস ব্রিগ্‌স সোফায় ও মেঝেতে বসেছিলাম। তিনি শুধু অনর্গল বলেই চলেছেন। সেসময় তোমার দেবীর মতো বোন—মিসেস লেগেট সমস্ত আগন্তুককে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মনে হচ্ছিল আমরা যেন ভারতবর্ষে বসে আছি। যারা অদ্বৈতবাদ ও বৈদিক সাহিত্য অনুসরণ করতে চায়, তাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে বড়ো ক্ষুদ্র মনে হত। কিন্তু আজ তাঁর কথায় মনে হল—অপর পক্ষের মতও কত জোরালো!

আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল রামপ্রসাদের গান দিয়ে। এতটুকুও ছেদ না রেখে তোমাকে সমস্ত আলোচনার ধারা লিখে পাঠাচ্ছি। স্বামীজী রামপ্রসাদের গান দিয়ে শুরু করলেন:

"যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।।
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই
যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে, মা
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥...

নূপুরে মিশায়ে তাল
সেই তালের এক গীত শিখেছি।
তাথ্রিম তাথ্রিম বাজছে সে তাল
নিমিরে ওস্তাদ করেছি॥
প্রসাদ বলে কালী বলে
আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি
বোঝ না রে মন ঠারে ঠুরে ॥"

তারপর আরও বললেন,

"ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্যবিনোদিনী
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম সঞ্চারিণী॥..."

"রামকৃষ্ণ পরমহংস দেখতে পেতেন তাঁর ভিতর থেকে একটি দীর্ঘ শ্বেতসূত্র বেরিয়ে আসছে—তার শেষপ্রান্তে একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ। ক্রমে ওই জ্যোতি প্রসারিত হলে তিনি দেখতেন, তার মধ্যে বীণা হাতে জননী বিরাজিতা। মা বীণায় ঝঙ্কার দিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে বীণার ধ্বনিত সুরগুলি থেকে সৃষ্টি হত—পশুপাখি, বিশ্বভুবন এবং সেই ভুবনের মধ্যে সবকিছু যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকত। আবার মা যখন বীণাবাদন থামাতেন, সবকিছু অদৃশ্য হত। সেই জ্যোতি ক্রমশ ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে আসত, কেবল একটি আলোর গোলক অবশিষ্ট থাকত—সেটিও ক্রমে শ্বেতসূত্রের রূপ ধরে ছোটো থেকে আরও ছোটো হয়ে তাঁরই মধ্যে লীন হয়ে যেত। ওঃ বলতে পারি না, সে যে কী অলৌকিক দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হত আমার সামনে—আমার জীবনের সব থেকে অতীন্দ্রিয় ঘটনা! দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলায় নিঃসীম অন্ধকারে বিরাজ করত পরিপূর্ণ নিঃস্তব্ধতা—যা কেবল ভঙ্গ হত শৃগালের চিৎকারে। রাতের পর রাত আমরা সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি এবং তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। আমি তখনও বালকমাত্র।"

"স্বামীজী, আপনি কি তাঁর পাশে বসতেন, না মুখোমুখি?"

"দুইভাবেই বসতাম। এটা কেবলমাত্র কয়েকদিন বা কয়েকসপ্তাহের কথা নয়। বছরের পর বছর এইভাবে কেটেছিল... হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

হ্যাঁ য়ুম, সেই ৬ অক্টোবর তারিখের এক বছর পরে এই প্রথম আমি আবার তাঁর কণ্ঠে পুরোনো ধ্বনি শুনলাম—'হরি ওঁ, হরি ওঁ।'

তিনি আরও বলে চললেন, "গুরুই স্বয়ং শিব এবং শিবরূপেই তাঁর আরাধনা হওয়া উচিত। কারণ তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হয়ে অধ্যাত্মজ্ঞান দান করেন—যার দ্বারা অজ্ঞান ধ্বংস হয়ে যায়। শিষ্যকে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করতে হবে, এমনকি পুণ্যকর্মের ফলও। নতুবা সেটি বন্ধনের কারণ হয়ে নূতন প্রারব্ধ সৃষ্টি করবে। তাই হিন্দুরা তোমাকে একপাত্র জল দিয়ে বলবে—পৃথিবীকে দিলাম অথবা জগজ্জননীকে।"

"একজনই আছেন যিনি নিজের অনিষ্ট না করেও সবই গ্রহণ করতে পারেন—যিনি অনন্তকালের জন্য অক্ষয় এবং অব্যয়, যিনি বিশ্বের সমস্ত গরল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। তুমি যা-কিছু কর, সবই সেই মহাদেবকে উৎসর্গ করে দাও।" তারপরে বলতে লাগলেন বৈরাগ্যের কথা—যৌবনকাল উৎসর্গ করা কতই না মহৎ! রাত্রে আবার সেই কথার উল্লেখ করে অ্যালবার্টকে নিজ যৌবন উৎসর্গ করতে বললেন। কেবল বার্ধক্যদান বড়োই দুঃখের। যারা বৃদ্ধ বয়সে সংসারবিরাগী হয়ে আসবে, তারা নিজেরা মুক্ত হতে পারবে কিন্তু গুরু হতে বা অপরের পথপ্রদর্শক হতে পারবে না। যারা যৌবনে আসবে তারাই কেবল নিজেদের কোনও সুবিধার কথা না ভেবে অপরকে ভবসাগরের পারে নিয়ে যেতে পারবে। স্বামীজী তারপরে আমার ভাবী স্কুলের কথা তুললেন। "মার্গট, তুমি যা-কিছু দিতে চাও, দাও—A.B C শেখানো নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। এর মূল্য সামান্য। ছাত্রীদের যতটা ইচ্ছা—রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, শিব এবং কালী শিক্ষা দিতে চাও, দাও। কেবল পাশ্চাত্যবাসীদের ঠকিয়ো না, কখনও ভান কোরো না যে, A B C শেখানোর জন্য তুমি টাকা চাইছ। তুমি খোলাখুলি বলো, ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যা তুমি দিতে চাও। তাদের কাছে সাহায্য দাবি করো, ভিক্ষা কোরো না। মনে রেখো, তুমি কেবল একান্তভাবে মায়ের সেবিকা। মা যদি তোমাকে কিছু না দেন, তবুও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকো এই ভেবে যে, তিনি তোমায় কাজ থেকে মুক্ত করেছেন। হায়, মা যদি আমাকেও ওইভাবে ছেড়ে দিতেন!"

প্রিয় য়ুম, তোমাকে অনন্ত অনন্ত ভালোবাসা জানাই এবং তোমার বর্তমান কাজের জন্য শুভেচ্ছা।

ইতি
তোমার স্নেহের কন্যা
মার্গট

পুনশ্চ—মিসেস লেগেট কি আর একটি খামের ভিতর ভরে এই পত্রটি পাঠাতে পারেন? তিনি ইচ্ছা করলে পত্রটি পড়তে পারেন।

॥ একুশ ॥

রিজলি ম্যানব
শুক্রবার,
২৭ অক্টোবব, ১৮৯৯

মিষ্টি য়ুম য়ুম,

তোমার প্রথম পত্রটি (প্যাসাডেনা থেকে) গতকাল পেয়েছি। তোমার ভাইয়ের জীবনের আশা করতে পারছ শুনে আমি খুব আনন্দিত। স্বামীজীর চারপাশে অকারণ ঘোরাঘুরির বদলে নিজের মতো 'সিংহাসনে' (?) আসীন হয়ে খুশি হয়েছ—জেনে আমিও সুখী।

আমরা সকলে ওলিয়ার শোয়ার ঘরে বসেছিলাম, স্বামীজীও সেখানে ছিলেন। তোমার ওই 'সিংহাসন' নিয়ে রূঢ় মন্তব্যগুলি শুনে হাসলেন। মনে হল তাঁর সেটি খুব ভালোও লেগেছে। তিনি তো সর্বদাই ঘোষণা করছেন, সময় হলেই তোমাকে নিয়ে কালীর দেশে যাবেন। তুমি তাঁর যে ছবিটির কথা লিখেছ তা সত্যিই খুব মজার ব্যাপার। 'রামকৃষ্ণের লোক', 'রামকৃষ্ণের লোক'—আমিও তোমার সঙ্গে একমত। তুমি যদি এতটাই সাম্প্রদায়িক হতে চাও তাহলে বলা ভালো : *'স্বামীজীর লোক' 'স্বামীজীর লোক'*—এটাকে অন্য কোনও অর্থে বলিনি।

বেচারী আমাদের রাজা! গতরাত্রে তাঁর ঘুম হয়নি—তাই সকাল সোয়া দশটা পর্যন্ত বিশ্রামের চেষ্টা করছেন। গত মঙ্গলবার বিকেলে তিনি আমায় নির্জনবাসের নির্দিষ্ট ডেরা ছেড়ে নিচে নেমে আসার জন্য বলে পাঠালেন। সুতরাং দুদিন অন্তত পূর্ণ অবকাশ পেয়েছিলাম। মিসেস ব্রিগ্‌স ও মিসেস হেল এবং ওলিয়ার এক বন্ধু এখন এই বাড়িতে রয়েছেন।

স্বামীজী ওলিয়ার জন্য কত না করেছেন! কিন্তু বেচারী ওলিয়া—সে অসুস্থ, তার মনের কোনও স্থিরতা নেই আর সেইসঙ্গে খিটখিটে মেজাজ! আমাদের সকলের জন্য জীবন মানে একটা ক্রমবিকাশ। কেবল যাঁরা মুক্ত হয়ে আসেন তাঁরাই মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারেন। ওলিয়া যেন

নবজন্মের স্পর্শ পেল। কিন্তু ভাবটিকে নিজস্ব করে নেওয়ার জন্য এখন তার সব চাইতে বেশি দরকার কিছু সময়।

এবার আমার কথা বলি। গত রবিবারে 'কালী দি মাদার' শেষ করেছি। স্বামীজী ভারতবর্ষের ওপর একটা বই লিখতে বলছেন—আমি এখন তাই নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করছি। 'প্রেম ও বিবাহ' নিয়ে আর একটি বই যেটি আমি ও মিসেস বুল একসঙ্গে লিখব, তা নিয়েও ভাবছি। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, যদি কোথাও না গিয়ে একটানা কয়েক সপ্তাহ এখানেই থাকতে পারতাম! কিন্তু হয়তো এই মুহূর্তে আদেশ আসবে অন্যত্র চলে যাওয়ার।

অ্যালবার্ট আমার সঙ্গে এখানে দিন দুয়েক থাকছে। আমি তাকে ও ওলিয়াকে—দুজনকেই খুব ভালোবাসি। বেবি (লেগেটের শিশুকন্যা) আমার খুব কাছে চলে এসেছে। সামনের দরজায় তাকে দেখেই পালিয়ে এলাম কারণ তার আকর্ষণ এত বেশি যে দুটো কথা বলতে গেলেই আজকে আর তোমাকে চিঠি লিখতে পারতাম না। এখানে আমাদের মজার শেষ নেই—সে সবসময় হিন্দু ভঙ্গিতে বসার জন্য ব্যস্ত, আর অনেক লম্বা লম্বা গল্প শুনতে চায়—কেমন করে হিন্দুরমণী তার স্বামীর জন্য ভাত রান্না করে আর কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করে ইত্যাদি।

কালকে মিসেস বুল তাঁকে লেখা মিঃ স্টার্ডির পত্রটি পড়ে শোনালেন এবং আমার মনে হয় সেটি তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমাকে বলতেই হবে যেভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ও অকপটে চিঠিখানা লেখা হয়েছে তাকে আমি সম্মান না করে পারছি না। মিঃ স্টার্ডি নিজের যুক্তি অনুযায়ী অনুভব করেছেন এবং সেকথা তাঁর নিজের মতো করে বলার অধিকার কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না। সব থেকে মন্দ দিক হল তাঁর যুক্তিগুলি তাঁর অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এতটুকুও প্রভাবিত নয়। আমাকে এটি স্বীকার করতেই হবে—এ-পর্যন্ত যা-কিছু ঘটেছে স্পষ্টতই আমি তার মূল কারণ। মিসেস বুলের মাতৃভাব সত্যিই অনুপম। গতকাল তাঁর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে তা শুনেছি এবং অভিভূত হয়েছি। তিনি একজন প্রকৃত মহীয়সী মহিলা। স্বামীজী থাকলে বলতেন তিনি মহাত্মা। মিঃ স্টার্ডি স্বামীজীকে তাঁর দোষ দেখিয়ে এবং তার ফলে তিনি নিজে কতটা নিরাশ হয়েছেন তা জানিয়ে চিঠি লিখলে—তাতে অপর কারও বিরক্ত হওয়া চলে না—এটা তাঁদের দুজনের ব্যাপার। কিন্তু যখন মিঃ স্টার্ডি স্বামীজীর সম্বন্ধে আমার কাছে লেখেন তখন সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার নয় কি?

ছোটো বইটির পাণ্ডুলিপি শেষ করা হয়নি। এখনও মিসেস রায়, ধ্যান, বেবিকে বলা কালীর গল্প—এসব বিষয় যোগ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। আমি আশা করি, তুমি সেগুলি ডায়েরি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে সোজা আমাকে পাঠিয়ে দেবে।

রবিবার রাতে স্বামীজী এসেছিলেন এবং আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি তখনও নিভৃতবাসে রয়েছি। তিনি প্রায় একঘণ্টা ছিলেন—আমাকে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক অবতারই প্রকাশ্যে বা গোপনে মাতৃ-উপাসক। "তা না হলে তাঁদের শক্তির উৎস আর কী হতে পারে?" শিব এবং কালীকে তাঁদের উপাস্য হতেই হবে। তারপরেই রামায়ণের প্রসঙ্গে চলে এলেন। তোমাকে একটি অদ্ভুত কথা বলব। যখন সদানন্দ রামায়ণ প্রসঙ্গ করে তখন আমি দৃঢ়নিশ্চিত যে হনুমানই (মহাবীর) হলেন প্রকৃত নায়ক। যখন স্বামীজী বলেন তখন কাহিনীর কেন্দ্রে দেখি রাবণকে।

আমি আশা করছি ওলিয়া অন্যত্র চলে গেলে আমার ভাগ্যে রিজলিতে একান্তবাসের পর্বটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং আরও অনেক লিখে উঠতে পারব। যদিও আমার চাওয়ার ওপর কিছুই নির্ভর করছে না তবু আজকে সকালে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি এখন এখান থেকে চলে যেতে একান্ত অনিচ্ছুক। আশা করি, আমার চিন্তা একেবারে অসঙ্গত নয়।

মিসেস বুল তাঁর নিপুণ পরিচালনায় অতিথিদের পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেন। ফলে সাধারণত রিজলিতে যেমন স্বামীজীই সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকতেন এবার তেমনটি হচ্ছে না। এতে উনি অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। গতকাল যখন মিসেস লেগেট, মিসেস বুল ও আমি একসঙ্গে ছিলাম, তিনি এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বাঃ! কী সুন্দর, এখানে আর কেউ নেই। এসো আমরা একটু গল্প করি।"

স্বামীজী বললেন—রামকে বলা হত 'নীলোৎপললোচন'। সীতা উদ্ধারে তিনি জগজ্জননীর ওপর নির্ভর করেছিলেন—রাবণের আর্তিও সেই মায়েরই কাছে। রাম এসে দেখলেন, রাবণ মায়ের কোলে বসে আছে। বুঝতে পারলেন যে তাঁর আরও ভয়ংকর তপস্যার দরকার। মায়ের কৃপালাভের জন্য তিনি সংকল্প করলেন ১,০০১ নীলপদ্ম দিয়ে মায়ের মূর্তিপূজা করবেন। লক্ষ্মণ মানস সরোবর থেকে পদ্মফুল নিয়ে এলে রাম মায়ের বোধনের আয়োজন

করলেন। তখন শরৎকাল। মায়ের প্রকৃত পূজার সময় ছিল বসন্ত ঋতুতে। তখন থেকে রামচন্দ্রের এই অকালবোধন স্মরণে শরৎকালেই (সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে) মহামায়ার মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পূজা করতে বসে রাম মায়ের শ্রীচরণে এক সহস্র নীলপদ্ম উৎসর্গ করলেন। কিন্তু একটি কম পড়ল। (কারণ মা স্বয়ং একটি পদ্ম চুরি করেছেন!) রাম কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি হার মানবেন না। পূজা সমাপ্ত করবেন বলে তিনি একটি ছুরি চেয়ে নিয়ে নিজের নীলোৎপলসদৃশ নয়ন উৎপাটিত করতে উদ্যত হলেন। তখন মা তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে মহানায়ককে আশীর্বাদ করলেন—যেন তিনি অস্ত্রযুদ্ধে বিজয়ী হন। যদিও কেবল অস্ত্র দিয়ে নয়, রাবণের পরাজয় সম্ভব হয়েছিল তার নিজের ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায়।

স্বামীজী বলেন এমন যে বিশ্বাসঘাতক ভাই তারও মহিমার কথা রামায়ণের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। বিভীষণ রয়েছে রামের দরবারে। সেই সভায় এসে উপস্থিত হলেন রাবণের বিধবা পত্নী—সেই মহাবীরকে দর্শন করতে যিনি তাঁকে পতি-পুত্র-হারা করেছেন। সপার্ষদ রাম যখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন নানা অলংকারে বিভূষিতা অনুচরবেষ্টিতা কোথায় সেই মহারাজ্ঞী! তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন হিন্দু বিধবার দীনবেশে এক সাধারণ নারী। বিমূঢ় হয়ে রামচন্দ্র জানতে চাইলেন, "কে এই মহিলা?" বিভীষণ উত্তর দিলেন, "রাজন্, তাকিয়ে দেখুন, আপনার সামনে সিংহিনী উপস্থিত—যাঁকে আপনি তাঁর সিংহ ও শাবকদের থেকে বঞ্চিত করেছেন। আপনাকে দর্শন করতেই তিনি এসেছেন।"

ও য়ুম, নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কত মহান। সত্যিই এমনটি আর কারও নয়, এমনকি শেক্সপীয়রেরও নয়। Aeschylus যখন Antigone অথবা Sophocles যখন Alcestis-এর চরিত্র সৃষ্টি করেন—তাদেরও নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা ছিল না। স্বামীজী নারীজাতির বিষয়ে আমাকে যা যা বলেছেন, সেগুলি যখন পড়ি, তখন মনে হয়, তাঁর প্রতিটি কথা আগামী বিশ্বের সমগ্র নারীজাতির প্রতি তাঁর কী গভীর বিশ্বাসের পরিচায়ক! কিন্তু প্রথমত ও প্রধানত সেগুলি তাঁর স্বদেশের নারীকুলের প্রতি প্রযোজ্য। তাঁর মতো মহান হৃদয় যা-কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছে বাস্তবে সেই আদর্শের যোগ্য কেউ হতে পারবে কিনা সে-কথা একান্তই তুচ্ছ। তাঁর হাতের যন্ত্র হতে পারাও কত বড়ো সৌভাগ্য, কিন্তু আমি তা-ও

হতে চাইব না—যদি তাতে কোনও যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে স্বামীজীর পাষাণকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা বিশ্বের সমক্ষে অধিক প্রকাশিত হয়।

আমি যখন মঙ্গলবার রাতে নিচে নেমে এলাম, তিনি ধীরে ধীরে ভক্তিভাবে আপ্লুত হতে লাগলেন। হৃষীকেশের কথা আমাদের বললেন। "সেখানে প্রত্যেক সন্ন্যাসী নিজের জন্য ছোটো ছোটো কুঠিয়া বাঁধে। সন্ধ্যায় প্রজ্বলিত ধুনির চারধারে সকলে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হয়ে অনুচ্চস্বরে উপনিষদের প্রসঙ্গ করেন—সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই প্রকৃত সত্য কী তা তিনি জেনে নেন এবং তখন বৌদ্ধিক শান্তি লাভ করেন। এখন বাকি রইল সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করা। সুতরাং আলোচনার প্রয়োজন আর রইল না। হৃষীকেশে পর্বতের অন্ধকারে, প্রদীপ্ত ধুনির সামনে তাঁরা কেবল উপনিষদের কথা বলবেন, ধীরে ধীরে তাঁদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হবে। তাঁরা নিজ কুশাসনের ওপর 'সমং কায়শিরোগ্রীবঃ' হয়ে উপবেশন করবেন এবং তারপরে নিঃশব্দে নিজ কুঠিয়ায় চলে যাবেন।"

বুধবারেও তিনি অনেক কথা বললেন। এমন মহৎ বিষয়গুলির আলোচনা করলেন যা আগে কখনও তাঁর মুখে আমি শুনিনি। একবার তিনি বললেন, "হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড়ো দোষ হল, এর মতে বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তি নেই। ফলে গৃহস্থ হীনম্মন্যতাবোধের শিকার হচ্ছে। তার ভূমিকা কেবল কর্ম। বৈরাগ্য তার জন্য নয়। কিন্তু আমি এই প্রশ্নের ভিন্নভাবে সমাধান করেছি। আমার মতে ত্যাগই একমাত্র উত্তর। অপরে আর যা-কিছু করতে চেষ্টা করছে—সেটি ভ্রমমাত্র। অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তির প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাওয়ার জন্য আমরা সকলেই সংগ্রাম করছি। এর অর্থ কী? অর্থাৎ আমরা যত দ্রুত পারি মৃত্যুর অভিমুখে ধাবমান—আমরা প্রত্যেকেই। যে বলিষ্ঠ ইংরেজ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চাইছে সে বরং আমাদের অনেকের চেয়ে মৃত্যুর জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। নিজেকে বাঁচানো একটা বিশেষ ধারা, তারপরেই আসছে ত্যাগ। অশুভ হল শুভেরই আর এক পিঠ—জীবনের প্রতি আসক্তি মৃত্যুকে ভালোবাসারই নামান্তর। এ বিষয়টি নিজের মতন করে নাও।"

য়ুম, আমার কাছে কালীর মাতৃভাবের মধুরতম সহাস্য প্রকাশ তুমি। আমি তোমার কথা ভাবছি, তুমি এখন নিরুদ্দিষ্ট ভাইটিকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা—সেই ভাইটির কথাও ভাবছি যে ফিরে পেয়েছে তোমাকে। যাই ঘটুক, তার এই শেষ সুদীর্ঘ যাত্রায় তোমার মধুর উপস্থিতি তাকে অনেকখানি

সান্ত্বনা দেবে, সে যাত্রা করবে এই বোধ নিয়ে যে মৃত্যুর পরপারে এক অমৃতলোক বিরাজিত।

বুধবার রাতে স্বামীজী পবিত্রতার কথা বলতে শুরু করেন যা তিনি নিজে অনুশীলন করবেন ও করাবেন। এই প্রসঙ্গে যখন তিনি আরও গভীরে ডুবে যাচ্ছেন, আমার সেখানে চুপ করে থাকার কথা। কিন্তু নির্বোধের মতো সেইসময় কথা বলে আমি তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা দিলাম। তবুও আমি এরজন্য অনুতপ্ত নই। আমি নিশ্চিত জানি তিনি এই কথাটি আবার বলবেন এবং আমি না শুনলেও আর কেউ শুনবে এবং অপেক্ষা করার জন্য ফল আরও ভালো হবে। এই বিষয়ের ওপর স্বামীজীর শেষ কথা ছিল : ''ব্রহ্মচর্য প্রতি ধমনীতে ব্রহ্মতেজের মতো যেন জ্বলতে থাকে।''

গতরাতে বৃহস্পতিবারে, তিনি আমাদের সঙ্গে বসে শিখদের কথা ও তাঁদের দশটি গুরুর কাহিনী শোনাতে থাকেন। 'গ্রন্থসাহেব' থেকে গুরু নানকের একটি গল্প বলেন। গুরুনানক একবার মক্কা গিয়েছিলেন এবং কাবা মন্দিরের দিকে পা ছড়িয়ে শুয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ মসুলমানরা এসে তাঁকে জাগিয়ে তুলল। ওইভাবে ভগবান যেদিকে আছেন সেদিকে পা ছড়িয়ে শোয়ার জন্য তাঁর প্রাণ নিতে উদ্যত হল। জেগে উঠে শান্তভাবে তিনি শুধু বললেন, ''দেখিয়ে দাও, কোন দিকে ভগবান নেই তাহলে আমি সেই দিকেই পা ছড়িয়ে শুতে পারি।'' শান্ত উত্তরটুকুই যথেষ্ট ছিল। অনেকেই তখন শিখধর্ম গ্রহণ করল।

প্রিয় যুম, এখন তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি।

তোমার স্নেহের
মার্গট

পুনশ্চ—একটা আশ্চর্য কথা আমি সযত্নে অমূল্য ধনের মতো বুকের মধ্যে রেখেছি তোমাকে বলব বলে। একজন কেউ ওলিয়ার কাছে আমার সমালোচনা করেছে যে স্বামীজী কথা বলার সময় আমি নাকি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। কথাটা আমার কানে এসেছিল। স্বাভাবিকভাবেই পরের দিন স্বামীজী কথা বলার সময় আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। তখনই আমি কেন যে মিসেস জনসনের দৃষ্টি এড়াতে চেষ্টা করি তার গোপন তত্ত্ব বুঝতে পারলাম। স্বামীজীর মুখ ছাড়া অন্য প্রত্যেকটি মুখ যেন একটি নিরেট দেয়াল। বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ির সামনেটুকু দেখার মতো। কিন্তু তাঁর দিকে তাকাও, তোমার দৃষ্টি যেন খোলা দরজা দিয়ে অনন্তে প্রসারিত হবে। তার কারণ কি এই যে তিনি একেবারেই আত্মসচেতন নন?

॥ বাইশ ॥

বিজলি ম্যানব
শনিবাব, সকাল
৪ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় য়ুম,

তুমি হয়তো ভাবছ যে, চিঠি লেখার ব্যাপারটা আমি অবহেলা করছি। তা কিন্তু নয়। অন্তরের কথা অর্ধেক বলার চেয়ে বরং নীরব থাকাই ভালো এবং পুরোপুরি বলব বলে অপেক্ষা করছিলাম। মিসেস বুলের হয়ে মিসেস ক্রশবি-র সঙ্গে দেখা করতে এবং কাজটা যতটা পারি করে আসব বলে সোমবার নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম।

পঙ্গু মহিলার অতি অল্প সাহায্যেই আমি লেগেছি। ডঃ হেলমার তাঁর ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। মিস থার্সবির কাছে ছিলাম বলে মিস ফার্মার, হেবার নিউটন এবং একজন প্রকাশকের সঙ্গে দেখা হল। তুমি কল্পনা করতে পার—নিউইয়র্কে যাওয়াটা আমার কাছে কতখানি আনন্দের হয়েছে! মিসেস রোথলিসবার্জারের ঠিকানাটা আমার জানা ছিল না, সেইজন্য ওর কাছে যেতে পারিনি।

মিঃ লেগেট মিঃ চার্লস স্ক্রিবনারের কাছে আমার জন্য একটি চমৎকার পরিচয় পত্র দিয়েছেন। তিনি বারবার অনুরোধ করেছিলেন যে অন্য কোনও প্রকাশকের কাছে যাওয়ার আগে যেন আমি তাঁদের আমার পাণ্ডুলিপি দেখাই। তাই আমি খুবই আশা করছি, যে কাগজগুলোর জন্য আমি অপেক্ষা করছি সেগুলো তুমি ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছ। কারণ মিঃ লেগেট মঙ্গলবার শহরে ফিরছেন এবং পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে যেতে চান।

যদি তুমি তা না করে থাক, তাহলে, তুমি কি দ্বিতীয় খণ্ডের শেষের দিকে যে সতীর কাহিনী আছে সেটিও পাঠাবে? যেহেতু স্বামীজী ভারতীয় শিশুদের জন্য গল্প লিখছেন তাই ওঁর দরকার হতে পারে। ডাঃ হেবার নিউটন অত্যন্ত ভদ্র এবং মিস ফার্মার খুবই উৎসাহী।

তবু ফিরে এসে ভালো লাগছে, বিশেষত এই কারণে যে, স্বামীজী এখনও এখানে আছেন। মনে হয় ওলিয়া ও এস. সারা তাঁর সঙ্গ উপভোগ করছেন এবং এস. সারা শেষ পর্যন্ত তাঁর বাৎসল্যের সাধ মিটিয়ে নিচ্ছেন যা তিনি চেয়েছিলেন।

তোমার দাদা আগের চেয়ে ভালো আছেন জেনে ভালো লাগল। যত অল্প সময়ের জন্যই হোক, তিনি যেন তোমার সান্নিধ্য উপভোগ করার মতো শক্তি ও মনোবল ফিরে পান। তিনি যে তোমার কত বড়ো সম্পদ! সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করা এবং ভালোবাসার শক্তিতে পূর্ণ হওয়া, অবশেষে সেই ভালোবাসার যোগ্য একজন বড়ো ভাইকে পাওয়া—এ-যেন এক রূপকথার কাহিনী!

বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা স্বামীজী সিগার বা অন্যকিছুর খোঁজে নেমে এসেছিলেন। এসে দেখতে পেলেন মিসেস বুল ও আমি গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাই তিনিও সেখানে বসে পড়লেন। তাঁর মন যে ভারাক্রান্ত তা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। এই প্রথম তিনি বললেন নিজের সম্পর্কে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা—(জীবনের) দুটি বছর তাঁকে দলত্যাগ, অক্ষমতা, রোগভোগ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হবে—আর তা এখন যেন ঘনিয়ে আসছে। হেসে বললেন—তাঁর ধারণা শেষের মাসটিই হবে চরম দুর্যোগের। তিনি মিঃ স্টার্ডির কথা এবং ভারতে যে ঝামেলা শুরু হয়েছে সেই সম্বন্ধে বললেন। আরও বললেন—এখনও তিনি একজন সন্ন্যাসীই রয়েছেন—কোনও ক্ষতিকেই তিনি ক্ষতি বলে মনে করেন না—কিন্তু প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত পেলে তা মনে লাগে বৈকি! বিশ্বাসঘাতকতা মনে গভীর আঘাত আনে। এরপর সেন্ট সারা যখন আমার ঘরে এসে বসেছিলেন তখন ওঁর চোখে জল। ঘণ্টাখানেক ধরে এইসব কথাই বলছিলেন। তিনি প্রার্থনা করছেন—এই শেষ মাসটিতে যেন আমরা তাঁকে শান্তিতে ঘিরে রাখতে পারি। তুমি তো স্বয়ং একটি শুভ নক্ষত্র আর তুমি চলে গেলে পশ্চিমে (আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে) তাঁর জীবনে যে নবযুগ আসছে তা যথাসময় ঘোষণা করতে। যা হোক, প্রার্থনায় বোধহয় কাজ হয়েছে বা হচ্ছে। গত দুদিন ধরে তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, গত রাতে তিনি ভালো ঘুমিয়েছেন।

তিনি সেন্ট সারাকে কিছু বলেছিলেন। আবার আলোচনার সময় বললেন যে, কর্মক্ষেত্রে তিনি সুরক্ষিত ও নির্দেশ পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সবকিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগদম্বা তাঁর জীবনের এই কঠিনতম পরীক্ষাগুলোতে তাঁকে রক্ষা না করতেন তাহলে আমরা কি তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম না এবং স্বামীজীর সঙ্গে কি নরকগামী

হতাম না? এসময় মিনিটখানেকের জন্য মায়ের প্রতি আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল কিন্তু মজাও লেগেছিল। তাঁর প্রতি মায়ের ভালোবাসা কি আমাদের মতো দশহাজার জনের সমান নয়? যে নরকে স্বামীজীর সঙ্গে আমরা যেতাম, সে তো মায়েরই কোল হত! তবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত, আমি শুধুই শিবের পূজা করব, মায়ের দিকে তাকাব না। এটাই হবে আমার প্রতিবাদ। এটা ভাবতে কত আনন্দ হচ্ছে যে সুদূর লস এঞ্জেলসে বসে কেবল—'শান্তি! শান্তি! শান্তি!' উচ্চারণ করে তুমি তাঁর মনকে শান্ত করতে পার। ...শান্তি, অন্তর্দৃষ্টি, জয়!... এসবেরই ভেতর আমার শুভেচ্ছা রইল তাঁর জন্য। স্রোতের মুখ যে এত তাড়াতাড়ি ঘুরে গেল তা এক চমৎকার ব্যাপার নয় কি? দেখো, বুয়রদের সম্পর্কে তোমার অভিমত সত্য হয়ে উঠছে! যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিবরণ আমার কাছে ভয়াবহ। ভেবে অবাক লাগে একটা জাতির ভাগ্য কীভাবে মানুষের ব্যক্তিগত কর্মকে ছাপিয়ে যায় এবং জেনারেল হোয়াইট-এর মতো লোককে কেমন দুর্বিপাকে ফেলে। সাম্রাজ্য জয় করেছেন ভিক্টোরিয়া, ইংল্যান্ড নয়, একথা বলেন সেই হিন্দু (স্বামীজী)। সেরকম আজ বুয়র যুদ্ধের বেলাতেও, ফলাফল কী হবে আগেভাগে কেউ তা বলতে পারে না। অস্ত্রবল নয়, সৈন্যবল নয়, কোনও দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুও নয়—ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করবে ভাগ্যাকাশে নবোদিত তারকা। এমনকি, মহাশক্তিমান মানুষরাও মহাকালের অক্ষক্রীড়ায় ক্রীড়নকমাত্র—তারা তাই নয় কি? তাদের চালায় এক অদৃশ্য হাত! শুধুমাত্র কোনও দিব্য পুরুষই মাঝে মাঝে কারণটি এক ঝলক দেখতে পান। আর এ-খেলায় ধাক্কা খেয়ে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, একমাত্র সেই বোধ হয়, বোকা বনে না।

আজ সকালে প্রাতরাশে যেতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং স্বামীজী কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর কথা বলছিলেন। তারপর তিনি বললেন, কোনও কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া এবং উৎকৃষ্ট বলে সমর্থন করা—এই দুটির দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে সর্বদা রয়েছে। আমরা প্রায়ই প্রাধান্য দিয়ে থাকি প্রেয়কে, কিন্তু দেওয়া উচিত শ্রেয়কেই। সুতরাং, তিনিই জ্ঞানী, যিনি কিছু চান না কেবল সব-কিছুর সাক্ষী হয়ে থাকেন। জীবননাট্যে আপন ভূমিকা অভিনয় করে চলাই মানুষের কাছে সহজ মনে হয়—কিন্তু কিছু একটা তার অন্তরকে মোহিত করে রাখে, তখন সে অভিনয় করতে চায় না। সমগ্র জীবনটাই একটা নাটক হয়ে উঠুক—কিছু চেয়ো না। সর্বদা তোমার ভূমিকা অভিনয় করে চলো।

আজ সকালে তিনি উমা ও শিবের কাহিনী বলছিলেন। কী চমৎকার! তিনি যেমন বলেন—"সব পৌরাণিক কাহিনীই যেন এর কাছে ম্লান মনে হয়।"

আমি কি তোমাকে বলিনি যে, শিব 'গুরু হিসেবে নবীন—শিষ্য হিসেবে প্রবীণ'—কারণ ভারতবর্ষে তিনিই প্রকৃত গুরু যিনি তাঁর যৌবন অনায়াসে উৎসর্গ করেন—কিন্তু ধর্মশিক্ষার কাল হল বার্ধক্য। শিব—যিনি এ-জগতে একমাত্র রক্ষাকর্তা, তাঁকে আমাদের সকল কর্ম নিবেদন করার নির্দেশের কথা কি তোমাকে বলেছি? এক ব্রাহ্মণকে উমা বলেন—"শিব যদি বিশ্বনাথ হন তবে কেন তাঁর বাস শ্মশানে?" আমার ভাবতে ভালো লাগে যে, তুমি সর্বদা 'শিব-শিব' বলতে। পৌরাণিক কাহিনীর মর্মার্থ তুমি কতটা উপলব্ধি করতে পারবে সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবনে তা প্রত্যক্ষ করা যায় বলেই এখন এসবের অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে যেমন করেই হোক, 'শিব! শিব!' বলতে থাকলে তিনি তোমাদের সকলকে তাঁর করে নেন। 'নিশ্চিত নই' কথাটি আমাকে মিসেস কলস্টনের কথা মনে করিয়ে দিল। বেদান্তের কাজ তিনি ও অভেদানন্দ চমৎকারভাবে করে চলেছেন। তাঁকে (অভেদানন্দকে) সাহায্য করার লোক আছে। আমার এ-ও মনে হয় যে তিনি (মিসেস কলস্টন) একটু উদ্বিগ্ন রয়েছেন, তবে খুবই সাহসী।

আমার প্রিয় য়ুম, এখন আমার থামা উচিত। ভয় পাচ্ছি, দেরি করে ফেলেছি বলে। কিছু মনে করো না—এই চিঠিতে স্বার্থগন্ধ যদি পাও সেটাকে সত্য বলে ভেবো না। ভালোটুকুই নিয়ো। আমি জানি, আমার কিছু নতুন কথা লেখা উচিত।

তোমারই

৪টা ১০ মিনিট

ওপরের কথাটি যখন লিখেছি—সেন্ট সারা তখনই তোমার চিঠিখানি আমাকে এনে দিলেন। দুপুরবেলা খাওয়ার সময় আমি হেসে বললাম—"য়ুম বলে, সে কিছুই চায় না এবং কাউকে চায় না।" স্বামীজী মুখ তুলে তাকালেন এবং একটু থেমে বললেন, "না, সে কিছুই চায় না। তা ঠিক। সাধনপথের শেষ ধাপে এসে এমন হয়—তারপর শুধু দিয়ে যাওয়া। ভিখারিকে ভিক্ষা

চাইতে হয় এবং সেইসঙ্গে সে পায় প্রত্যাখ্যান। কিন্তু যে কিছুই চায় না, তাকে প্রত্যাখ্যানও পেতে হয় না।"

প্রিয় য়ুম, তুমি ঠিক তাই। কিন্তু য়ুম, আমাকে একটু বলো আমরা কীভাবে আরও দিতে পারি? তোমার মতো যদি হয়ে উঠতে পারতাম! আমি তোমাকে একজন সন্ত বানাতে চাইছি না। তুমি সেটা কতখানি অপছন্দ করবে, তা আমি ভালো করেই জানি। তবু তোমাকে অনেকটা তা-ই বলে মনে হয়। প্রজাপতির পেছনে ধাওয়া করার সোনালী মুহূর্তগুলিতে (অনায়াসে) যে ভাব তুমি আয়ত্ত করেছ তা যদি চোখের জল ফেলে এবং কষ্ট করেও শিখতাম তাহলে আমিও তোমার মত উজাড় করে দিতে পারতাম। প্রিয় য়ুম, মনে রেখো যে তুমি একটি শুভ নক্ষত্র এবং তাঁকে (স্বামীজীকে) শক্তি জোগাও। দুপুরে খাওয়ার পর থেকে এমন একটা হাহাকার তাঁর কণ্ঠে শুনেছি যে একান্তে কাঁদব ভেবে ছুটে নিজের ঘরে চলে এলাম। তখন তিনি আমার পিছু পিছু এলেন। দরজায় এক মিনিটের জন্য দাঁড়ালেন। তখন তাঁর তীব্র মানসিক যন্ত্রণা আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। হে স্বামীজী! স্বামীজী! তিনি মায়ের কাছে কত অল্প চেয়েছেন! শুধু দু-তিন জন যাদের তিনি ভালোবাসতেন তারা যেন আনন্দে থাকে, ভালো থাকে, পবিত্র থাকে—তাই তো চেয়েছেন... আমি জানি তাঁর প্রয়োজনের সময় তুমি শক্তি জোগাও। তাই আমি তোমাকে সব বলছি, যদিও এইসময় তোমাকেই সান্ত্বনা ও সাহস জোগানো হয়তো প্রয়োজন। তাঁকে চিঠি লিখো এবং সাহস দিয়ো—সাহস এবং শান্তি। একমাসের মধ্যেই হয়তো সব দুঃখের অবসান হতে পারে। তোমাকে প্রণাম।

তোমার আদরের সন্তান
মার্গট

আগের মতো আবার তিনি জগৎ থেকে পালানোর কথা বলছিলেন—কথাটা আমার তোমাকে বলা উচিত ছিল কিন্তু বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সারা জীবনই তো তিনি যশ ও ধনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন কিন্তু এখন তিনি তার প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করতে শুরু করেছেন। তাঁর কাছে তা অসহ্য হয়ে উঠছে। "আমি এখন কোথায় আছি!" এই বলে তিনি হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন। মুখে তাঁর সব হারানোর এক ভয়াবহ ছাপ। আর তারপর তিনি কিছু আবৃত্তি করতে শুরু করলেন—"হে রামকৃষ্ণ, (একটু

থেমে) তোমার শরণ নিচ্ছি। কারণ তোমার শ্রীচরণই মানুষের একমাত্র পরম আশ্রয়।" এমন এক মুহূর্ত! সেখানে তোমার উপস্থিতি যে কত চাইছিলাম! "যেভাবে হোক এ-দেহ যাচ্ছে। কঠিন তপস্যার দ্বারা এ-দেহ যাবে। উপবাসী থেকে আমি দশ হাজারবার 'ওঁ' মন্ত্র জপ করব। গঙ্গাতীরে—হিমালয়ে একা 'হর হর' বলব। 'আমি মুক্ত মুক্ত'—বলব। আর একবার আমার নাম পালটাব। এবার কেউ জানতে পারবে না। আমি আবার একবার সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করব। আমি কখনওই আর কারও কাছে ফিরে আসব না এবং এর জন্যই সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করব।"

আর তখন আবার সেই সব হারানোর দৃষ্টি, আর সেই যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা যে তিনি তাঁর ধ্যানের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। "তোমাদের—এই ম্লেচ্ছদের জন্য আমি সব হারিয়েছি—সব গিয়েছে!" বলে একটু মৃদু হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

প্রিয় য়ুম, আমরা কাউকে সাহায্য করতে পারি না, দুটো পরমাণুর মধ্যে ফাঁক থাকে এবং একটি অপরটিকে কখনওই স্পর্শ করতে পারে না। এইসব ভয়ংকর দুরূহ নিয়মগুলোকে লঙ্ঘন বা জয় করার কি কোনও পথ নেই? আমরা কি এসব কিছু উপশম করার একটা পথ তাঁর জন্য কোনওরকমে খুঁজে বার করতে পারি না? কোনও পথই কি নেই? একেবারেই কি কোনও পথ নেই?

'তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী'

স্বামীজীর আহ্বানে নিবেদিতা এসেছিলেন ভারতবর্ষে। সর্বস্ব সমর্পণ করে শ্রীগুরুর দায় বহন করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সেই পরম আরাধ্য গুরুর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে নিবেদিতার অন্তরের বেদনা জানতে পারি তাঁরই লেখা কয়েকটি পত্রে। কত শান্ত ও সংযত সে প্রকাশভঙ্গি! সেই গভীর শোক পরিমাপ করার সাধ্য কার আছে? মহাসমাধির পর চারজনকে পাঁচটি পত্র লেখেন, তাতে বিশেষ ঘটনাটির আনুপূর্বিক বিবরণ আমরা পাই।

মহাসমাধির তিনদিন পরেই নিবেদিতা স্বামীজীর স্নেহধন্যা অন্যতম মার্কিন শিষ্যা কৃস্টিনকে চিঠি লেখেন। কৃস্টিন ১৯০২ সালে স্বামীজীর কাজে জীবন উৎসর্গ করতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সেই সময় কৃস্টিন কলকাতায় ছিলেন না, ছিলেন মায়াবতীতে।

ম্যাকলাউডকে লেখা নির্বাচিত পত্র দুটি স্বামীজীর মহাসমাধির এক মাসের বেশি পরে লেখা। যখন তিনি ওই দিনগুলির বিশদ বিবরণ লেখার অবস্থায় আসতে পেরেছিলেন।

স্বামীজীর প্রিয়জন নেল ও এরিক হ্যামন্ডকেও নিবেদিতা জানিয়েছেন সেই খবর। স্বামীজীর প্রিয় মেরী হেলকেও লিখতে ভোলেননি। মিস মূলার ও মিঃ স্টার্ডিকেও তিনি চিঠি লিখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এঁরা স্বামীজীর স্নেহভাজন ছিলেন—কয়েকজনের সঙ্গে যদিও সাময়িকভাবে সম্পর্কে চিড় ধরেছিল—কিন্তু নিবেদিতা জানতেন তাঁরা কত আপনার ছিলেন স্বামীজীর। সেজন্য তিনি যেন ওই সংবাদ জানানোর দায়বদ্ধতা অনুভব করেছিলেন।

'তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী'

॥ তেইশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার,কলকাতা
সোমবার, ৭ জুলাই ১৯০২

প্রিয় কৃস্টিন,

আগামী কাল যে সংবাদটি তুমি পাবে, তাতে তোমার জীবন শূন্য বোধ হবে। আমি শুধু তোমাকে এইটুকু বলতে পারি—সেই শনিবার (৫ জুলাই) আমি যতক্ষণ তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলাম, ততক্ষণ তুমিও সেখানে অনুপস্থিত ছিলে না। আমার মনে হয় আমি নিশ্চয় সকাল সাতটার মধ্যে মঠে পৌঁছেছিলাম এবং দুপুর একটা পর্যন্ত তাঁর পাশে বসে পাখার বাতাস করার অনুমতি পেয়েছিলাম। তারপর তাঁকে দাহ করার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা ছটায় তাঁর দেহাবশেষ ঠাকুরঘরে পাঠানো হয়।

শুক্রবার রাতে (৪ জুলাই) মৃত্যু তাঁর কাছে বড়ো সুন্দরভাবে এসেছিল। ধ্যানের পর আধঘণ্টা নিদ্রা এবং তারপরই মহাপ্রস্থান। সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টা দেড়েক তিনি মন্দিরে ছিলেন এবং পরে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন।

সেদিন সকালে তিন ঘণ্টা মন্দিরে ধ্যান করেন। গত রবিবার (২৯ জুন) আমাকে বলেছিলেন তিনি একটা গভীর তপস্যার ভাবে মগ্ন হচ্ছেন—তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন মৃত্যুর জন্য। আমি যদি তখন সেখানে না যেতাম তাহলে সেই দুপুরবেলাও তিনি ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।

এখন মনে হচ্ছে বিগত দশ দিন এমনভাবেই কেটেছে যেন তিনি মৃত্যুর সমীপবর্তী হচ্ছেন—মৃত্যুর আবরণ যেন তাঁকে ক্রমে আবৃত করছে।

অনেকে বলছেন শেষের সেই দিনটিতে সকলের সঙ্গে তিনি কত মধুর ব্যবহার করেছিলেন। দীর্ঘ সময় কথা বলেছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গে। মঠের ছেলেদের বেদ (প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণ) পড়িয়েছিলেন তিন ঘণ্টা ধরে আর সেইদিনই বহু গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলেন—যেমন, ''আমাকে অনুকরণ করো না, যারা অনুকরণ করে তাদের বার করে দেবে'' ইত্যাদি।

সেইদিন (৪ জুলাই) বিকেলে প্রায় সাড়ে চারটের সময় একজন মঠ থেকে বলরাম মন্দিরে আসেন তাঁর সংবাদ নিয়ে। তিনি বলেন, (স্বামীজী) সেদিন এত সুস্থবোধ করছেন অনেকদিন যা করেননি। ঠিক সেইসময় তিনি পদব্রজে

দু-মাইল বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন। ফিরে এসেই শেষবারের মতো ধ্যানমগ্ন হন। গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে আমার তিনবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) রাত্রে আমরা দেরিতে কলকাতা এসে পৌঁছাই। শনিবার (২৮ জুন) সকালে যখন তাঁর কাছে যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছি (এমন সময়) একটি চিরকুট পেয়ে আর গেলাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী স্কুলবাড়িতে এসে পৌঁছালেন এবং সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখলেন। রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি।

গত বুধবার (২ জুলাই) সকালে দু-তিন ঘণ্টা ছিলাম। আবার গতকাল (৬ জুলাই) ওঁর কাছে যাওয়ার কথা ছিল।

যখন শনিবার (২৮ জুন) তিনি স্কুলে এসেছিলেন তোমার পাঠানো ছোটো বাক্সটি তাঁকে দিয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত, সরল তোমার বার্তাটি পেয়ে তিনি অভিভূত হন। সেটি পড়ার জন্য আমার হাতে দিলেন। আর বাক্সটা নিয়ে যেন খেলা করতে লাগলেন। পরবর্তী মর্মান্তিক শনিবার (৫ জুলাই) সেই বাক্সটি বেলুড় মঠে তাঁর লেখার টেবিলের ওপর দেখতে পেলাম। তোমাকে বলার মতো কোনও কথাই খুঁজে পাচ্ছি না। যিনি এত কোমল, মধুর ও আনন্দময় তাঁর স্নায়ুগুলি কিন্তু শ্রান্তির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছিল। ফলে কেউই কোনও নতুন বিষয়ে আলাপ করার সাহস করত না। ইদানীং প্রায়ই তাঁকে ইউরোপীয় মহিলাদের সুতীব্র সমালোচনা করতে দেখা যেত। সেই সমালোচনার লক্ষ্য ছিল বিশেষভাবে তাঁর এই কন্যাটি। তাঁর কাছে মিসেস সেভিয়ার ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি সেইভাবেই তাঁর উল্লেখ করতেন। তুমি তাঁকে (মিসেস সেভিয়ারকে) এই কথাটি বলো।

আমার মনে হয় স্বামীজীর গুরুদেব তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন, আবার পর মুহূর্তে আমাদের কাছে ফিরিয়েও দিয়েছেন আমাদেরই প্রিয় স্বামীজীরূপে। তাঁর দিব্য আত্মা জীর্ণদেহ ত্যাগ করে চলে গেছে চিরদিনের মতো। তবু সেই মহান হৃদয় ও বজ্রসম সংকল্প অনাদিকাল অপরিবর্তিত থাকবে।

আমি অনুভব করেছিলাম এখন আমাকে সেই মহাসমাধির কথাই ভাবতে হবে যার মধ্যে তিনি লীন হয়েছেন। একথাও ভেবেছিলাম যে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের বিষয়ে একজন কতটুকু বলতে পারে—কোথায় সে ইতি করতে পারে বা কোথায় পারে না! সুতরাং যতক্ষণ না আমি চিতায় শায়িত

হই ততক্ষণ অনুভব করব যে, এখনও তিনি আমাদের প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করছেন।

দুবছর আগে যখন ব্রিটানিতে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, তখন যে শূন্যতা আমাকে গ্রাস করেছিল সেটা আমি এখন তাঁর মৃত্যুর পর সেইভাবে অনুভব করছি না। তার কারণটা মনে হচ্ছে তাঁর প্রতি সেই ভালোবাসা পরিণত হয়েছে তাঁরই কাজের জন্য দিব্য শক্তিময় প্রেরণায়। কারও কাছে সেটি ভাবাবেগরূপে মধুর হতে পারে, তিনি কিন্তু খুশি হতেন তাকে শক্তির প্রকাশরূপে দেখতে। প্রিয় কৃস্টিন, তোমার জীবন যেন নিঃসঙ্গ ম্যাডোনার মতো—শনিবার (৫ জুলাই) তোমার কথা মনে হতেই রসেটির সেই কবিতাটি সারাক্ষণ আবৃত্তি করেছি। তুমি যেখানেই থাক, আমি জানি তোমার ভাগ্য এমনটিই হবে।

এসো, আমরা সকলে একটিমাত্র আত্মাতেই পরিণত হই—তুমি আমাদের সকলের জন্য শক্তি অর্জন করো। আমি চাইছি প্রতিমুহূর্তে তাঁরই সংকল্পের রূপায়ণ ঘটুক। যদি তিনি এখানে থাকতেন তাহলে যেমনভাবে তাঁর ইচ্ছাগুলিকে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে কাজে পরিণত করতে চাইতেন, আমি ঠিক সেইভাবে করতে চাই। মুক্তি চাই না, কর্ম চাই না, আর কিছুই চাই না। আমি এইজন্যই চার বছর আগে ভারতবর্ষে এসেছিলাম যাতে তিনি ভারমুক্ত হয়ে মৃত্যুববণ করতে পারেন—শুধু তারই জন্য—আর সেই মুহূর্তটি এখন এসেছে।

হায় স্বামীজী! আমাদের মধ্যে আপনি আর নেই! তবু একথা সত্য নয়—একটি কথা শুধু আমি উচ্চারণ করতে পারি—তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁর জীবনসংগ্রাম শেষ হয়েছে বিপুল জয়ের মধ্য দিয়ে।

সকলে বলে স্বামীজী শেষ দিনেও জাপানের জন্য কিছু করার আশা পোষণ করেছিলেন। তাঁরা আরও বলেন তাঁর মতো আত্মা একটা বাসনা নিয়ে দেহত্যাগ করেন, তা না হলে নির্বাণ লাভ করে আর ফিরবেন না।

শেষ সময় তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল সমাধির সকল লক্ষণ—রোমাঞ্চ হচ্ছিল, নিঃশ্বাস পড়ছিল না কিন্তু নাড়ী স্পন্দিত হচ্ছিল ইত্যাদি। তাঁরা বলেন—এঁদের মতো মানুষের জীবন শেষ হয় এক মহাপ্রশান্তিতে। মহাত্মারা যখন সংসার থেকে বিদায় নেন তখন দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। আমি জানি, তুমি শুনে খুশি হবে যে, গত রবিবার আমাদের মধ্যে সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান

হয়েছিল, এমনকি ওকাকুরা সম্বন্ধেও তিনি মধুর এবং স্নেহপূর্ণ কথা বলেছিলেন। আমি তাঁকে (ওকাকুরা) সোমবার দেখেছিলাম—তখন (স্বামীজীর) সে কথাগুলি তাঁকে বলিনি। কারণ তাহলে স্বামীজীর সমাধির জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা তার স্বপক্ষে একটা কৈফিয়তস্বরূপ মনে হত। আর তিনি ছিলেন এর অনেক উর্ধ্বে কিন্তু এখন তো জেনেছি সেটাই সব, আর আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ।

বুধবার (২ জুলাই) পুরো তিন ঘণ্টা তিনি আমার প্রতি আদরিণী কন্যার মতো স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। আমার ভয় ছিল যে তোমার কাছে তাঁর চিঠি লেখার পরে আমার যাওয়াটা তাঁর অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। কিন্তু পৌঁছানো মাত্র আমার জন্য একটা শুভ সংবাদ অপেক্ষা করছিল। যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমার আসাতে স্বামীজী কি খুশি হয়েছেন?" স্বামী সারদানন্দ জোরের সঙ্গে বললেন, "নিশ্চয়ই।" আমি এর জন্য প্রিয় সদানন্দের কাছে ঋণী। ওঃ—এই সময় যে এখানে থাকতে পেরেছি, তাতে আমি কতই না আনন্দিত! তবে একা আমি এই সুযোগ পেয়েছি বলে দুঃখিত—যদিও দুঃখটা অকারণ—তুমি একান্তভাবেই জান যে তিনি তোমার কতখানি আপনার জন ছিলেন।

বেশ কিছুদিন পর মঠ থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তিনি এবং সারদানন্দ ছিলেন স্বামীজীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। আর এই দুইজনই শেষের সেই দিন কলকাতায় গিয়েছিলেন দিন দুয়েকের জন্য।

মনে হয় বিকেলে ভ্রমণের পর সন্ধ্যাবেলা ধ্যানের জন্য স্বামীজী নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। প্রায় আটটার সময় তিনি শুয়ে পড়েন এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি নয়টার সময় তিনি চমকে ওঠেন ও দুটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। তাঁর সেবায় রত ব্রহ্মচারীটির মনে হল এটা স্বাভাবিক নয়। সে একজন বয়স্ক সাধুকে ডেকে আনল—যিনি তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করে বুঝলেন, নাড়ী স্তব্ধ। তাঁরা ভাবলেন এটা সমাধি হতে পারে। কিন্তু যখন দেখলেন যে জীবনের কোনও চিহ্নই নেই তখন ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন।

(এর পরবর্তী পাতাগুলি পাওয়া যায়নি।)

॥ চব্বিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই, ১৯০২

প্রিয় মেরি,

দীর্ঘ দুবছর পর তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি—যে দুঃসংবাদটি তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে সে সম্পর্কে তোমাদের সবাইকে আরও কিছু জানাব বলে। তুমি তো শুনেছ, গত ৪ জুলাই শুক্রবার রাত ন-টায় স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। তুমি বোধহয় জানতে পেরেছ সারা শীতকালটাই তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন আর ইজিপ্ট থেকে ভারতে ফেরার পর তা শুরু হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। যদিও প্রবীণ সাধুরা কেউ তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন না, তবে মনে হচ্ছিল আগামী শরৎকালে তাঁর পক্ষে জাপান যাওয়া ও কাজকর্ম করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

শুক্রবার সারাদিনই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। প্রায় তিনঘণ্টার ওপর ধ্যান করেছেন ও সারাদিন ধরে কারও না কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন ও ছেলেদের পড়িয়েছেন। ঠিক সাড়ে চারটের সময় তাঁর কাছ থেকে কলকাতায় খবর এল যে অনেকদিন তিনি এরকম সুস্থবোধ করেননি। সেইসময় তিনি বাইরে বেরিয়ে দু মাইলের মতো হাঁটলেন যা তাঁর পক্ষে একটু বেশিই ছিল। তারপর তিনি নিজের ঘরে এসে সবাইকে বাইরে যেতে বললেন ও ধ্যানে বসলেন। ঘণ্টাখানেক পর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন ও একটি ছেলেকে হাওয়া করার জন্য ডাকলেন। আধ ঘণ্টা পর হাতটা একটু কেঁপে উঠল আর যেন স্বপ্নে কেঁদে উঠলেন। তাঁর অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস দেখে ছেলেটি সবাইকে ডাকল। তাঁরা যখন এসে পৌঁছালেন তার আগেই সব শেষ। মনে হল তিনি গভীর সমাধি-মগ্ন। খুব সুন্দরভাবে সবকিছু ছেড়ে তিনি বিদায় নিলেন। শক্তি ও শান্তির পরমলগ্নে স্বেচ্ছায় ও নীরবে তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন।

বলতে গেলে দুঃখের লেশমাত্র আমার নেই—কেবল বোধ হচ্ছে এটি যেন বিপুল এক জয়—কত পবিত্র, কত নিষ্কলুষ। আজ স্বামীজী আমাদের সব থেকে আপনার, যা আগে কখনও অনুভব করিনি। শুধু উনি রোগ-জীর্ণ দেহটি

থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। আমরা সবে মাত্র বুঝতে শুরু করেছি মহৎ ও অসীম ইচ্ছা-শক্তির মাধুর্য কী। তুমি তাঁকে কত ভালোবাসতে তা জানি বলে বেশি কিছু বলতে আমার ভয় হয়, কোনও কথায় পাছে তোমায় আঘাত দিয়ে ফেলি। আমার আন্তরিক ভালোবাসা জেনো। যদি কিছু জানতে চাও তা আমি বলতে ও লিখতে প্রস্তুত। তোমার মা মিসেস হেলকেও জানিয়ো আমার ঐকান্তিক ভালোবাসা।

ইতি
তোমাদের সকলের চির ভালোবাসার
মার্গট

॥ পঁচিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজাব, কলকাতা
৭ আগস্ট, ১৯০২
বৃহস্পতিবার (সকাল)

আমার প্রিয় য়ুম,

চিঠি লেখা অসম্ভব মনে হচ্ছে—এমনকি তোমাকেও। তোমার পরিকল্পনা মতো কাজ হয়ে থাকলে তুমি নিশ্চয়ই গত শনিবার ইংল্যান্ড ছেড়েছ। আমার বিশ্বাস তুমি এতদিনে অনেকটা সামলে উঠেছ। তোমার চিঠিখানি আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ... তুমি যে-প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছ তার অধিকাংশের উত্তর আগের অন্যান্য চিঠিতে দিয়েছি—তবুও, হয়তো সবটুকু বলা হয়নি।

১. তিনি যেভাবে চলে গেছেন সেভাবে যাওয়াটাকে সর্বোত্তম মনে করা হয়—ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীর মৃত্যু। সমস্ত দেশ উদ্দীপ্ত। সেদিন ছিল মা কালীর প্রিয় অন্ধকার রাত্রি (অমাবস্যা) যার অর্থ প্রবল ইচ্ছা ব্যতীত তিনি পুনরায় দেহধারণ করবেন না। কারণ তিনি ছিলেন এর বহু ঊর্ধ্বে। দেহে থেকেও তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল দেহাতীত সত্তায়।

২. আমার মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই জানতেন (তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা) —ঠিক কোন মুহূর্তে, ক-টার সময় বা কবে সেটি ঘটবে তা না জানলেও। কিন্তু গত বুধবার সকালে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি আর তাঁকে

কখনও দেখব না। মনে করে দেখো স্বামীজীর উক্তি : ''যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'' যখন আমি তাঁকে বললাম—তাঁকে ও গড ফাদারকে (মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত) স্কুলবাড়িতে নিয়ে যেতে হলে বাড়িটি যেভাবে পরিষ্কার করা প্রয়োজন—তা ৮/১০ দিনের আগে সম্ভব নয়, তার উত্তরে তিনি একটি কথাও বললেন না শুধু তাঁর মুখে খেলে গেল এক ম্লান হাসি।

৩. তিনি সবকিছুই ঠিক করে রেখে গিয়েছেন। গত রবিবার আমাকে বলেন তিন বছর ধরে যে পারিবারিক মামলা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল, প্রতিপক্ষ স্বেচ্ছায় তাঁর অনুকূলে আপোসে মিটমাট করে নিয়েছে—অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। ঠিক এইরকমই ঘটেছে প্রতিটি ব্যাপারে। আমি যে আজ এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছি—এ-ও তাঁরই জন্য। তিনি বাড়িটিকে, কাজকে ও আমাকে আশীর্বাদে ধন্য করেছেন—সবকিছুর ওপরেই তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। কোনও কর্মই অসম্পূর্ণ ছিল না, বলা যায় কোনও কাজটাই বাকি ছিল না। তাঁর তিনটি ইচ্ছা ছিল—যেদিন তিনি চলে যান সেদিন বলেছিলেন, ''জাপানের জন্য আমি কিছু করতে চাই।'' তিনি মহানিশায় মায়ের (কালীর) পূজা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই ইচ্ছাটি গত শনিবার (২ আগস্ট) তাঁরা (মঠের সকলে) পূর্ণ করেছেন। আর তিনি চেয়েছিলেন মিঃ দত্তের সঙ্গে মিলিত হতে—নিশ্চয় বিরাট বিশ্বের কোথাও তিনি তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হবেন।

এবার আমি তোমার জন্য অন্তিম সপ্তাহের দিনলিপি লিখছি। প্রথমে বলে নিতে চাই—'Caste' প্রবন্ধের জন্য পুরস্কারটি যখন এল, সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেটি স্বামীজীকে পাঠিয়েছিলাম একটি ছোট্টো চিঠি দিয়ে—আজ এই কথা ভেবে আমার আনন্দের সীমা নেই। আমার মনে হয় সেটি তাঁকে বোঝাতে পেরেছিল যে আমি তাঁর কাছে চিরদিনের সেই 'ছোট্টো মার্গট'ই আছি। কারণ সেই রবিবারেই তিনি আমাকে সম্বোধন করেন, 'আমাদের ছোট্টো মার্গট' বলে।

২৬ জুন

বৃহস্পতিবার বেশি রাতে কলকাতায় এসে পৌঁছাই। স্বামী সারদানন্দ আমাদের নিয়ে আসেন। মঠের উপহারস্বরূপ আমাকে একটা ছোট্টো মাদুর ও স্বামীজীর দেওয়া হরিণের চামড়ার আসন দিলেন—যা ধ্যানের সময় ব্যবহৃত হয়। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''তাহলে কি আমি এসেছি বলে তিনি খুশি হয়েছেন?'' সারদানন্দ বললেন, ''অবশ্যই হয়েছেন।''

২৮ জুন

শনিবার সকাল। আমি যখন বেলুড় মঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি ঠিক তখনই চিরকুট এল স্বামীজী কলকাতায় আসছেন। তিনি এলেন সকাল ন-টায়। সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখলেন। তাঁর কাছে সবকিছু বুঝিয়ে বলায় তিনিও খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন। স্বামীজী তাঁর জন্য রাখা নির্দিষ্ট কম্বলে বসলেন—আমি লক্ষ্ণৌ থেকে কতকগুলি পুতুল এনেছিলাম সেগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মাইক্রোস্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন ও ক্যামেরা দেখে খুবই আনন্দিত হলেন ও মাইক্রোস্কোপটিকে পরের দিন তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি কাজের কী পরিকল্পনা করেছি। আমি বললাম, স্কুলের চেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজে (University Settlement Work) আগ্রহ বেশি। তিনি বললেন—ঠিক! তাঁর যাওয়ার সময় আমি বললাম—আপনাকে আবার আসতে হবে ও কাজটিকে আশীর্বাদ করতে হবে। তিনি বললেন, "আমি সর্বদাই তোমাকে আশীর্বাদ করছি।" স্বামীজী চলে যাওয়ার পর দরজাটি বন্ধ করে বেটকে বললাম, "দেখো বেট, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতো মধুর ব্যবহার।"

২৯ জুন

রবিবার সকাল সকাল চলে গেলাম। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে মঠে পৌঁছালাম—পাঁচটা পর্যন্ত থাকলাম। তিনি অনেক কথা বললেন। বিশেষ করে নিগুর (মিঃ ওকাকুরার) সম্বন্ধে বললেন, তিনি ছেলেটিকে ভালোবাসেন। এত মহানুভবতা ও সততা আর কখনও দেখেননি। এটা তো সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ। দুপুরে তিনি আমার ওপর খুবই বিরক্ত হন—হয়তো ক্লান্ত হয়েছিলেন বলে। আমি অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলাম। তারপরেই এল তাঁর কাছ থেকে অপরূপ আশীর্বাদ—আমার মাথাটি ধরে দুবার হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি শুধু এইটুকু আর্তি জানালাম—আমার কোনও কাজে যদি সন্দেহ আসে বা অনুমোদন না করেন তবে সেকথা যেন আমাকে জানিয়ে দেন কিন্তু কখনও যেন আমার প্রতি উদাসীন না হন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করবেন।

আমি তোমায় আগে নিশ্চয়ই জানিয়েছি যে, সেদিন স্বামীজী বলেছিলেন তাঁকে একটি গভীর তপস্যার ভাব আচ্ছন্ন করছে। আমি যদি না যেতাম তাহলে সেইসময়ও তিনি ঠাকুরঘরেই থাকতেন। তিনি অনুভব করছেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তাঁর এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকি ডেকে উঠল।

মনে পড়ছে কি সেই প্রবাদটির কথা—যার মানে, কোনও কথা বলার সময় টিকটিকি ডাকলে কথাটি সত্য হয়। তবু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তিন-চার বছরের আগে সে ঘটনা ঘটবে। সেইসময় তিনি পাঁউরুটি তৈরি করার পদ্ধতি নিয়ে অতিমাত্রায় উদ্‌গ্রীব। আমি মাইক্রোস্কোপটি ফিরিয়ে আনলাম।

২ জুলাই

বুধবার সকাল। আমি আবার বেলুড় মঠে গেলাম, যদিও বেট অসুস্থ ছিল। তার বিবরণ তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছি।

৩ জুলাই

বৃহস্পতিবার। স্বামী সারদানন্দ আমাকে দিলেন একটা আস্ত ব্রাউন পাঁউরুটি যা স্বামীজী আমার জন্য পাঠিয়েছেন—আমি তার শেষ কণাটুকুও খেয়েছি, শুক্রবার সন্ধ্যায় শেষ হল।

৪ জুলাই

শুক্রবার বিকেল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টা নাগাদ আমি ছাদে না গিয়ে থাকতে পারলাম না—একলা থাকতে চেয়েছিলাম। এক ঘণ্টার জন্য অসুস্থ বেটকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। ছাদের ওপর বিশেষ একটি কোণে আমি সাধারণত ধ্যান করতে বসতাম। সেখান থেকে আমাকে কেউ দেখতে পেত না। আমার ধ্যানে বসতে ইচ্ছা হল; বিচিত্র এক মাধুর্য আমাকে যেন অপ্রতিরোধ্যভাবে আকর্ষণ করছিল।

আমার মনপ্রাণ শিবগুরুর দিকে ধাবিত হল, যদিও অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করব বলে বসেছিলাম। আমি আজ বুঝতে পারছি তাঁর শেষ ধ্যান ও সমাধি—মহাপ্রস্থানের পূর্বে আমাদের জন্য এক অনির্বাণ আশীর্বাদ যা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। সেইসময় তিনি আমাদেরও ধ্যানে মগ্ন হতে আহ্বান করেছিলেন। শেষকালে তাঁর চারদিকের সবকিছুই ছিল ধ্যানের ভাবে পরিপূর্ণ। তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে বসেছিলেন। তারপর শেষ ক্ষণটি ঘনিয়ে এল। জীর্ণ বস্ত্রের মতো দেহটি ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন— সেখানে কোনও সংগ্রাম ছিল না—'তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী'। স্বামীজী আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাননি। অন্তত আমার কাছে সেদিন থেকে তিনি অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত যেমনটি দু-বছর আগে পর্যন্ত ছিলেন না। আর আমি বিশ্বাস করতে চাইছি, প্রার্থনা করছি যেন তাঁর এই প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের কোনও বিচ্ছেদ না ঘটে। ওঃ য়ুম, আমার একটিমাত্র ইচ্ছা আছে। আমি এমনভাবে কাজ করতে চাই যাতে

স্বামীজীকে যদি আর একবার এই মানবিক অজ্ঞতার সংগ্রামপূর্ণ জীবনের মধ্যে ফিরে আসতে হয়, তাহলেও তাঁকে যেন বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ও দুর্ভোগ ভুগতে না হয়। আমি জানি না—আমি শুধু অন্তরে এক প্রচণ্ড শক্তির অস্তিত্ব অনুভব কবছি। কিন্তু আমি কিছুই করছি না। তুমি আশীর্বাদ করো স্বামীজী যেন আমাদের সকলের ওপর প্রসন্ন থাকেন, এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে তাঁর আবির্ভাবের সার্থকতা বোঝানো যায়।

(এরপর কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি।)

* * *

একটা কথা আছে, মহাপুরুষেরা প্রথম সংগঠিত করেন অনুগামীর দল, তারপর তাদের ছেড়ে চলে যান। নতুবা তাদের সঙ্গে থেকে গেলে কর্মীদের শক্তির বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রিয় য়ুম, তোমার কথা বলি। আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি এই কথা চিন্তা করে শান্তি পাবে, যে কাজের জন্য তোমার জন্ম, সেটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের মধ্যে তুমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবে আমাদের আশীর্বাদ করতে ও কাজের সুফল ভোগ করতে। তা যদি না হয়, যদি তুমি তাঁর কাছে চলে যাও তাহলে তোমাকেও যেন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকি। তুমি শুধু তাঁকে বোলো তাঁর আশীর্বাদ এখনও একান্ত প্রয়োজন—বোলো তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছি।

* * *

ও প্রিয় য়ুম—ভবিষ্যতে আমি কীভাবে কাজ করব—এ-বিষয়ে তোমার ইচ্ছা কী, তুমি আমাকে অকপটে লিখে জানিয়ো। কারণ তোমার 'ইচ্ছা' স্বামীজীর ইচ্ছার মতোই আমার কাছে পবিত্র। আমার কাছে দুটির সমান মূল্য। চিরকালের মতো তোমার এবং স্বামীজীর

স্নেহের সন্তান
মার্গট

পুনশ্চ—তুমি যদি চাও এখনই স্বামীজীর জীবনী আরম্ভ করি, তাহলে যত ডায়েবি আছে সমস্ত কপি করে পাঠাবে কী? আমার মনে হয় এতে খুব বেশি খরচ পড়বে না এবং একাধিক কপি করানোই ভালো।

যে ডায়েরিটি আমি সব থেকে পছন্দ করি সেটি হল স্বামীজীর সঙ্গে আমার সমুদ্রযাত্রা। হয়তো এখন থেকে তুমিও একটি ডায়েরি রাখবে এবং তাতে তাঁর যে-

সব উক্তি তোমার মনে পড়বে অথবা যা তুমি শুনেছ লিখে রাখবে। ওঁর বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমি মনে করি না যে এখন তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করলে কারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হবে।

সেই শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ধ্যানের কথাটি কেবল সদানন্দকে বলেছিলাম। তোমাকে বলছি কারণ তোমার পত্রগুলি তাঁর সেই শেষ আশীর্বাদ প্রার্থনা করছিল—আর সেটি সেখানে ছিল। প্রিয় য়ুম, আবার বলছি—শেষ আশীর্বাদটি ছিল তোমার জন্যেও—আমি জানতাম।

॥ ছাব্বিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
২৭ আগস্ট, ১৯০২

প্রিয় য়ুম আমার,

কাল বিকেলে একজনের সঙ্গে দেখা হল—সম্পর্কে তিনি স্বামীজীর ভাই, নাম তাঁর 'নৃত্যগোপাল'। সারাক্ষণই তিনি সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর গুরু, তবে তারচেয়েও বেশি বন্ধু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন-ক্ষণ স্থির করে দিয়েছেন তিনি—সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবার, সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি। তিনি গেরুয়া পরেন না, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য বড়ো মধুর, যতক্ষণ ছিলাম তাঁর কাছে, ভারি ভালো লাগছিল। গিরিশবাবু এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের অনুভূতির কথা বলতে শুরু করলেন।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ সংক্রান্ত কাগজপত্র তুলে নিয়ে তিনি তক্ষুণি চলে গেলেন।

লন্ডন ছাড়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে লেখা তোমার সেই সুন্দর চিঠিখানি আমি পেয়েছি যথাসময়। আমার (পাঠানো) প্যাকেজগুলো এখনও পৌঁছাল না। মনে হয় ওগুলোকে পার্সেল ভেবে ঘুর-পথে পাঠানো হয়েছে—Gibraltar ঘুরে তারপর ওখান থেকে যাবে New York। এতটা দেরি অনুমোদন করার পিছনে

স্বামীজীর নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল। যাই হোক, ওগুলো নির্বিঘ্নে তোমার কাছে পৌঁছেছে জানলে নিশ্চিন্ত হব।

মিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। আমার মনে হয় উনি কোনও কাজের নন—ঠিক মিঃ মোহিনীর মতো। ওঁর কথায়ই বলি—জাহাজ বোঝাই সুযোগ গঙ্গায় ভেসে তাঁর পায়ে এসে ঠেকবে সেই অপেক্ষায় তিনি টেম্‌স-এর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। নির্বোধ আর কাকে বলে! সুযোগ আকাশ থেকে পড়ে না—সুযোগ করে নিতে হয়। অরণ্য যদি পথরোধ করে তাহলে তা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পথ করে নিতে হবে। সুযোগের সন্ধানে দরকার হলে সাগর পাড়ি দিয়ে উত্তরমেরু অবধি ধাওয়া করতে হবে।

সদানন্দ আগেরই মতো আজও আমার অনন্ত আনন্দের উৎস। সেই শেষ রবিবারে স্বামীজীকে বললাম—তিনি আমার নামে সদানন্দের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ঠিক কাজ করেননি। কারণ তার ফলে সে মায়াবতীতে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। উত্তরে তিনি শুধু একটি কথাই বলেছিলেন—তিরস্কার নয়, সতর্ক করে দেওয়া নয়—শুধু বলেছিলেন, "ও তোমাকে শ্রদ্ধা করে, মার্গট, তোমার একান্ত অনুগতের মতো সবসময় তোমার অনুগমন করতে চায়। (তাই হয়তো) ওর মনে অধিকার বোধ জেগেছিল।" কী মধুর কথা! তাই না?

সদানন্দের অনুভূতিতে—স্বামীজী আজও বেঁচে আছেন, এক মুহূর্তও তিনি আমাদের ছেড়ে যাননি, তিনি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন, নয়তো বেলুড়ে। আমারও সেরকম অনুভূতি হয়। মহতী ইচ্ছাশক্তির জীবন্ত বিগ্রহের তো ক্ষয় নেই, লয় নেই—তিনি নিত্য, শাশ্বত, চিরজীবী। শুধু দেহাবসানে দেহ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত।

প্রিয় য়ুম, আমি বিশ্বাস করি—বাস্তবিকই আমি বিশ্বাস করি—তুমি আবার আসবে। এখানে এলেই তুমি তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে, আর এই অনুভব তোমাকে সান্ত্বনা জোগাবে। চারপাশের সব বস্তুর মধ্যে সেই মহাপ্রাণ আজও বেঁচে আছেন।

স্বামী সারদানন্দ আমাকে বললেন, ধূপদানিটা তুমি পেয়েছ আর অন্য প্যাকেটটাও পেয়ে যাবে। আমিও সেরকমই আশা করি।

শেষের সারাটি প্রহর ওই ধূপদানিতে ধূপ জ্বলেছে তাঁর শিয়রের কাছে। ওখান থেকে ওটা আমি সরিয়ে নিয়ে এসেছি তোমার জন্য। ওই ধূপদানি তোমাকে জোগাবে পরম আশ্বাস।

শোক-প্রকাশের সময় অন্যান্যদের সঙ্গে জাপানও সামিল হয়েছিল।

আমি যে ভীষণ ব্যস্ত—তা তুমি জান না। আমার চিঠি লেখার সুযোগ মেলে শুধু বুধবার রাত্রে। আজ বুধবার—রাত অনেক হল, এবার আমাকে থামতে হবে। কাল ভোর থেকে আবার কাজ শুরু কিন্তু এটাই আমার চিঠিপত্র লেখার একমাত্র অবকাশ। শুভ রাত্রি।

আমার Bairn (জগদীশ বসু)-এর কত যত্ন তুমি করেছ আর রিচ-এর প্রতিও সৌজন্য দেখিয়েছ অনেক। সেজন্যে আমি যে কত কৃতজ্ঞ নিশ্চয়ই তুমি তা বুঝতে পারবে। সঙ্গে কিছু চিঠিপত্র পাঠালাম, পড়ে তোমার ভালো লাগবে আশা করি।

ইতি
তোমার একান্ত স্নেহের খুকি
মার্গট

॥ সাতাশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
কলকাতা
২৮ আগস্ট, ১৯০২

প্রিয় নেল ও এরিক,

চিঠি আমি অনেককেই লিখেছি, তাদের মধ্যে তোমরা নেই—এ-যেন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কৈফিয়ত হিসেবে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে মাঝে সপ্তাহখানেক আমি অসুস্থ ছিলাম—তখনই মনে হয় সবকিছুর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই শুনেছ, সারা শীতকালটা স্বামীজী খুব অসুস্থ ছিলেন। যখন বেনারস থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁকে দেখে তো আমি স্তম্ভিত। তবু আমরা কেউ ভাবতে পারিনি যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কত কী করার বাকি ছিল তাঁর।

সেদিন প্রথম সাক্ষাতেই বললেন, তিনি চলে যাচ্ছেন, তাঁর কথার মর্ম বুঝিনি—ভেবেছি বুঝি জাপান যাওয়ার কথা বলছেন।...

শেষকালে রোগ নিরাময়ের জন্য এক কঠিন চিকিৎসার পথ ধরলেন তিনি। এই বিধি অনুযায়ী তাঁকে জল না খেয়ে থাকতে হল গ্রীষ্মকালের তিন তিনটি মাস। শুধু দুধ খাইয়ে রাখা হল তাঁকে। স্বাস্থ্যের দীপ্তি অবশ্য ফিরে এল, যেমন এসেছিল লন্ডনে থাকাকালীন। এই কটা মাস ধরে ভোরে ওঠার ওপর খুব জোর দিচ্ছিলেন তিনি—চাইছিলেন সূর্যোদয়ের আগে ভোর ৩-৩০ থেকে ৪টার মধ্যে উঠে গঙ্গাস্নান সেরে সবাই মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসবে। কিন্তু তাঁর স্নায়ু তখনই খুব দুর্বল, উন্নতি যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তা শুধু বাইরের। মনের বা স্নায়ুর অবস্থা যাই হোক, তাঁকে ঘিরে সেই দিব্য, অপার্থিব দীপ্তি তখনও অম্লান, বরং দিনে দিনে যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল। পরিবর্তন দেখা দিল প্রয়াণের দিন দশেক আগে। আমি গিয়েছিলাম আটদিন আগে। আমাকে তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। এখন প্রতিদিন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই মন্দিরে।"

যেই না বলা অমনি একটি টিকটিকি ডেকে উঠল। এখানকার মানুষের মনে একটা সংস্কার আছে যে, কথায় সায় দিয়ে যদি টিকটিকি ডেকে ওঠে তা সত্যি হবেই। কিন্তু তবু আমি সেই চরম পরিণতির কথা স্বপ্নেও ভাবিনি, আমি যে নিশ্চিত ছিলাম স্বামীজী অন্তত আরও তিন বা চার বছর বেঁচে থাকবেন। সেটা ছিল রবিবার, আর তার পরের শুক্রবার রাতেই তিনি চলে গেলেন।

আমি আবার গেলাম বুধবারে, (২ জুলাই) রইলাম সকাল নটা থেকে দুপুর অবধি। আহা, সেদিন তাঁর কী মধুর ব্যবহার! এখন মনে হয় তিনি জানতেন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার। কত যে আশীর্বাদ করলেন! কী মাধুর্য ঝরে পড়ছিল, কী অমৃতই না ক্ষরিত হচ্ছিল সেদিন তাঁর কথায়, তাঁর আচরণে! হায়, যদি জানতাম এই শেষ! বাইরে থেকে তাঁকে সুস্থ দেখালেও আমার কেবলই মনে হচ্ছিল তাঁর সাবধানে থাকাই এখন বিশেষ প্রয়োজন, তাই সেদিন আর কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি, ভয় পাচ্ছিলাম পাছে তিনি উত্তেজিত হন। বেশিক্ষণ থাকতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না, যদি আমার উপস্থিতিতে, আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরুন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন সেই ভেবে। সেদিনের প্রতিটি মুহূর্ত কী মূল্যবান তা যদি জানতাম।

ওহো, কি দুঃসহ যাতনা! তিনি জেদ ধরলেন আমাকে পরিবেশন করবেন। (কথাটার পুনরুক্তি হোক তা আমি চাই না।) যখন খাচ্ছি, তিনি পাখা হাতে নিয়ে আমাকে হাওয়া করলেন, নিজে আমার হাত ধুইয়ে দিলেন। আমি বললাম, "আপনি এসব করবেন এ আমি মোটেই চাই না, স্বামীজী। বরং আমার উচিত আপনার জন্য এসব করা।" তিনি হাসলেন আর তাঁর নিজস্ব বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু যিশু তো তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।" আমি বলতে যাচ্ছিলাম—কথাগুলো প্রায় আমার জিভের ডগায় এসেও গিয়েছিল—"সে তো শেষ সময়ে!" কিন্তু বলিনি—ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমি চলে এলাম। শুক্রবারেই তিনি কলকাতায় খবর পাঠালেন যে তিনি খুব ভালো আছেন—এত ভালো আগে কখনও থাকেননি। মধ্যাহ্নের আগে পর্যন্ত তিনি মন্দিরেই রইলেন। তারপর তিন ঘণ্টা ধরে ছেলেদের সংস্কৃত পড়ালেন। সারাটা বিকেল কত লোকের সঙ্গে কত কথা বললেন! সবই মধু-ঝরা—অমৃত-ক্ষরা! বিকেল সাড়ে চারটেয় তাঁর কাছ থেকে বার্তা এসে পৌঁছাল কলকাতায়। তারপর এক পেয়ালা গরম দুধ আর জল খেয়ে হাঁটতে বেরোলেন, দু-মাইল পথ হেঁটে ফিরে এলেন। একান্তে বসে ধ্যান করবেন বলে সবাইকে সরিয়ে দিলেন, সন্ধ্যালগ্নে সূর্য যখন অস্তমিত তখন তিনি বসলেন ধ্যানে। আর আশ্চর্যের কথা! সেদিন তিনি প্রচলিত প্রথা না মেনে, ধ্যানাসনে বসলেন উত্তর-পশ্চিমাস্য হয়ে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি ঘুরে বসলেন এবং শুয়ে পড়লেন। আর একটি ছেলেকে ডেকে বললেন তাঁকে হাওয়া করতে, আর একটু পদসেবা করতে। তারপর তিনি শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ একটা কাঁপুনি দিয়ে, ঘুমের ঘোরে যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন। তারপর জোরে জোরে শ্বাস নিলেন—কিছুক্ষণ বাদে আরও একবার। আর তারপরেই সব শেষ! আমাদের প্রিয় প্রভু চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! জীবনের সান্ধ্যসঙ্গীত সমে এসে থামল। ধরিত্রীর বুকে নামল নীরবতা আর সূচিত হল আত্মার মুক্তি।

শেষের কটি দিন যে মাধুরী দিয়ে, যে শুভ আশিস দিয়ে তিনি আমাদের ঘিরে রেখেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

নিশ্চিত জেনো, তোমাদেরকে তিনি ভোলেননি—কতজনকে তিনি মুক্তির আশ্বাস দিয়েছেন, পরিত্রাণের আশ্বাস দিয়েছেন। তাদের সবাইকে তিনি মনে

রেখেছেন। মুক্তিদাতা তিনি, তিনি পরিত্রাতা, তাই মহাসমাধিতে লীন হয়েও তিনি ভোলেননি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তাঁর চলে যাওয়ার পর আমি যে এর কত নিদর্শন পেয়েছি!

স্মৃতির বন্ধনও যে বন্ধন! তাই ইচ্ছে করে, লোকে তাঁকে ভুলে যাক— মুক্তি দিক তাঁকে স্মৃতির বন্ধন থেকে। সচ্চিদানন্দ সাগরে লীন হয়ে যান তিনি—ভুলে যান মর্ত জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার স্মৃতি।

তাঁকে সেবা করতে এত ইচ্ছে করে! এমন সেবা যা সত্যিকারের কাজে লাগবে। সেই সেবা-প্রয়াসের কী পরিণাম হবে তা নিয়ে ভাবি না। যদি কাজের সূত্রে কোনও ভয়ংকর বন্ধনে জড়িয়ে পড়তেও হয়, তাহলেও খুশি হব যদি তাঁর সঙ্গে আত্মিক যোগ থাকে। তাঁর কাজের জন্য যে শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রয়োজন, আমি যেন তা লাভ করি—এই প্রার্থনা কোরো। আর কোনও আশীর্বাদ চেয়ো না আমার জন্য। আমি আর কিছু চাই না। নেল, তুমি জেনো তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন—তাঁর মৃত্যু হয়নি। আমি শোক পর্যন্ত করতে পারি না। আমি চাই শুধু কাজ করে যেতে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
নিবেদিতা

সহকর্মী কৃস্টিন

ভারতবর্ষের মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজে নিবেদিতাকে আহ্বান করেছিলেন স্বামীজী। তিনি চেয়েছিলেন একজন প্রকৃত সিংহিনী। নিবেদিতার মধ্যে সেইরকম তেজ অর্থাৎ জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে, একথাও বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন—নিবেদিতা গুরুগিরি করতে এদেশে আসেনি, সে জীবন দিতে এসেছে।

নিবেদিতা স্বামীজীর নির্দেশে বাগবাজার বোসপাড়া লেনে কাজ আরম্ভ করেন ১৮৯৮-এর নভেম্বরে। ১৯০৩ সালে স্বামীজীর আহ্বানে ভগিনী কৃস্টিনও নিবেদিতার সঙ্গে মিলিত হন স্ত্রীশিক্ষার কাজে। এসময় নিবেদিতার পক্ষে স্বামীজীর নির্দেশিত পথে তাঁর কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। স্বামীজীর অনভিপ্রেত কাজ করছেন এই মর্মযাতনায় তিনি বিচলিত হয়েছেন। সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর হৃদয় যখন রক্তমোক্ষণ করছে তখনও স্বামীজীর দায় বহন করার জন্য সর্বস্ব পণ করে বসে আছেন। শ্রীগুরুর সঙ্ঘকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজেকে বঞ্চিত করতে দ্বিধা করেননি। প্রকাশ্য পত্র লিখে ঘোষণা করেছেন—তিনি আর এখন থেকে 'সঙ্ঘসদস্যা' নন, তাঁর কোনও কাজের জন্য সঙ্ঘের দায়িত্ব নেই। এর থেকে কি নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে দেওয়া সহজ ছিল না?

নিবেদিতা যখন এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন তখন কৃস্টিনকে দেখলেন কী শান্ত, সরল, অনুদ্বিগ্ন। বর্তমান তিনটি পত্রে তাই কৃস্টিনকে দেখতে পাই নিবেদিতার দৃষ্টিকোণ থেকে। কৃস্টিনের সঙ্গে তুলনায় নিজ চরিত্রের জটিলতা উপলব্ধি করে সংশয়পীড়িত নিবেদিতার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত। নিবেদিতার পত্রাবলীতে অসংখ্যবার সপ্রশংস উল্লেখ আছে কৃস্টিনের এবং তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন—স্বামীজী তাঁর দেশের মেয়েদের জন্য যে-কাজ তাঁকে দিয়ে করানোর আশা করেছিলেন, সেটি কৃস্টিনই এখন সার্থক করে তুলেছেন।

॥ আটাশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজাব, কলকাতা
২৯ এপ্রিল, ১৯০৩

প্রিয় য়ুম,

ভয় হচ্ছে তুমি বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছ। সত্যি মনে হয়, একবার যদি তোমার কাছে চলে যেতে পারতাম! কিন্তু সেটা তো পারছি না। জানি তুমি বুঝতে পারবে, কেন। জয়-পরাজয় যা-ই আসুক না কেন, বিশ্বস্ত থাকতেই হবে। অনেক সময় মনে হবে, সামনে বুঝি পরাজয়। তবু তিনি (স্বামীজী) হয়তো তাঁর অনন্ত হৃদয়বত্তা দিয়ে সবকিছুকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উদার দৃষ্টিতে দেখেন,—যেখানে আমরা কেবল হতাশা ও উদ্বেগে ভুগি সেখানেও তাঁর দৃষ্টি খুঁজে পায় সার্থকতাকে।

সর্বশেষ সংবাদ হল, সদানন্দ ছ-টি ছেলেকে নিয়ে হিমালয়ে যাচ্ছে। সাতজনের একটি দল গতরাত্রে কাঠগুদাম রওনা হয়ে গেল। এদের মধ্যে পাঁচটি এই পাড়ার ছেলে, সেই সঙ্গে আছে ডঃ বোসের এক ভাগনে। পদব্রজে পিন্ডারি গ্লেসিয়ার যাওয়া ওদের লক্ষ্য। লেডী বেটি প্রদত্ত দুশ টাকায় এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হল। পরে আরও একশ টাকা পাওয়া গেল। কৃস্টিন বলে, এখানে এসে সে বুঝতে পারছে অল্প টাকাতেও কতখানি উপকার করা যায়, সামান্য টাকাতেও সুখী করা যায় কত বেশি লোককে।

মায়েদের সজল চোখে সন্তানদের বিদায় দিতে দেখে বুঝতে পারলাম এ-অভিযান কত কল্যাণপ্রদ হবে। এই ঘটনা থেকে ধারণা করতে পারি যখন বন্ধন ছিন্ন হয় তখনই স্বাধীনভাবে কাজ করা যায়। অবশ্য এখনও অনেক সময় লাগবে।

স্বামী সারদানন্দ মেয়েদের কাজের জন্য আর্থিক সাহায্যের একটি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। কৃস্টিনের মাধ্যমেই তিনি (সে কাজ করানোর) চেষ্টা করবেন। কাজ শুরু করার জন্য একটি বাড়ি—এককালীন এক হাজার টাকা এবং মাসিক তিরিশ টাকায় পাওয়া যাবে। বাড়িটি খুব কাছে। সুতরাং কৃস্টিন এই বাড়িতে থেকেই ওখানে গিয়ে কাজ করে আসতে পারবে। চমৎকার নয় কি?

আমি বই লেখা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। আপাতত এটাই প্রধান কাজ। তবে বলতে পারছি না আরও কতদিন লাগবে। আমার ভয় হচ্ছে, বড় বেশি ধীরে

এগোচ্ছি, আমি তো এখনও পর্যন্ত স্বামীজীর প্রসঙ্গ আরম্ভই করিনি। আশঙ্কা হয়, কাজটি শেষ করতে বহু বছর লেগে না যায়। শুনে ভালো লেগেছে যে মারে (Murray) বইটি দেখতে চান। তাহলে বুঝতে হবে আগের বইটি সার্থক হয়েছে, তুমি গ্রন্থরচয়িতার (author) কাছে এই বিষয়ে কী কিছু শুনেছ? তিনি কী বলছেন? সম্ভবত সেন্ট সারা আমাকে কিছু বলবেন। তিনি আজ Kobe (জাপানের বন্দর) এসে পৌঁছাবেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছি (খরচটা আমাকে দিতে হয়নি)।

আমাকে বলো তো, সেন্ট সারা এই শীতেই ফিরে যাবেন, এমন কথা তুমিও ভাবছ না তো? আমি তাঁকে কিছুতেই যেতে দেব না, এখানে তাঁকে বড়ো বেশি দরকার আমাদের।

কৃস্টিন ছেলেদের খুব প্রিয়। এটা ভারি অদ্ভুত! আমি একলা বসে শুধুই লিখি—আগে যে কাজগুলি করতাম তার কিছুই করি না। বেট একটু সেলাই শেখায়। স্বামীজীর কাছে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম তা এখন ফলে যাচ্ছে। তাঁর আগেকার পরিকল্পনাগুলির দায়িত্ব কৃস্টিন নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। আমার ভূমিকা অনেকাংশে পরোক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিসেস বুল বলতেন—মিস ওয়াল্ডো ছিলেন সেই মহিলা যাঁর কাছে স্বামীজী অনেক আশা করতেন এবং যাঁকে ভারতবর্ষ ও তার মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য গড়ে তুলেছিলেন। তারপর মনে হয়েছিল—আর স্বামীজীও তাই বিশ্বাস করতেন যে আমিই সেই 'সিংহিনী' যে ভারতের কাজের জন্য জন্মেছে। কিন্তু এখন দেখছি, স্বামীজী আমার জন্য যে পরিকল্পনাগুলি করেছিলেন আসলে সেগুলি কৃস্টিনকেই কার্যকরী করতে হবে। তবুও মনে করি না যে, আমি একেবারে ব্যর্থ হয়েছি। কেবল প্রত্যাশিত কাজের ধারা থেকে সরে আসতে হবে এবং যে ভূমিকাটি আমার জন্য নির্দিষ্ট, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখন আমি প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারছি শেষের বছরগুলিতে স্বামীজীকে বিফলতার কী তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই না যেতে হয়েছিল, যার অস্পষ্ট আভাস আমি এখন পাচ্ছি।

এটা কি আশ্চর্যের নয় যে ভারতে আসার আগে আমি তাঁকে যত চিঠি লিখেছি তাতে বলেছি, "যদি আমি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হই, তাহলেও আরও অনেকে থাকবে যাদের মধ্য থেকে আমার চেয়ে দশগুণ যোগ্য ও আপনার কাজের পক্ষে অধিক উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে।"

হায় য়ুম, যদি তোমার কাছে যেতে পারতাম তাহলে তো আমিই বেশি লাভবান হতাম। স্বামীজীর সম্পর্কে আমার অনুভূতি পুনরুজ্জীবিত হত, নতুন করে বিশ্বাস ফিরে পেতাম যে আমি উৎসর্গীকৃত। আমি বরাবর জানতে চেয়েছি—মিসেস রথলিসবার্জার বলবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও আমাকে ধরে রয়েছেন, চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার একটা বদ্ধ ধারণা যে গত সপ্তাহে লেখা সেই চিঠিখানা তিনি কখনও পাবেন না। সুতরাং আশা করা বৃথা। কেবল দেহ-কারাগারে বদ্ধ জীবনের চেয়ে তাঁর দেহ-বিমুক্ত আত্মা স্বামীজীকে অনেক বেশি সেবা করবে ও তাঁর নিজজনদের শক্তি যোগাবে। কে জানে যিনি বিশ্বস্তভাবে এতদিন দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে বার্তা বিনিময় করেছেন, তিনি ভবিষ্যতে জীবনের অপরপারে স্বামীজীর বার্তাবহ হবেন কিনা। আমি অন্তত এখনকার চেয়ে তখন তাঁকে আরও ভালোভাবে জানার আশা রাখি।

শনিবার Rich-এর জন্মদিন। সে বোধ হয় জামাইকায় (Jamaica) আছে। তুমি তার পত্রখানি যেভাবে গ্রহণ করেছ তার জন্য ধন্যবাদ। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের দিন লেখা তার একটি পত্র পেয়েছেন ডঃ বোস।

গত বছর মায়াবতী যাওয়ার আগে স্বামীজীর কাছে আমি যে বিদায় নিয়েছিলাম, এই রবিবার ছিল তার বার্ষিকী। স্বামীজীর সঙ্গে কৃস্টিনের সেইদিনই শেষ দেখা, আমারই কেবল তাঁকে আবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

মৃত্যুর আগে ঈশ্বর আমাকে তাঁর (স্বামীজীর) নামে নির্ভীক সত্য বাক্য উচ্চারণ করার শক্তি দিন, যে বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন নির্মল ও নির্ভুলভাবে প্রবাহিত হতে থাকবে—যেন আর একবার দেখতে পাই বিশ্বাসের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সে-ই মুখ! এবং তারপর আমি অনন্তে মিলিয়ে যাব এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তাঁকে আমি হতাশ করিনি। কেবল এইটুকুই প্রার্থনা, শুধু এইটুকু। কিন্তু আমার এই কথাগুলি কাউকে বলো না, কারণ আমার ভালোবাসা তোমার স্নেহচ্ছায়াতেই আশ্রয়লাভ করেছে। যতই তারা ভালোবাসুক না কেন স্বামীজীকে, এই কথাগুলি আর কাউকেই বলতে পারব না।

য়ুম, তুমি যেখানেই থাক—ভায়োলেট ফুলের সমারোহপূর্ণ পাইনবনে অথবা আনন্দোচ্ছল লন্ডন জীবনের ঘূর্ণি ও ফ্যাশনের মধ্যে— স্বামীজী তোমাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন, তোমার হৃদয়-ভার লাঘব করুন।

তোমার চিরদিনের
মার্গট

॥ উনত্রিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
২৫ নভেম্বর, ১৯০৩

আমার প্রিয়তম য়ুম য়ুম,

তোমার অপূর্ব পত্র ও ফটোগ্রাফটি ঠিক সময়ই পেয়েছি। সেগুলি পেয়ে কী খুশি যে হয়েছি বলতে পারব না।... Puvis de Chavannes-এর মতো এমন শিল্পী হওয়া, তাঁর মতো দুর্লভ কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া—সবটাই কী অপূর্ব ব্যাপার। ছবিতে সেন্ট জেনেভিভ প্রার্থনারতা—সম্মুখে প্রসারিত ঘুমন্ত প্যারী নগর! আহা কী শান্তি—তাঁর আত্মার কী মহিমময় প্রকাশ!

প্রিয় য়ুম, আমি তো সেইরকম নই! কৃস্টিনকে দেখার আগে পর্যন্ত তো বুঝিনি কতখানি অস্থির, উত্তেজনাপূর্ণ ও ব্যর্থ আমার জীবন। স্বামীজীর যে স্বপ্ন ছিল আমার জন্য, তার সবই পূর্ণ করছে কৃস্টিন। স্ত্রীশিক্ষার সফলতা বিস্ময়কর কিন্তু অনেক বেশি আশ্চর্যজনক কৃস্টিন নিজে। তার সারাদিন ব্যয়িত হয় স্বাধ্যায়, কাজকর্ম ও লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে এই বাড়িতেই বাস করছে অথচ কোনও অকারণ ব্যস্ততা নেই, নেই কোনও জটিলতা। বৃথা ঈর্ষা নিয়ে তাকিয়ে থাকি তার দিকে—আর অনুভব করি, আগে তো আমার এই সীমাহীন অযোগ্যতার কথা বুঝতে পারিনি! ঠিক ঠিক কাজ করার বা স্বামীজীর আদর্শমতো জীবন-যাপন করার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষায় দগ্ধ হতে হয়নি কৃস্টিনকে, যেমনটি হতে হয়েছিল আমায়। আমার অন্তত মনে হয়েছে তাকে কোনওদিন সেভাবে কষ্ট পেতে হয়নি। যে আমি স্বামীজী-নির্দিষ্ট আদর্শে পৌঁছানোর জন্য এতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলাম, সেই আমিই সেই ভাবে ভাবিত হয়ে ঠিক কাজটি করতে ব্যর্থ হলাম, কৃস্টিনের জীবনে তীব্র যন্ত্রণা ছাড়াই আদর্শটি রূপায়িত। তা বলে নিজের অন্তরের দৈন্য আবিষ্কার করে 'আমার জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল' এমন বিলাপ করতে করতে তিক্ত অশ্রুবর্ষণ করিনি। বুঝতে পেরেছি বিলাপ করা চলবে না কারণ তাহলে আমার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত দেওয়া হবে স্বামীজীকে।

আমরা দুজন সবদিক থেকে বিপরীত স্বভাবের। কৃস্টিন ঠিক ঠিক প্রাচ্য নারী এবং সন্ন্যাসিনী—এই আদর্শকে ততখানি ভালো না বেসেও এবং সে

বিষয়ে চিন্তা না করেও। অথচ আমার এই আদর্শের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও আমি ব্যর্থ। আমি যেন এক প্রচার-উন্মুখ নির্বোধে পরিণত হচ্ছি। কৃস্টিনের স্বভাব একমুখী। সে আপন অন্তরের নির্দেশে কাজ করতে সক্ষম কারণ তা সর্বদা তাকে ঠিক পথে চালিত করে। আমার অন্তরে নিরন্তর সংগ্রাম চলছে মাধুর্যের সঙ্গে শক্তির। জোর দিয়ে তো বলতে পারছি না যে আমার সমস্ত জীবনে আলস্যকে ও নিজের ইচ্ছাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি না!

এই মানসিক অবস্থার মধ্যে তোমার পত্রটি এল অতীতের স্মৃতি বহন করে। আহা কত প্রিয় ছিল সেই দিনগুলি! তুমি হয়তো ভাবতে পার কত মানসিক যন্ত্রণা সয়েছি, সহ্য করেছি কত সমালোচনা অথবা তখন কাজ করার পক্ষে কত প্রতিকূল পরিবেশ ছিল যার ফলে আমার মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল। কিন্তু তা নয়, কারণ আমি জানতাম ডুবে আছি ঈশ্বরের বিরাট ইচ্ছার মধ্যে, তার দ্বারা দগ্ধ হচ্ছি এবং সেটি আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে। কিন্তু এখন? হায়, (স্বামীজীর) সেই প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আর নেই— কেবল রয়ে গিয়েছে গভীর মর্মবেদনা যা নাবিকের কম্পাস হয়ে রয়েছে সেই দুস্তর সমুদ্রে ঠিক পথে চালিত করার জন্য।

ওঃ য়ুম, একথা কি সত্যি যে তুমি দেখেছ স্বামীজী আশীর্বাদ করছেন আমাকে এবং আমি যা করছি তার সবকিছুকে? বারবার শুনেও যেন সাধ মেটে না! আমি নিজে বলতে পারি যে, যা আমার কর্তব্য বলে মনে হয়, আমি শুধু সেই কাজগুলি করি। সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বেশি সংশয়ে ভুগি যে আমার এই কাজগুলিতে তিনি বিরক্ত হচ্ছেন কিনা। আমি নিশ্চিত এটা আমার ভুল। আমি যা কল্পনা করতে পারি তার চেয়ে অনেক মহৎ তাঁর হৃদয়। কিন্তু আমার যে অনুভব করা দরকার তাঁর ইচ্ছাই আমার সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে চলেছে, তাঁর আশীর্বাদ ও অনুমোদন আমার জীবনকে আপ্লুত করে রেখেছে। স্বামীজী আমার জন্য যে জীবনাদর্শ ছকে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আমার বর্তমান জীবনের কত প্রভেদ। অনেক বিষয়ে আমি যেন ঠিক সেই কাজগুলিই করে যাচ্ছি যার বিরুদ্ধে তিনি সাবধান করেছিলেন আমাকে।

য়ুম, আমি তাঁর অবোধ সন্তান। হায়, যদি কোনও অলৌকিক বার্তা আমাকে জানাত যে আমি যা কিছু করছি, ঠিকই করছি, শুধুমাত্র আরও বেশি প্রযত্ন নিয়ে সেইদিকেই এগিয়ে যেতে হবে! হয়তো তা সত্ত্বেও আমি স্থায়ী স্বস্তি লাভ করতে পারতাম না—কারণ আমার মন বড়ো বেশি সংশয়পীড়িত।

স্বামীজীর স্মারক চিহ্নের সেই আধারটি—আহা, কী প্রশান্তিই না আমাকে এনে দিয়েছে।...

একথা কি সত্যি যে তুমি ক্রমশ সবল হচ্ছ? আমি খুব কৃতজ্ঞ। ইতালি থেকে তোমার চিঠিগুলি পেয়েছি। মনে হচ্ছে স্থানটিতে (ইতালি) তুমি খুব আনন্দ পেয়েছ। বাস্তবিকই জায়গার নামই তো আনন্দ পাওয়ার মতো। আমি ভাবছি তুমি কী কী দেখবে। আমি সবসময় কল্পনা করি ইউরোপে অ্যাসিসি হচ্ছে একমাত্র জায়গা যার আকাশে বাতাসে আমি আশ্রয় পাব। কিন্তু শুনেছি যে সেই স্থানটি এখন ধূলিতে পর্যবসিত—ভাবছি তুমি কি সেখানে যাবে!

আমি চিঠিখানা অসমাপ্ত রেখে কৃস্টিন ও বেটের সঙ্গে ৫৭ নং বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাই সেন্টদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে চিঠি শেষ করছি।

তোমার চিরদিনের ভালোবাসার
মার্গট

পুনশ্চ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেখানে (৫৭ নং বাড়িতে) রয়েছেন, গোপালের মা, যোগীন মা ও প্রেমানন্দ স্বামীর মা-ও রয়েছেন।

॥ ত্রিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন,
বাগবাজাব, কলকাতা
কালীপূজার দিন
৬ নভেম্বর, ১৯০৪

প্রিয়তম য়ুম,

গত শুক্রবার বেশ রাত করে এসে পৌঁছেছি। ইতিমধ্যে প্রায় একমাসের চিঠিপত্র জমে গেছে। ভাবলাম ভালো-লাগা চিঠিগুলোর উত্তর আগে লিখে ফেলি। তোমারও কি তাই মনে হয় না? বিশেষ করে যখন আমি সংকল্প করেছি রবিবারগুলিতে পূর্ণ বিশ্রাম নেব। ডাঁই করা চিঠিগুলির মধ্যে অ্যালবার্ট ও স্পেন্সের চিঠিও ছিল।... অ্যালবার্ট তো সবসময়ই বড়ো ভালো মেয়ে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সদা উৎসুক ও খোলা মনের যে স্পেন্সকে আমি চিনতাম তার সঙ্গে আমার চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তুমি তো জান—আমি মনে করি, কখন দিতে হবে যেমন জানা দরকার, তেমনই জানা

চাই কখন সেই দেওয়া থেকে সরে আসতে হবে। মনে হচ্ছে স্পেন্সের আমাকে আর দরকার হবে না। প্রিয় হলিস্টার! বুঝতে পারছি না ও এখন কী ভাবছে, কী করছে।

প্রিয় য়ুম, আর্থিক ব্যাপারে সত্যিই আমি অত উদ্বিগ্ন নই। আমি নিশ্চিত জানি যথার্থ প্রয়োজনের সময় অর্থ ঠিকই আসবে। আমি নিঃসন্দেহ যে তোমারও এ-বিষয়ে দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।...

দু-তিনটি জিনিস আমি এখন ভালোভাবে বুঝতে পারছি, যদিও ভাষায় প্রকাশ করা যেন অসম্ভব মনে হচ্ছে। আজ আমি তোমার সঙ্গে এই চিঠির ভিতর দিয়ে প্রাণ খুলে কথা বলব; আমি চাই না তুমি এই চিঠি আর কাউকে দেখাও।

সঠিক অর্থে আমি কিন্তু এখন আর সঙ্ঘের কর্মী নই, সে স্থান এখন কৃস্টিনের। এমনকি, আর বেশিদিন আমি স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে রাখতে পাবব না,—সেটাও কৃস্টিনকেই দিয়ে দিতে হবে।

তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কেন? কিছুটা অদৃষ্ট; তবে সত্যি বলতে কি আসল কারণ আমাকে 'লিখতে' হবে। আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি যে, সম্ভবত সেটাই আমার আসল কাজ যা আমাকে করতেই হবে। ক্রমশ এই ধারণাটাই দৃঢ়তর হচ্ছে।

আজ তোমার সঙ্গে খুব খোলাখুলি কথা বলব—যেন আমারই আত্মার সঙ্গে। একটা কথা আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে আমার মধ্যে যথেষ্ট বৈরাগ্যের অভাব। এই বাড়িতে পূর্ণ কর্তৃত্ব ছাড়া বাস করতে পারব না। এখানকার সবকিছু ছেড়ে এখনই চলে যেতে পারি এবং যে-কোনও একটি কুটিরে আমার লেখার ডেস্কটি ও একটি ভৃত্য নিয়ে বসবাস করতে পারি। কিন্তু সেই সুযোগ-সুবিধেটুকু আমি অপর কারও কাছে গ্রহণ করব—এ আমি মেনে নিতে পারব না। তোমাকে কি বোঝাতে পেরেছি? অতএব আমাকেই সকলের সব সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এটা ভালো করে অনুভব করলাম যখন সেন্ট সারা লিখলেন যে হ্যারিয়েট স্মিথ কৃস্টিনের কাছে আসছেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যখন আবিষ্কার করলাম যে, আমি কিছুতেই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারব না।

বৈজ্ঞানিক বন্ধুটি (ডঃ জে. সি. বোস) সেদিন খুব মার্জিতভাবেই আমাকে বললেন, কৃস্টিন যে ভাবে অনায়াসে আমার সাহায্য গ্রহণ করেছে, আমি কোনওদিন সেইভাবে তার কাছে নিতে পারতাম না। হয়তো একথা সত্য যে

এখানেই আমার চরিত্রের সীমাবদ্ধতা। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, এই আমিই তোমার কাছ থেকে কী পরিমাণে নিয়েছি তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। মনের এই সংকীর্ণতা আমার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে কিনা জানি না কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুতেই আমি গ্রহীতার ভূমিকা নিতে পারব না। কৃস্টিনের সঙ্গে সম্পর্কটা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং তার কাছ থেকে আমি কিছুতেই নিতে পারব না, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তাই এখানকার সব ব্যয়ভার আমাকেই জোগাতে হবে নতুবা চলে যেতে হবে। বুঝতে পারছ? হয়তো শেষ পর্যন্ত দুই-ই করব—তবে সেটা করব অনন্ত মাধুর্য ও শান্তির সঙ্গে। তুমি একবারও ভেবো না আমার কথার মধ্যে কোনও সঙ্গতি নেই। সেরকম কোনও কিছুই ঘটেনি।

এখানকার খরচ চালানোর ব্যাপারে যদি আমাকে অর্থসংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যে যেতে হয় তার স্পষ্ট নির্দেশ স্বামীজীর কাছ থেকেই আসবে। তিনি কি কাজ করার জন্য আমাকে সমস্ত পৃথিবীটাই দিয়ে যাননি? নিউইয়র্কে স্বামীজীর দ্বারা পরিচিত হওয়ার যথার্থ অর্থ আমি সম্প্রতি বুঝতে পারছি। **সেই পরিচয়ের ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে সবকিছুই দিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁর নিজের বোঝা বহন করার মহান অধিকার।**

কিন্তু এখানেও আমি তোমায় যা বলছি, সেটা যেন তোমার ও আমার মধ্যে গোপন থাকে। জানি, কেবল তুমি ও সদানন্দ এটা অনুমোদন করবে—কিন্তু অধিকাংশের দ্বারা এটি সমর্থিত হবে না। সমস্ত ব্যাপারটি তাই খুব নিঃশব্দে ও কৌশলের সঙ্গে ঘটাতে হবে। কারণ হিসেবে দেখাতে হবে আমি যেন একটু এদিক-ওদিক যাচ্ছি—অবশ্য যদি যাই এবং সেগুলির ওপর নির্ভর করবে আমি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারব, নাকি আমাকে সরে যেতে হবে।

কী আশ্চর্য আমি সত্যিই তোমাকে সব কথা বলতে পারলাম! বারবার চেষ্টা করেছি অপর কারও সঙ্গে কথাটা আলোচনা করার—কিন্তু পারিনি। এখন দেখো, কাগজের ওপর কালি দিয়ে লেখা হয়ে গেল—কিছুই গোপন থাকল না।

মনে হচ্ছে আমার আসল ত্রুটি হল নিজেকে জাহির করার বা কর্তা হওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা। মনে হচ্ছে আমি চাইছি—একমাত্র যেন আমারই অধিকার আছে সবকিছু পাওয়ার—এই দৃষ্টিতে লোকে আমাকে দেখুক। এ তো এক ভয়ংকর অবস্থা! অন্যদিকে নিজের স্বভাবের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ এতখানি শক্তি ও সময় ক্ষয় করে যে কোনও কাজই করা যায় না।

আমার ধারণা পরবর্তী অক্টোবর মাসে (১৯০৫) আমাকে পাশ্চাত্যে যেতে হবে। অবশ্য যখন আমি অনুভব করব যে, এরপর ওটাই আমায় করতে হবে।

(এর পরের পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি।)

* * *

এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বহনের যথেষ্ট শক্তি রাখে কৃস্টিন এবং সে যে তা পারে সেটা আশ্চর্য, কারণ কখনও সে নিজেকে জাহির করে না। (পারিবারিক দায়িত্ব-বহনের) সুদীর্ঘ সংগ্রাম তাকে ইস্পাতের মতো কঠিন করেছে—আর সে খুব আত্মনির্ভরশীল।

বোধহয় আমার পক্ষে এই কাজ চালিয়ে যাওয়া সময়ের অপচয়। হয়তো শান্তভাবে সবকিছু থেকে আমাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে বৃহত্তর কোনও কাজের জন্য—যে কাজের মতো শক্তি ও তেজ আমার আছে। কেবল আমার এই লেখাপড়ার ছোট্টো ঘরটিকে, আমার এই বাসাটিকে যদি নিজস্ব করে রাখতে হয়, যদি এখান থেকে আমার ইচ্ছামতো জীবন যাপন করতে হয়! যদি নিজের বিচার অনুযায়ী লক্ষ্য স্থির করে তাকে অনুসরণ করতে হয়! সেখানে আমার ভূমিকা হতে হবে অন্নদাতার—অপরের এবং নিজের কাজের জন্য টাকা জোগানোর। আমার তো এখানে দাঁড়ানোর মতো আর কোনও ভূমিকা নেই এবং আমি কিছুই দাবি করতে পারব না—কখনও তা করিনি।

তুমি জান সঙ্ঘের সঙ্গে কৃস্টিনের সোজাসুজি একটা যোগ রয়েছে। তোমাকে নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর হৃদয় থেকে কখনও আমায় নির্বাসিত করেননি। কিন্তু যদি সত্যি কথা বলতে হয় তাহলে আর অন্য গুরুভাইদের কাছে আমার স্থান ঠিক কোথায় সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমার তাই দেওয়ার অধিকার আছে, গ্রহণ করার নয়। যদি আর একজন কেউ আসে, তাকে তখনই কৃস্টিনের সহকারিণী করে নেওয়া যাবে, তাতে কোনও অসুবিধে হবে না—এইভাবে একটি সঙ্ঘ গড়ে উঠবে।

কোনওদিন ভাবতে পারিনি এইসব কথাগুলি এমন করে খুলে বলতে পারব। তোমাকে সব বলাতে তো কোনও ক্ষতি হয়নি। আমার মনে হচ্ছে স্বামীজী চেয়েছেন আমার মনকে এইভাবে হালকা করি। তুমি যেন আবার ভেবে বসো না যে এখানে তোমার কিছু করার আছে। শুধু তোমার দিব্য সহমর্মিতা অনুভব করতে দিয়ো। তারপর দেখা যাক কী হয়।

* * *

সহকর্মী কৃস্টিন

মিসেস বুল লিখেছেন যে মেমির (Mamie—কৃস্টিনের ছোটো বোন, যাকে একবার তাঁর সহকারিণীরূপে আনার প্রস্তাব হয়েছিল) ভারতে আসার ব্যাপারে মিসেস ফাঙ্কির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মিসেস ফাঙ্কির ধারণা মেমির অতখানি অসুবিধে নেই এবং সেই কারণে কৃস্টিনকে উদ্বিগ্ন করা নিষ্প্রয়োজন। আমার মনে হচ্ছে প্রস্তাবটির এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। তার আসা বা না-আসা দুটোই আমরা সমানভাবে গ্রহণ করব। কৃস্টিন ভাবে যে অনেক কষ্ট করে স্বামীজী তাকে পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। সুতরাং যে বন্ধন স্বামীজী নিজের হাতে ছিন্ন করেছেন, তাকে নতুন করে গ্রহণ করার ব্যাপারে কৃস্টিন আতঙ্কিত। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে সেই অল্পবয়সী মেয়েটির (মেমির) জন্য এখানে জায়গা রয়েছে এবং সে কৃস্টিনের অন্য কর্মভার লাঘব করতে পারত।

* * *

অ্যাস্‌টন জনসনদের কথাটা ভাবো। তার মনটি কি একটু অনুকূল হয়েছে? তাদের ও আমাদের মধ্যে স্বামীজীই কি প্রকৃত যোগসূত্র? য়ুম, স্বামীজীর কি আশ্চর্য বিশ্লেষণী শক্তি ছিল! তোমার কি মনে পড়ছে জনসনদের সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন, ''জগন্মাতা ওদের আমার কাছে সেইভাবে পাঠাননি।'' তারা যে আমাদের মতো এক ভাবের লোক নয়, এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি স্বামীজী নিশ্চিতভাবে তখনই বুঝতে পেরেছিলেন—কিন্তু আমি এত পরে এখন বুঝতে পারছি।...

মিঃ নোবলের পত্র বেশ সুন্দর ও উৎসাহে পূর্ণ। তাঁকে খুব সুখী মনে হচ্ছে যা আমাকেও আনন্দিত করছে। তবে আমার ভয় হয় একটা জাতি অপরের দ্বারা বিজিত হওয়ার ব্যাপারটা তিনি খুব ভালো বোঝেন না। তিনি যে 'রিলিজিয়ন অব দি সোর্ড' (সহিংস রাজনীতি)-এর কথা বলেন, তার সঙ্গে আমি একমত। ভারতের হাতের 'তরবারি' হল তার জাতীয়তাবোধ। তাকে যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহী ও প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, সত্যি সত্যি রক্তপাতের প্রয়োজন হবে না, কেবল এখনকার মতো ভারতকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

প্রিয় য়ুম, এবার তোমার কাছে বিদায় নেব।...

ইতি

তোমার চিরস্নেহাশ্রিতা কন্যা

মার্গট

স্বামীজীর মহান দায়

১৯০২-এর ৪ জুলাই স্বামীজীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণ নিবেদিতার চিন্তাধারা ও কর্মে নিয়ে এল আমূল পরিবর্তন। বিদ্যালয়ের সীমিত পরিধির মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রীশিক্ষার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ ইতিমধ্যে নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতার গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন যদিও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস যাঁরা অনুশীলন করেছেন, তাঁরা জানেন পরবর্তী কালে ইতিহাস-চর্চায় স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার অসাধারণ ভূমিকা কী শোচনীয়ভাবে উপেক্ষিত।

নিবেদিতা ক্রমে জড়িয়ে পড়লেন রাজনৈতিক কর্মধারায়। ফলে বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হল, তবুও নিবেদিতা হতে চান সর্বতোভাবে স্বামীজীর বার্তাবহ। এখন সংগ্রাম তাঁর একার। তাঁকেই অর্থসংগ্রহ করতে হবে। তাই দিবারাত্র ব্যস্ত রয়েছেন গ্রন্থরচনায়। দুঃসহ গরমে, নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্যে চালিয়ে যেতে হবে 'স্বামীজীর কাজ'—এই তাঁর জীবনব্রত। অন্তরের এই কথাগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বান্ধবীদের কাছে লেখা পত্রগুলিতে।

॥ একত্রিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলকাতা
৯ এপ্রিল, ১৯০৩

প্রিয় লেডি বেটি,

তোমার গতবারের চিঠি ও সেইসঙ্গে যা-কিছু পাঠিয়েছ তার জন্য কী বলে যে ধন্যবাদ দেব! আশা করি, আমাদের কাজ তোমাদের এই শুভেচ্ছা-সহানুভূতির মর্যাদা চিরদিন রাখতে পারবে।

আমার পরিজনবর্গের (বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী) সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে—ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই এই আনন্দের সম্পর্কে নিঃস্পৃহ থাকব এটা বলতে পারি না।

পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে আমরা সকলে এখন 'সিস্টার' নামে পরিচিত। 'সিস্টার বেট', 'সিস্টার কৃস্টিন', 'সিস্টার নিবেদিতা' ইত্যাদি এবং সদর দরজার পাশে কালো, ছোট নেমপ্লেটে তার ঘোষণাটা এইরকম :

সিস্টারদের বাড়ি

সাক্ষাৎকার :

ক্লাস :

লাইব্রেরি :

কিন্তু নেমপ্লেটে একটি বিশেষ তথ্যের উল্লেখ নেই যে 'চার্মিং' (Charming) নামে এক মুসলমান ছেলে প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত পরিশ্রমের কাজগুলোতে বেটকে সাহায্য করে থাকে। কোনও এক অভিশপ্ত দিনে আমি যখন গৃহে অনুপস্থিত, তখন আমাদের দরজায় কেউ নধরকান্তি এক ছাগলকে বিক্রি করতে এলে 'চার্মিং' সেটিকে কিনে ফেলে। আপাতদৃষ্টিতে সে এখনও ওই জীবটির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি। ছাগলটি আকারে প্রায় একটা বাছুরের সমান। গলার দড়ি বারবার চিবিয়ে খেয়ে নিজেকে সে বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। আর ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীরা আমাদের প্রতি অকৃত্রিম মমতা ও করুণায় তাকে নিজেদের বাড়িতে আটকে রাখার চেষ্টা করছে। আহা, তাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েদেরই জায়গার অভাব! তার ওপর আমরা তো এই ভেবে ভয়ে মরি আদতে ওটা যে একটা 'বিধর্মী ছাগল'(!) একথা জানলে সেই ভুলের কী মারাত্মক মাশুল না দিতে হবে!

আমাদের এই ছোট্টো বাড়িটা দেখলে তুমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে। বাড়ির সামনের উঠোনটা খুবই সুন্দর। আগাগোড়া লাল ইঁটে বাঁধানো, সেইসঙ্গে সবুজ গাছগাছালি। উঠোনটাকে আমরা সবসময় ঝকঝকে তকতকে করে রাখি। দু-তিনটে ঘর। তাতে প্রচুর আলো-হাওয়া। সন্ধের পর প্রতিবেশী মহিলারা কখনও কখনও আমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসেন। এঁরা কুশন দেওয়া বেতের চেয়ারে আরাম করে বসেন আর আমরা সাধারণত মেঝেয় বসে এঁদের সঙ্গে গল্প করি। ব্যবস্থাটা যে এঁদের মনের মতো—এটা বেশ

বুঝি। আর এই মহিলাদের কী মর্যাদাবোধ! বিদেশি ধরন-ধারণ দেখলে নিজেদের ব্যবহারে কখনও এতটুকু বিস্ময় বা সংকোচ দেখান না। আর আমরা যখন এঁদের বাড়িতে যাই, নিজেদের সামান্য যা আছে যেমন একটা মাদুর বা জলচৌকি—তাই আমাদের জন্য এগিয়ে দেন অথচ কী শান্ত সংযতভাবে!

আমরা এখানে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। চারপাশের কাজকর্ম সহজভাবে আপনা-আপনি গড়ে উঠছে। পাড়ার ছোটো ছোটো মেয়েরা রোজ দুপুরে সেলাই শিখতে আসে। অল্পবয়সী ছেলেরা আসে পড়তে। প্লেগ-নিরাময়ের আনুষঙ্গিক কাজগুলো পাড়ার ছেলেরা স্বেচ্ছায় করে চলেছে, আর আমি এখানে বসে শুধু লিখছি, লিখছি আর লিখছি। তুমি লন্ডন ছাড়ার আগে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি যদি ওখানে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে খুবই খুশি হব। সেন্ট সারা তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। আগামী সোমবার উনি জাপানের উদ্দেশে জাহাজে পাড়ি দেবেন। অতএব ইতিমধ্যে নিশ্চয় রওনা হয়ে গেছেন। আমি ওঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে উৎসুক।

মিসেস সেভিয়ার আবার পাহাড়ে ফিরে গেছেন। যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। স্নায়বিক উত্তেজনা ও মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলেন। ওঁর মতো শান্ত, অভিজাত মহিলাকে এমন অসুস্থ দেখাও যেন কষ্টকর।

আমার ধারণা, তোমার লন্ডনের বাড়িতে গ্রীষ্মের দিনগুলো উপভোগ করতে যাচ্ছ। আশা করি, দিনগুলো যেন খুব আনন্দে কাটে। বসন্তের অজস্র ফুলের মধ্যে তোমাকে যদি দেখতে পেতাম!!

আমাদের চিরদিনের প্রিয় লেডি বেটি!!

ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে
তোমার মার্গট

॥ বত্রিশ ॥

১৭ নং বোস পাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
২০ মে, ১৯০৩

আমার প্রিয় য়ুম,

গত সপ্তাহে লিখতে পারিনি, কারণ মেদিনীপুরে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। ওখানে এত গরম যে তুলনায় এখানে বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। তবু তাতেই সকলে অতিষ্ঠ। কৃস্টিন আর বেট এক সপ্তাহ হল দার্জিলিঙে গিয়েছে। সেই ছোট্টো শিশুটি ছিল কন্যাসন্তান—গত বৃহস্পতিবার জন্ম হয় মৃত অবস্থায়—সম্ভবত ভূমিষ্ঠ হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে মাতৃজঠরেই মারা যায়। অনেক কষ্টে মায়ের (মিসেস অবলা বসু) জীবনই শুধু বাঁচানো গেল। বেচারি ছোট্টো মা! কতখানি যে সে হারাল! তোমার ঘাসফুল (hay blossom) আজ এসে পৌঁছেছে। আর আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তার বদলে এক বাক্স শুকনো নিমপাতাগুঁড়ো পাঠিয়ে শোধ তুলি। আমাদের সর্বরোগহর নিমগাছের সন্ধান পেয়ে ওরা মুগ্ধ হবে। সব থেকে ভালো হয়, দূষিত রক্ত শোধনের কাজে লাগতে পারে ভেবে কোনও ডাক্তার ফুলগুলোকে যদি খুশিমনে নিয়ে যান।

আমার ধারণা, প্লেগ রোগ সারাতে এমন পরীক্ষামূলক চিকিৎসার দায়িত্ব কোনও ডাক্তারই নিতে চাইবেন না। প্লেগের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এদেশের মানুষ এখন যথেষ্ট সচেতন। রোগীর ব্যাধিমুক্ত হওয়ার অনেকটাই নির্ভর করে রোগের আক্রমণের তীব্রতার ওপর। একটা মোটা কেঁদো বাঘ ঘাড়ের ওপর হঠাৎ লাফিয়ে পড়লে নিস্তার পাওয়া কি সম্ভব!!

আশা করছি, এস. সারা ৭ জুন পৌঁছে যাবেন। বলতে গেলে আমি তাঁর জন্য পথ চেয়ে বসে আছি। এই অসহ্য গরমটা খুবই অবসন্ন করে দেয়। বোধহয় সেজন্যই আশার চেয়ে নৈরাশ্যের ভাবটা প্রবল হয়ে ওঠে। এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা, আশা করি, বেচারা সারাকে একেবারে মেরে ফেলেনি! মনে হয় শরৎকালে আর পাড়ি দেওয়ার জিদ ধরবেন না। ওঁর চিঠির জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ। জাপান থেকে পাঠানো তারবার্তা ছাড়া গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওঁর কাছ থেকে কোনও চিঠি আমরা পাইনি। আজ সকালে ব্রিন্দিসি হয়ে তোমার কাছে পার্সেলে যে উপহার যাবে, আশা করি সেটি তোমার খুবই

পছন্দসই হবে। যেহেতু ওটা পার্সেল, সেজন্য এই পত্রটির মতো তাড়াতাড়ি পাবে না—তবে আগামী ২০ জুনের মধ্যে নিশ্চয় পৌঁছাবে।

মনে হয়, মেদিনীপুরে আমার কাজ কিছুটা সফল হয়েছে। পাঁচ দিনে আমাকে বারো-তেরোটি বক্তৃতা দিতে হল। কেউ যখন এভাবে তার সবটুকু দিয়ে কাজ করে, তখন আমার বিশ্বাস, যত সামান্যই হোক না কেন, তার একটা মূল্য থাকেই। ও য়ুম, আমার আগে যত আত্মবিশ্বাস ছিল এখন তার খুব কমই অবশিষ্ট আছে। শুনলাম, আমার বক্তব্য ছেলেদের বোঝার পক্ষে কঠিন ছিল। সেগুলি ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। আমি তো সবরকম উপায়কেই কাজে লাগিয়েছিলাম। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—সোজাসুজি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে আমি অক্ষম। একটি উপযুক্ত মাধ্যম আমাকে খুঁজে নিতে হবে। তার ফলে অবশ্য আমার প্রকৃত ভাবগুলি (idea) পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে আমার ভিতর যেন গোটা দুনিয়াটাকে ওলট-পালট করে দেওয়ার মতো প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করি। কিন্তু হায়, বাতাসের বুকে আমার সে আর্তি আছড়ে পড়ে, আর সেই বাতাস আমারই অস্ফুট হাহাকারের প্রতিধ্বনি শুনিয়ে যায়। 'হায় স্বামীজী! আমার ওপর আপনার কত না আস্থা ছিল!'

আমি কোনও দিন ওঁদের—মানে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর আর স্বামীজীকে ক্ষমা করতে পারব না। আমি কিছুতেই স্বামীজীর শান্তিভঙ্গ করতে চাইতাম না—আমি কেবল চেয়েছিলাম, তাঁকে সমস্ত দায় থেকে মুক্ত করে তাঁর বোঝা বহন করতে—অবশ্য তিনি যদি তাঁর কাজ করার জন্য অনুমতি দিতেন। এভাবেই আমি তাঁর চিরবিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলাম। ওঁরা (শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা) ইচ্ছা করলে আমায় কি ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারতেন না? অথবা আমি হয়তো এমন স্বভাবের যাকে সহজে শোধরানো যায় না!

সেন্ট ডোরা ক্রমে সুস্থ হচ্ছেন জেনে বড়ো ভালো লাগল। আশঙ্কা হয়েছিল, হয়তো বা তাঁর অবস্থা এখন চিকিৎসারও অতীত। এখনও জানি না, আশার অবকাশ আছে কিনা। সম্ভবত তিনি ভয় পাননি। এখন তো আরও নয়। আমার চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছেছে কিনা কে জানে।

ইচ্ছে হয়, আমি যেন বড়োরকমের কোনও কাজ করতে পারি। অন্তত আমার আত্মসমর্পণ যেন সম্পূর্ণ হয়—যেন নিশ্চয় করে বুঝতে পারি যে আমার বলতে যা কিছু ছিল, সব নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পেরেছি। বিফলতার চেয়ে মরণ কত না মধুর!

প্রিয় য়ুম, তুমি এখন লন্ডনে। ওরা যেন তোমায় বলে, কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। জীবনকে উপভোগ করা—যে প্রিয়জনেরা তোমার একান্ত আপনার, তাঁদের অথবা অন্য সকলকে আদর-আপ্যায়ন করা থেকে মুক্ত হয়ে কিছুদিনের মতো তুমি অখণ্ড শান্তি আর নীরবতার মধ্যে ডুবে থাক। এটাই আমার য়ুমের সত্যকার পরিচয়—এক চিরমধুর উপস্থিতি—যাকে ভালোবেসে আমরা সকলে কিছু করতে চাই—শুধু সে যদি আমাদের সুযোগটুকু দেয়। যার প্রশান্ত মুখখানি বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ, তার পক্ষে অপরকে দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ত না হলেও চলে। কারণ সে তো ইতিমধ্যে নিজেকে দিয়েই রেখেছে। কিছু না বললেও তার মুখে একটি দিব্য ভাব বিরাজিত, যার কাছ থেকে আমরা শিখতে পারছি যে গভীর নৈষ্কর্ম্যের মধ্যেই রয়েছে প্রচণ্ড কর্মপ্রেরণা। প্রিয় য়ুম, তুমি মনে রেখো, তুমি কোনও দিন ব্যর্থ হওনি। তোমার ভালোবাসা নিখাদ। বাস্তবিকই তুমি ধন্য। তুমি আমায় এটা-ওটা বলে ভুলিয়ো না। আমি সব জানি। না, তুমি কোনও দিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হওনি। তোমার কি মনে আছে, একসময় তোমার শুভেচ্ছাকে আমি গ্রহণ করিনি। আজ আর তা করব না, যেদিন তোমার পাদস্পর্শের সুযোগ হবে, আমি বিনম্রভাবে তোমার আশীর্বাদ গ্রহণ করব। এখন আমায় লেখা থামাতে হবে। কৃস্টিন এখন বয়স্ক মহিলাদের জন্য কাজ করবে—পরিকল্পনা দ্রুত রূপ নিচ্ছে।

রিচ-এর প্রতি তোমাদের স্নেহ-মমতার জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের কথা। তুমি, লেডি বেটি, অ্যালবার্ট—তোমাদের মতো মহিলাদের জানার, তোমাদের সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ ওর জীবনে এ-ই প্রথম। আমি জানি তুমিই তার মধ্যে ভগবদ্‌বিশ্বাস জাগিয়েছ। এটা ওর কাছে এতই পবিত্র যে সে মুখ ফুটে এ-বিষয়ে কিছু বলতে চায় না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। 'খোকা' (Bairn) তোমাদের শুভবার্তা জানাচ্ছে।

তোমাদের চিরস্নেহের সন্তান
মার্গট

॥ তেত্রিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
১৭ মার্চ, ১৯০৪

পরম প্রিয় য়ুম,

ছ-বছর আগে আজকের এই দিনটিতে—সেদিনও ছিল বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীমাকে আমি প্রথম দেখি। আর তারপর তোমাদের সঙ্গে (বেলুড়ের) সেই ‘কটেজে’ ফিরে যাই। তোমার কি সেসব দিনের কথা মনে পড়ে? স্বামীজী বলেছিলেন, তুমি এ পথে এসো, তোমায় আমি কুড়িটা মিসেস বেশান্তের সমান করে তুলব। ‘মার্গারেট’ নামে আমাকে তিনি ওই দিনই প্রথম সম্বোধন করেন। স্টার থিয়েটারে আমার বক্তৃতা ছিল ১১ মার্চ, শুক্রবার।

দেখো, বছরগুলোর বৃত্তে আবার আমরা সেই দিনগুলোয় এসে পৌঁছেছি। আগামী শুক্রবার ২৫ মার্চকে আমার জন্মদিন বলছি, ওই দিন প্রথম আমার নাম হয় নিবেদিতা। বলতে পার, সাত বছরে পড়লাম। আমার এই নবজন্ম তাঁর সেবায় ধন্য হোক। একান্ত প্রার্থনা—সেই সেবায় যেন ফাঁকি না থাকে—তা যেন সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু এটা বোধহয় আমার বড়ো বেশি চাওয়া।

তোমার কি মনে আছে, ‘Chiro’ (বিখ্যাত হস্তরেখাবিদ্) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বিয়াল্লিশ থেকে ঊনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমার মৃত্যু হবে? এখন ছত্রিশ চলছে। মনে হয় এই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে। আমার ধারণা ১৯১২ সালে আমার মৃত্যু। য়ুম, এই কয়েক বছরে কি ভারতবর্ষের অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটবে? যে কোনও ভাবে হোক স্বামীজীর কাজে অন্তত লেগেছি—এটা কি আমি দেখে যেতে পারব? আমি তো কেবল ওইটুকু চাই—ওইটুকুই চেয়ে এসেছি, আর চিরকাল ওইটাই চাইব। স্বামীজীর আরব্ধ কাজের গুরুভার যেন আমি বহন করতে পারি! যদি কোনওভাবে অনুভব করতে পারতাম যে আমি পৃথিবীতে তাঁর কাজের ভার নিয়ে রয়েছি বলে সেই মহান আত্মা আজ স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, সকল দায়বন্ধনমুক্ত—‘আত্মারাম’ তিনি আপন আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন—তাহলে সেই অনুভূতিতেই আমার শাশ্বত স্বর্গসুখ হত। সে পরিতৃপ্তির তুলনায় নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তুচ্ছ।

তুমি হয়তো ভাববে এ আমার অবাস্তব কল্পনা—তবু বলব, য়ুম, স্বামীজী আমার সব দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা ক্ষমা করবেন, আমার ওপর তাঁর অজস্র স্নেহ বর্ষিত হবে—এসবও আমি কোনওদিন প্রার্থনা করি না। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়েও ভাবছি না—আমি শুধু তাঁর দায় বহন করতে চাই—তাঁকে সব ভার থেকে মুক্ত করতে চাই যাতে তিনি ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন। যাঁর সম্পর্কে এরকম স্বপ্ন দেখা যায়—আর জানি সে স্বপ্ন বাস্তব, তিনিই কি স্বয়ং ঈশ্বর নন?!

কয়েক সপ্তাহ চিঠি দিতে পারিনি বলে তুমি মৃদু-মধুর অনুযোগ করেছ। আমি লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতে বক্তৃতা সফরে গিয়েছিলাম, সেইসঙ্গে ছিল প্রকাশকদের কাছে চিঠি লেখালেখি, বিজ্ঞান-গবেষণা কাজের সম্পাদনা। জানি না, আরও কত চিঠি বাদ পড়েছে। আমার উত্তর না পেলে জানবে এইসব কারণেই লিখতে পারিনি। কিন্তু কখনও ধরে নিয়ো না যে, আমার লেখার ইচ্ছা ছিল না বলে উত্তর দিইনি।

এটা কি সত্যিই তোমার অন্তরের কথা যে (স্বামীজীর দেহাবসানের পর) প্রথম আঠারো মাস আমার চিঠিগুলোই তোমাকে দিয়েছে প্রাণের স্পর্শ, ওই চিঠিগুলোই ছিল তোমার আনন্দের একমাত্র উৎস? যদি তা-ই হয়, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব কারণ স্বামীজীর দেহে যখন অগ্নিসংস্কার করা হয় তখন চিতার আগুনের পাশে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছিল স্বামীজী বলছেন, তাঁর মানসকন্যারূপে আমি যেন তোমার প্রতিও চিরবিশ্বস্ত থাকি—তোমার পক্ষে যেমন, ঠিক তেমন আমার ক্ষেত্রেও দুঃসহ বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করা তাহলে অনেক সহজ হবে। ব্রিটানিতে তাঁর সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ হল সেই বেদনার ভয়ংকর তীব্রতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম আর সেই শূন্যতাকে ক্রমে ভরিয়ে দিয়েছিল তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ—এ-যেন মৃত্যুঞ্জয় আত্মার শাশ্বত জীবনে চিরপ্রতিষ্ঠালাভ। তাই বলছি, তোমার এখনকার এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকেও যেতে হয়েছিল—তারপর ভারতবর্ষে যখন ফিরে এলাম সেই চিরন্তন সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্বাস আরও গভীর হল। তাঁর পতাকা হাতে তুলে নিলাম—নতুন করে এখন আর (বিচ্ছেদ-বেদনার) অনুভূতি নেই।

আমি তোমায় অনেক কথা আজ বলতে চেয়েছিলাম—তার বদলে এইসব প্রসঙ্গ মনে উঠল। রোম থেকে তোমার শেষ চিঠি পেয়েছি। এমন ভ্রমণ নিশ্চয়

খুব মনোরম। কিন্তু আমার একান্ত প্রার্থনা, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন এই ভারতবর্ষেই থাকতে পারি। আর্থিক অথবা অন্য কোনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাকে যেন এক মুহূর্তের জন্যও এদেশ ছেড়ে যেতে না হয়। ইতালী ও প্রতীচ্যের অন্যান্য দেশ— সেইসঙ্গে মিশর, ফ্লোরেন্স, রোম প্রভৃতি দেখার বাসনা—এসব যেন এখন কেবল স্বপ্ন মনে হয়। অবশ্য ওই নামগুলো যে গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতি মনে আনে তা কখনওই স্বপ্ন নয় বরং দিনে দিনে তার মহিমা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ছেলেদের মুখে শুনলাম গত ৯ ফেব্রুয়ারি মিঃ ওকাকুরা আমেরিকার উদ্দেশে জাপান থেকে রওনা হয়েছেন। একথা তোমায় বলতে দ্বিধা নেই যে, ফেরার পথে উনি ভারতবর্ষ হয়ে দেশে যাওয়ার প্ল্যান না করলে বাস্তবিক আমি খুশিই হই। তাঁর ভারত আগমনের অসচেতন তাৎপর্য খুবই বড়ো ছিল, সেইসঙ্গে তাঁর লক্ষ্যও ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর সচেতন অভিপ্রাযগুলো সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। আব আমি কখনও সেই আগের ভূমিকা নিতে পারব না—বিশেষত সরলা (সরলা ঘোষাল) ব্যাপারটাকে যেভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছে, তার পরে। এসব কথা বলতে গেলে শুধু যন্ত্রণাই বাড়বে। অতএব কথায় বা আচরণে ওই বিষয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনকে আমি একরকম এড়িয়ে যেতে চাই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁর বইয়ের (Ideals of the East) গুরুত্ব আমি বুঝি। ওই বই অথবা এরপরও উনি যেগুলি লিখবেন তার ভাবাদর্শের কথা মনে রেখে আমি ওঁর বইয়ের কাজে সানন্দে সাহায্য করব। কিন্তু সেই সাহায্যের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের লেশমাত্র থাকবে না। সুতরাং প্রয়োজনীয় সাহায্য সব থেকে ভালো দেওয়া যাবে ডাকযোগে।

যা হোক, আমার মতামতকে তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ো না। ভারতবর্ষ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা বা না করা তাঁর (ওকাকুরার) অভিরুচি। এ-ব্যাপারে তিনি অবশ্যই স্বাধীন। আর প্রয়োজন হলে আমিও নিজের কথা স্পষ্ট করে বলতে জানি।

নিগুর (ওকাকুরা) প্রতি আমার স্নেহের টান আছেই, তাই ওঁকে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। সদানন্দেরও ওই চিন্তাশীল মানুষটির প্রতি পুরোনো সমীহের ভাবটা একেবারে আগের মতো রয়ে গিয়েছে—যদিও সে তাঁর দোষ আমাদের চেয়ে বেশি ভালো করে জানে। সদানন্দ মনে করে, মহৎ

আদর্শ সামনে রেখে যদি তার পরাজয় ঘটে, সে-ও ভালো, তবু হীনস্বভাব ও চারিত্রিক পতন যেন না হয়।

দুমাস এখানে কাটিয়ে মিসেস সেভিয়ার গত ৯ তারিখে কাশী গেলেন। আর গতকাল বেট ইংল্যান্ডের উদ্দেশে পাড়ি দিল। 'P & O Steamer'-এ ও কলকাতা থেকে যাত্রা করে একমাসের মধ্যে লন্ডন পৌঁছাবে এবং আমার মাকে বেশ অবাক করে দেবে। একই জাহাজে একটি শিশু দেশে ফিরছে— ও তার দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছে—তাতে বেট সমুদ্রযাত্রার অর্ধেক পেয়ে যাচ্ছে। এতদিনের হৃদ্যতার বন্ধন ছিন্ন করতে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল। বেচারা! যাওয়ার সময় ওর কী কান্না! কিন্তু ওর সঙ্গে থাকাটা যেন ইদানীং অসম্ভব হয়ে উঠেছিল!

মিসেস সেভিয়ার এখানে থাকতে খোকা (Bairn) একদিন আমাদের চায়ের আসরে যোগ দেয়। তুমি যে ওর ল্যাবরেটরি দেখতে গিয়েছিলে সে প্রসঙ্গ তুলে খুব মজা করছিল। তোমার ফরাসী পোশাকের জাঁকজমক অধ্যাপক বন্ধুদের সামনে ওর কতটা গর্ব বাড়িয়েছিল—এইসব কথা আর কি! আমরা তো হেসে কুটোপাটি!

য়ুম, আজকের মতো বিদায়।

মিসেস হেলিয়ারকে আমার শুভেচ্ছা। তোমার কথা থেকে আমার মনে হচ্ছে খুব সম্ভবত ডাঃ হেলমার ওকে ভালো করতে পারবেন। বেট-এর জাহাজ 'সিরিয়া', জিব্রাল্টার হয়ে যাবে।

তোমার চিরস্নেহের সন্তান
এবং স্বামীজীরও—
মার্গট

পুনশ্চ—বেটের বার্থ নম্বর ১২৭
সেকেন্ড ক্লাস অথবা c/o মিসেস লিস্টার, ফার্স্ট ক্লাস।

॥ চৌত্রিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
২৬ জুলাই, ১৯০৪

প্রিয় য়ুম,

তোমার দুখানি স্নেহমাখা পত্র পেয়েছি। একটি নিউইয়র্ক, অপরটি অরোরা থেকে। এটা কি কম আশ্চর্যের কথা যে, এই চিঠিতে তুমি প্রথম লিখেছ, আগামী শীতে ভারতে আসতে পার, আর আমিও গত বৃহস্পতিবারের চিঠিতে তোমার কাছে ঠিক সেই একই অনুরোধ জানিয়েছি। আমি চিতোর ও অজন্তা যেতে চাই, সঙ্গে যাবে তুমি ও সদানন্দ। কত না আনন্দের হবে। আবার যদি ঝিলাম নদীর তীরে তাঁবু খাটিয়ে থাকার আনন্দময় দিনগুলি ফিরে আসত, ওই দিনগুলির কথা আমার মনে চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—সে স্মৃতির সবটুকুই মধুময়—সেই বৃদ্ধ ভৃত্য, সেই এক ধরনের খাওয়া-দাওয়া, তোমার হুকুম, খুঁটিনাটি সবই কী সুন্দর!

গতকাল বিশেষ করে তোমার কথা খুব ভেবেছি। কারণ স্কুলটিকে সেই পুরোনো বাড়িতেই আবার আরম্ভ করেছি। শ্রীশ্রীমাও এসেছিলেন। আশীর্বাদ করেছেন। যদিও তাঁর এবারের আসাটা ঠিক আগের মতো নয়।

আমি কয়েকজনকে শিক্ষকতার জন্য ট্রেনিং দিচ্ছি। তাঁদের অনুশীলনের জন্যই স্কুলটি খোলা দরকার ছিল। সব মিলিয়ে এত কাজ আছে যে আমার আর অন্য কিছু করার অবকাশ নেই। সপ্তাহে দু-দিন করে কৃস্টিনের কাছে বেশ কয়েকজন মহিলা সেলাই এবং অন্যান্য বিষয় শিখতে আসছেন। তাছাড়া কিছু মহিলা রোজই আসেন সেলাই বা হাতের কাজ করে উপার্জনের আশায়। আগে একথা ভাবা অসম্ভব ছিল যে, বিবাহিত মহিলারা অন্তঃপুর ছেড়ে একজন ইউরোপীয়ানের বাড়িতে কিছু শেখার জন্য আসতে পারে। এখন কিন্তু তাঁরা আসছেন এবং এরজন্য তাঁদের কোনও অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে না।

(২৮ জুলাই), বৃহস্পতিবার, সকাল ৬টা

এই বাড়িতে একটা খিড়কির দরজা আছে অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্য। চিঠিখানি গত মঙ্গলবার দুপুরে আরম্ভ করেছিলাম। এমন সময় আমার ঘরের বাইরে কাশির শব্দ পেলাম। এসপ্ল্যানেড থেকে সেই দারোয়ানটি জেনারেল

মড স্টামের আঁকা নিবেদিতার ছবি
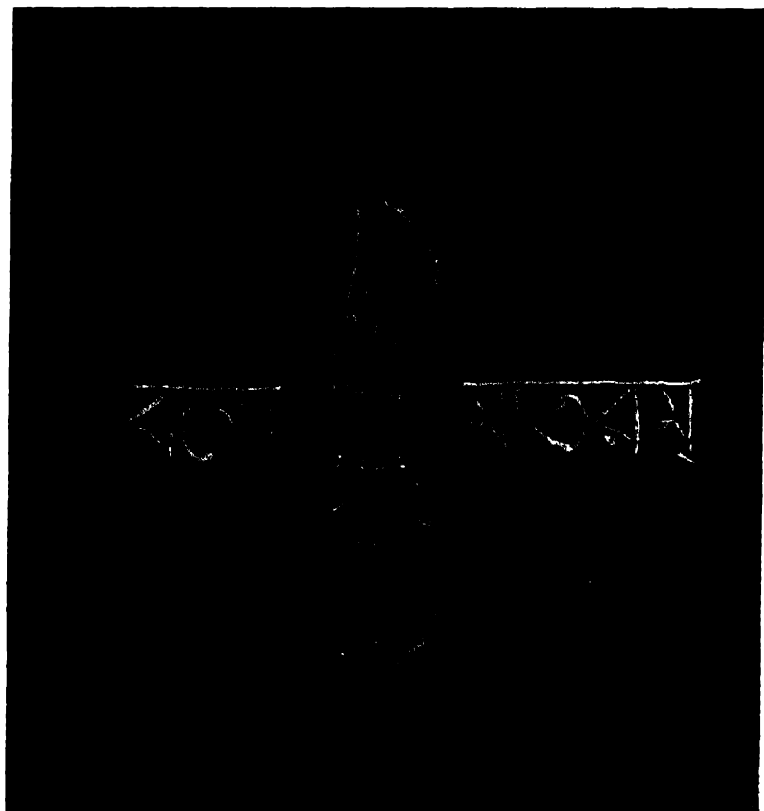
জাতীয় পতাকার নকশা

প্যাটারসনের পত্র নিয়ে এসেছে। কেমন করে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমরা সকলেই আমার প্রতি কত না সদয়, কিন্তু আমি তো অসুস্থ হইনি। এত ব্যস্ত ছিলাম যে ছুটির মধ্যে মাকে চিঠি লিখে উঠতে পারিনি। তাই কৃস্টিনকে অনুরোধ করেছিলাম আমার হয়ে মাকে পত্র লিখতে। এতেই সকলের মনে হয়েছে, আমি অসুস্থ বলে নিজে পত্র লিখতে পারিনি। এতসব কাণ্ডের জন্য আমি খুবই দুঃখিত, আর ভয় হচ্ছে যে তুমিও আমার অসুস্থতার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছ।

আহা, তুমি যদি এখন একবার সদানন্দকে দেখতে! তাকে আজকাল অনেক সুস্থ দেখায়। তার ডায়াবেটিস রোগটিও একটু কমের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, এখন সে অনেকদিন বাঁচবে ও কাজ করে যাবে। সদানন্দের নিজস্ব একটি আলাদা ঘর হওয়ার ব্যাপারটা তার স্বাস্থ্য ফেরাতে যতটা সাহায্য করেছে ততটা আমাদের ইংলিশ মাখন-রুটি বা অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য করেনি। আহা! হিন্দুরা একলা নিজের মনে থাকার জন্য কত না ব্যাকুল। তাঁরাই যে ধ্যানধারণার বিষয়টি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, এতে আর আশ্চর্য কী!

আমার খুব আনন্দ হল এটা জেনে যে, বইটি (The Web of Indian Life) তোমার ভালো লেগেছে। আমারও মনে হচ্ছে আমেরিকান সংস্করণ আরও বেশি সুন্দর হয়েছে। বইটির এক কপি এখানে এসেছে। কৃস্টিন তো বই দেখে একেবারে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু মজা হল যে, আমাকে কেউ কোনও খবর দেয়নি। না প্রকাশক, না অন্য কেউ। তাঁরা মিসেস বুলকে লিখেছেন যে, রুডইয়ার্ড কিপলিঙ এবং এফ.এ. স্টীলের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদেরও বইটি ভালো লেগেছে। অথচ আমাকে তাঁরা একটিও খবর দিলেন না!

আপাতত আমার মনে হচ্ছে, প্রায় কেউ-ই বইয়ের ভিতরের ভাবটিকে ধরতে পারেনি। কেবল যাদের কাছে আমি একসপ্তাহ ধরে বিষয়টির ওপরে বক্তৃতা করেছিলাম, হয়তো তারা বাদে। প্রিয় য়ুম! সেইদিন তুমি আমাকে সব থেকে সুখী করবে যেদিন তুমি বইটির মধ্যে ডুবে গিয়ে তার ছত্রে ছত্রে স্বামীজীকেই আবিষ্কার করবে। আমি অপরের জন্য কাজ করেছি তাদের হাত বা যন্ত্র হয়ে। কিন্তু একমাত্র স্বামীজী আমার সমস্ত হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং আমার অস্তিত্বের সবটুকু দাবি করেছেন। আর এগুলি সব তাঁরই কাজে নিয়োজিত হবে বলে রেখে গেছেন। সবরকম সেবাই মহৎ এবং তা মঙ্গলসাধন করে। কিন্তু স্বামীজীর কাজ মানে সর্বস্ব-অর্পণ, কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে পূর্ণ বিশ্বাস।

তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে আমাকে বড়ো কম সময় দিয়েছেন। তোমার কি মনে পড়ছে বেলুড় মঠের লনে বসে তাঁর সেই কথাবার্তা—যখন তিনি বলেছিলেন, "তোমরা এসো এ পথে। আমি এক-একজনকে কুড়ি জনের সমান করে দেব।" এখন আমি বুঝতে পারছি তিনি এমন কারও জন্য অধীর হয়েছিলেন যাকে তিনি আপন চিন্তা ও মনের অংশীদার করতে পারেন। আমি যেন নিজের স্বভাবটি শক্ত করে নিয়ে (সে চিন্তার) একটি কণাও হারিয়ে না ফেলি। রিজলিতেই তাঁর কাছে আমার ট্রেনিং পর্ব শেষ হল, আর তিনি আমাকে জগৎ-রঙ্গমঞ্চে পাঠিয়ে দিলেন। সবশুদ্ধ বড়ো জোর দু-বছর হবে—এবং সেটুকুই সব। আর স্বামীজীকে বা তাঁর মতামতকে কীভাবে গ্রহণ করব এই বিষয়ে আমি এখন বড়ো স্পর্শকাতর ও কারও একটি কথাও সহ্য করতে পারি না। পাখির যেমন মুক্ত বাতাসের প্রয়োজন, আমারও তেমনি এই ব্যাপারে চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। যখন সব আলাপ-আলোচনা থেমে যাবে, কেউ একবারের জন্যও সমালোচনা, উপদেশ বা নিন্দা করার স্পর্ধা করবে না, (অন্তত আমার সামনে) তখনই আমি জানি—ও প্রিয়তম জননী য়ুম, তুমিও বুঝতে পারবে যে, এই কাজের সবটুকুই স্বামীজী, কেবল স্বামীজী এবং স্বামীজী ছাড়া আর কেউই নন। কারণ স্বামীজীর বাইরে আমার আর কিছুই নেই।

মনে কর, স্বামীজী যদি সেই সময়ে লন্ডনে না আসতেন! জীবনটা একেবারে নিরর্থক হয়ে যেত। সবসময় মনে হত, আমি যেন একটা মহান আহ্বানের প্রতীক্ষায় রয়েছি। বার বার বলে এসেছি যে, আমার কাছে ডাক আসবে—আর সত্যি এলও তাই। যদি আমি জীবন সম্বন্ধে বেশি অভিজ্ঞ হতাম, তাহলে সুযোগটি এলেও আমার মনের সংশয়ের জন্য তা চিনে নিতে পারতাম না। সৌভাগ্যবশত আমি এত কম জানতাম বলে বহু যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছি। যখন বইটির দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই আমি ভাবি, "যদি তিনি লন্ডনে না আসতেন!" আমার ভেতরে জ্বলন্ত উদ্দীপনা কাজ করত, অথচ একটি কথাও আমি উচ্চারণ করতে পারতাম না। কতবারই না আমি কলম হাতে নিয়ে বসেছি কিছু বলব বলে, কিন্তু সবই বৃথা, একটি আঁচড়ও কাটতে পারিনি। অথচ আজ যেন কথার আর শেষ নেই। আজ যেমন আমি জগতের জন্য উপযুক্ত হয়েছি, তেমনি জগতেরও নিশ্চয় আমাকে প্রয়োজন আছে। জগৎ প্রস্তুত এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এতদিনে তীরটি ধনুকে তার যথার্থ স্থান খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু যদি তিনি না আসতেন! যদি

তিনি হিমালয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন—যেভাবে আমাদের প্রাজ্ঞ ক্যাপটেন সেভিয়ার তাঁকে দেখতে চাইতেন—তাহলে আমার কখনও, কোনও ভাবেই ভারতে আসা হত না।

ফোটোতে তোমাকে বেশ সুস্থ ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। আশা করি আমার এই ধারণা ভুল নয়। এই স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্য কত না চেষ্টা হয়েছে। শরীরের সহ্যশক্তি কম হলে আমরা কারও যন্ত্র হওয়ার বদলে বোঝা হয়ে উঠি। সেই অবস্থাটি যে কতখানি দুর্ভাগ্যের তা ভাষায় বোঝানো যায় না। বেচারা অ্যালবার্টের চিঠি পড়তে পড়তে বুঝতে পারছি যে, সে এই অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। তার চিঠির প্রতি ছত্রে দৈহিক সামর্থ্যের অভাব বোঝা যাচ্ছে।.... আবৃতমস্তকে ও নগ্নপদে মঠজীবন যাপন করা তার পক্ষে উপযুক্ত নয়। আমি মনে করি স্বামীজী তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন দেখতে পেয়েছিলেন ও আশীর্বাদ ঢেলে দিয়েছিলেন।

প্রিয় জননী, এবার বিদায় নিচ্ছি।

ইতি
তোমার সন্তান
মার্গট

পুনশ্চ—আমাদের জন্য একটা পার্সেল আসছে জেনে আমি কত না খুশি। কৃস্টিনের জন্মদিন আসছে ১৭ আগস্ট।

অনুভূতির আলোয়

নিম্নলিখিত পত্র চারখানির তারিখ যথাক্রমে ১৯০৬ সালের ১২ এবং ২৪ জানুয়ারি ও ৩০ মে এবং ১৯০৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে স্বামীজীর 'অগ্নিময়ী বাণী' প্রচার করে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। সেইসঙ্গে চলছিল লেখার কাজও। তাঁর বিশ্বাস স্বামীজী তাঁর হাত ধরে লেখাচ্ছেন এবং রচনাগুলি স্বামীজীরই সৃষ্টি। ক্রমশ তিনি উপলব্ধি করেন বক্তৃতা নয়, গ্রন্থরচনার মাধ্যমে স্বামীজীরই কাজের ভিত্তি দৃঢ়তর হবে এবং তার প্রভাব হবে দীর্ঘস্থায়ী। আমরা দেখেছি ১৯০৪ সালে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর একটি জীবনী লেখার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন নিবেদিতার ওপর। নিবেদিতার ধারণা স্বামীজীর মতন মহান ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর মহাপ্রয়াণের পর আরও সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন। স্বামীজীর দেহাবসানের পর প্রায় চার বছর হতে চলেছে। এবার গ্রন্থরচনার কাজে হাত দিতে হবে। স্বামীজীর জীবনী রচনার প্রেরণা তাঁর হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত ছিল। প্রথম পত্র তিনটিতে তারই অনুপম প্রকাশ।

এই পত্রগুলি পাঠে আরও জানা যায়, কেবল স্বামীজীর জীবনী রচনার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের জন্য আনুষঙ্গিক বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে কী বিপুল অবদান ছিল মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস ওলি বুলের। ওই সময় বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে নিবেদিতা জগদীশ বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গ্রন্থটির সম্পাদনাও করছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, ওই কাজের মাধ্যমে ভারতকে পাশ্চাত্যের কাছে যথোচিতভাবে তুলে ধরা যাবে, যা স্বামীজীর একান্ত অভিপ্রেত। প্রিয় বান্ধবী য়ুমকে লেখা শেষের চিঠিটিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন কেমন করে সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরি করার স্বপ্ন দেখছেন। আরও নানান কথার মধ্যেও ঝিলমের তীরের সেই আনন্দময় দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার আর্তিও তিনি প্রকাশ করেছেন। এই চিঠির

সঙ্গে শ্রীসারদা মঠে সংরক্ষিত নিবেদিতার তৈরি পতাকা ও মড স্টামের আঁকা নিবেদিতার original পোট্রেটের ছবি দেওয়া হল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

শুক্রবার সকাল
১২ জানুযাবি, ১৯০৬

প্রিয়তম সেন্ট সারা,

তোমার সস্নেহ কিন্তু বিষাদভরা পত্রখানি গত মঙ্গলবার সাঁচীতে পেয়েছি। বলো তো আমি এখন কোথায় আছি? চিতোরে। যদি কোনওদিন 'Pages from Indian History' ('ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে') নামে বইখানি লিখে উঠতে পারি, তাহলে কী অপূর্বই না হবে!

তুমি ইউরোপের যে-কোনও জায়গায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি আছ। যদি আমি চাই তো অ্যাসিসিতেও হতে পারে। তখন থেকেই চিন্তা করছি, আর আমার মনে হচ্ছে, স্বামীজীর জীবনী লেখার পক্ষে জায়গাটি আদর্শ হবে। আমি যদি অ্যাসিসিতে তিন-চার মাস শুধু তোমার সঙ্গে একা থাকতে পারি, তাহলে সেই অবকাশটুকু স্বামীজীর বইটি লেখার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার কী মনে হয়? ওখানকার আধ্যাত্মিক বাতাবরণ স্বামীজীর জন্য মহৎ কিছু করার পক্ষে নিশ্চয় সহায়ক হবে। জায়গাটি গ্রীষ্ম ঋতুতে খুব বেশি গরম হবে কি? আমার বিশ্বাস, খুব একটা না।

এবার খোকার (Bairn) কথা। আমি অনুভব করছি আমি নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না, নিয়তিই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এ-বছরই আমার যাওয়া উচিত। আগে ভেবেছিলাম নেপ্‌লস বা জিব্রাল্টারের ভিতর দিয়ে সোজা তোমার কাছে যাব—এখন মনে হচ্ছে এটাই বেশি ভালো। তারপর লন্ডন বা বস্টনে ফিরেই বক্তৃতা শুরু করতে পারব এবং আরও কিছু করার চেষ্টা করব। যতক্ষণ না বইটি লেখা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ এই কাজটির ব্যাপারে তোমার অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমাকে আশ্বস্ত করেছে। আমার বিশ্বাস এর সঙ্গে আরও দু-একটি ওই ধরনের বাড়তি কাজও করা সম্ভব হবে। তারপরই (বিদ্যালয়ের) কাজ, অর্থ-উপার্জন এবং বিজ্ঞানচর্চা। প্রিয়

সেন্ট সারা, এখন যেন আমার ভবিষ্যৎ জীবনটিকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমি যা খুঁজছিলাম সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন বেনারসে এক জ্যোতিষী। আমার একটি মাত্র চিন্তা হল এই গ্রন্থরচনার ভিতর দিয়ে কী করে স্বামীজীর কাজটিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যায়। তারপরে জীবনের বাকি বছরগুলি অন্যান্য কর্তব্যে নিযুক্ত থাকব। চিন্তা করতে কত ভালো লাগছে যে তুমি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পার এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দাও। আর এ-ও জানি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর বলেই সাহায্য করবে। তোমার কি মনে আছে, স্বামীজী আমাকে সবকিছু একটু আগে আগে ভাবার এবং পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন? কারণ ব্রিটানি-বাসের শেষ মধুর সন্ধ্যায় এই কথাটি বলেছিলেন, "এ-সবই তো মা।" যদি আমার মৃত্যু হয় আমি আশা করব তুমি খোকাকে (Bairn) নিয়ে ব্রিটানি যাবে। তাকে সেই বাগানটি দেখাবে, যেখানে আমি স্বামীজীর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ ও শেষ আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম—যে-আশীর্বাদের ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে তাঁর বাণী প্রচারের উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন। তোমাকে ধন্যবাদ, আমি জেনেছি পৃথিবীর পথে পথে অজস্র দেবালয় আছে, তোমাকে আরও ধন্যবাদ তোমার জন্যই আমি ব্রিটানি, লায়সন, কংকর্ড দর্শন করতে পেরেছি, এখন বোধহয়, অ্যাসিসি, আয়ার্ল্যান্ড, ডিভনশ্যায়রও দেখব—এগুলো—সবই তো আমার কাছে স্বপ্নের মক্কা!

এই বাড়ির চারিদিকে সোঁ সোঁ শব্দ করে বাতাস কেঁদে চলেছে। তোমার মনে হবে এ-যেন এই দেশের জন্য বহু পূর্বে মৃত আত্মাদের বিলাপ। হে মহান আত্মা! তোমরা শান্ত হও! ঘোর অন্ধকারময় রাত্রি। কিন্তু আলো আসবে—আর সত্যিই মায়ের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া পাওয়া যাবে। তাঁর জন্য জীবন বলি দেওয়া হবে এবং নতুন জগতে সূর্যোদয় ঘটবে।

প্রিয় সারা—দূরে থাকার জন্য তোমার কষ্ট ও আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা যে কত বেশি, আমি বুঝতে পারছি, আগেই জানতাম এইরকমই হবে। এমনকি যখন তুমি সব থেকে সুখী এবং আশায় ভরপুর ছিলে—তখনও আমি জানতাম। সর্বদাই দেখা গেছে যারা জগতের কাজের জন্য আহূত হন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হতে দেওয়া হয় না, পাছে তাঁরা তারই মধ্যে ডুবে যান। তুমি কি জান—আমি কী ভাবি? আমি ভাবি তুমি যদি শান্ত ও প্রসন্ন মনে পরিস্থিতি গ্রহণ করতে পার এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে নিজেকে

নিয়োজিত রাখ, তাহলে ওলিয়ার বেশিদিন বেঁচে থাকা ও সুখী হওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু তোমার তিলমাত্র বিভ্রান্তি ওলিয়ার পক্ষে মারাত্মক হবে। যেমন করেই হোক, তুমি যদি এভাবে চিন্তা করতে পার, তাহলেও তোমার পক্ষে ভালো। Bairn-কে বলো আমাকে তোমার দরকার, তাহলে তাকে ছেড়ে দূরে যাওয়া সহজ হবে।

প্রিয় সারা, আমার সম্বন্ধে তুমি, মিসেস জেমস ও ম্যাডাম ক্রপট্কিন যে উচ্চ ধারণা করেছ, তা যদি সঠিক হত তবে আমি খুব খুশি হতাম। যে-মুহূর্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমি ভয়ংকর অসহিষ্ণু হয়ে যাই এবং দেখতে পাই যাঁরা আমার সংস্পর্শে আসেন তাঁদের কতখানি ধৈর্য ও আত্মসংযমের প্রয়োজন হয়।

আমি জানি যে, সম্পদ ও বিশিষ্ট খ্যাতির অধিকারিণী হওয়া একটা বোঝাস্বরূপ। তবুও ষাট বছর বয়সে তুমি নিজেকে সবকিছু থেকে সরিয়ে একটি কুটিরে আশ্রয় নেবে, এই চিন্তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মনে হয় আমাদের চেয়ে তোমার হাতে টাকা থাকলে কাজের পক্ষে বেশি মঙ্গল। মনে রেখো, আমি টাকা খরচ করার প্রস্তাব করছি না, কী ধরনের কাজে টাকাটা লাগালে ভালো হয়, আমি শুধু তাই বলছি। অনেক টাকা যথাযথভাবে খরচ করার শক্তি আমার মধ্যে নেই। কিন্তু একটা জিনিস আমি ভাবি—৩,০০০ পাউণ্ড ভারতবর্ষে কোনও মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে বলব—যেটা দেবেন (দেবেন্দ্রমোহন বসু), ও খোকার (অরবিন্দ বসু) বিবেচনা মতো খরচ হবে। এই টাকাটা আর একটি, কাজের জন্য দেওয়া যেতে পারে—যথা, ইতিহাসের অথবা প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে। (গঙ্গেশের বিবেচনা অনুসারে খরচ হবে)

এটা আমরা একসঙ্গে পরে আলোচনা করতে পারি।

তোমার স্নেহের মার্গট

॥ ছত্রিশ ॥

কলিকাতা
২৪ জানুযারি, ১৯০৬

প্রিয় য়ুম,

আমার একমাস ভ্রমণের পর লেডি বেটির পত্রের সঙ্গে তোমার ভালোবাসা-ভরা সুদীর্ঘ পত্রটি পেয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করলাম। এবার সদানন্দ আমার সঙ্গে ছিল। এই ভ্রমণে তারও উপকার হয়েছে। তবে শুনেছি তাঁর এই অসুখ ভালো হবে না। এবং আর একটি ছেলে ছিল যে কৃস্টিনের কাছ থেকে শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছে—আশা করি সেটা সে তার কাজ দিয়ে শোধ করে দেবে। আমি ববির কথা শুনে খুবই দুঃখিত ও বিব্রত। তাকে তার আপন জায়গায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া ভালো যেখানে চেষ্টা করে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কিছু হারানোর থেকে অপরকে দিয়ে দেওয়া অনেক উদারতার পরিচয়।

তুমি যদি আমার ডেস্কের ওপরে রাশি রাশি জমে থাকা কাজ দেখতে পেতে! এবার স্বামীজী আমাকে বেনারসে তাঁর জন্য সত্যিই কিছু করতে দিয়েছেন। আমি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছি যার ফলে স্বামীজীকে এবং তাঁর কাজকে সেখানকার লোকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাতে পরোক্ষভাবে এস.কেই সাহায্য করা হয়েছে। স্বামীজী সত্যিই এই কাজকে আশীর্বাদ করেছেন। স্বামীজী যখন আমাকে তাঁর সামান্যতম বোঝাটুকু বইতে দেন, সে যে আমার পক্ষে কতখানি তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। মিসেস বেশান্তকে সভানেত্রী করে তাঁর প্রতিষ্ঠানেও বক্তৃতা দিয়েছি—আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খুব মধুর হলেও, মনে হল তাঁর ভিতরের অগ্নি নির্বাপিত হয়ে তাঁকে ভস্মে পরিণত করেছে। তিনি এখন মৃত বললেই হয়।

তোমাকে কি বলেছি আমি কোথায় গিয়েছিলাম? আমি কংগ্রেসের সভায় যোগ দিতে বেনারস যাই। সেখান থেকে সাঁচী, ভূপাল, উজ্জয়িনী, চিতোর, আজমীর, লেগপোর, আগ্রা, এলাহাবাদ হয়ে আবার বেনারস। তুমি কি এটাকে একটা বড়ো মাপের ভ্রমণ মনে করতে না? আমি গোয়ালিয়র ও এস. (?)-কে বাদ দিয়েছিলাম কারণ প্রথম দিকে আমার ততখানি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহস ছিল না। তোমার কি সেই রাতের কথা মনে পড়ে যেদিন প্রথম

আমরা একসঙ্গে তাজমহল দেখেছিলাম? এখন তাকে অনন্ত গুণ সুন্দর লাগছে। শাজাহানের প্রেমিক হৃদয়কে এখন বুঝতে পারছি—সেটা কি আমার মন অনেক পরিণত হয়েছে বলে? শাজাহানকে সদানন্দ 'প্রেমের ভিখারি' বলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাজমহল দেখছিলাম, আমার চোখের সামনেই দিনের তাজ মিলিয়ে গেল। রাতের সিংহাসনে সেই তাজমহলই অনেক বেশি জ্যোতির্ময় হয়ে আবির্ভূত হল। মনে হল ভারতমাতার ললাটে সুন্দর মুক্তাখচিত মুকুট স্থাপিত হয়েছে। অনুভবী হৃদয়ের কাছে তখন এই সত্যই প্রমাণিত হল যে স্থাপত্যকীর্তির চেয়ে প্রেমের আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বায়ন অনেক মহৎ। বাস্তবিক ভারতের সম্রাট হওয়া, প্রিয়তমাকে বিশ্বের সম্পদ দিয়ে বিভূষিত করা—স্বপ্নের মতো বিস্ময়কর। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তো অন্যের 'সৌন্দর্য চিন্তা'র মধ্যে বিচরণ করে—এবার ভাবি সেই স্রষ্টার কল্পনার কথা, যাঁর চিন্তা ও জ্ঞান তাঁর প্রেমের আনন্দের সঙ্গে এক হয়ে মিলে গিয়েছে।

এখন একটি কথা বলব কেবল তোমার জন্য। আমার বিশ্বাস, এবার শুরু হল আমার কাজের শেষ সাত বছর। এখন আমি বলতে পারি, আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং পরিপূর্ণ শান্তি পেয়েছি। নিশ্চিতভাবে অনুভব করছি আমি ঠিক পথেই পা ফেলেছি যে-পথ স্বামীজীর অনুমোদন ও আশীর্বাদ লাভ করেছে। সুতরাং এখন একটিমাত্র প্রশ্ন—তাঁর নির্দিষ্ট পথে যথাযথভাবে কাজ করে উঠতে পারব কিনা। যখন বুঝলাম বক্তৃতা থেকে রচনার শক্তি আমার বেশি, তখনই শান্তি এল। সুতরাং আমার কাজ শুধু লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে আর আমি উদ্বিগ্ন নই। তুমি লেডি ইসাবেলের যে নোটটি পাঠিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ। আমি স্বামীজীর কাজ করতে পেরেছি—এই কথাটি শুনতে আমি যে কতখানি উৎসুক তা বলতে পারি না। অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে আমার কাছে এটা স্পষ্টতর হচ্ছে—যে-মানুষটির কথাগুলি আমার স্মৃতিতে সত্য বলে উজ্জ্বল, যিনি আমাকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি হলেন সেন্ট ডোরা (রথলিসবার্জার)। আমার যা জানার খুব দরকার ছিল, তিনি সেই কথাটাই আমাকে বলেছিলেন এবং আমি ওই কথাগুলির কাছে এখন আত্মসমর্পণ করছি।

আমি ম্যাডাম Wallerstein-এর কাছ থেকে দুটো মিষ্টি চিঠি পেয়েছি। তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমশ বাড়ছে। মিস হ্যারিসকে আমার ভালোবাসা দিয়ো। স্বামীজীর বিষয়ে তাঁর ধারণাকে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস

করি। অপরের অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি, কারণ আমার স্বভাব তোমার বিপরীত, অন্যের অনুভূতি আমার কাছে প্রায় নিজের অনুভূতির মতোই সত্য।

প্রিয় য়ুম, আমার মনে হচ্ছে আমি এই বছর ইউরোপে যাব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কীভাবে যাব তা পরিষ্কার নয়। এস. সারা সবসময়ই বিশ্বাস করে যাচ্ছে যে আমি আসব। কিন্তু এদিককার ঘটনা বোঝা এত সহজ নয়—যেমন, অন্যদের পথে যেসব রাজনৈতিক বাধা আসবে সেগুলি কীভাবে অতিক্রম করা যাবে ইত্যাদি। সুতরাং এখন কোনও পরিকল্পনা করতে সাহস করছি না। কিন্তু আমি এস. সারার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে অ্যাসিসিতে গিয়ে স্বামীজীর জীবনী লিখতে পারলে খুব আনন্দিত হব। আর একবার, ডিভনশ্যায়রের প্রিমরোজগুলিও দেখতে ইচ্ছে হয়। এছাড়াও মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যেন একটা আহ্বান শুনতে পাচ্ছি—আমাকে পাশ্চাত্যে যেতে হবে এবং ঘোষণা করতে হবে বিশ্বের সকল জাতির অগ্রগতিতে স্বামীজীর অবদান ও তাঁর বাণীর সারমর্ম কী!

তোমার টাকাকড়ি নিয়ে প্রশ্নের উত্তর আমি পরের চিঠিতে দেব।

তোমার চির স্নেহের সন্তান

মার্গট

পুনশ্চ—প্রিয় য়ুম, তুমি আমার চিন্তাটাকে অশোভন মনে করো না। আমার রচিত যে-পুস্তিকাটি তার ভালো লেগেছে সেটার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। তুমি কোনও এক সময়ে লেডি ইসাবেলকে বলো—এবং তাঁর এই ধারণাটা সংশোধন করে দিয়ো।

ভালোবাসা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও অপরের দুঃখের প্রতি সহানুভূতিকে ভিত্তি করে ওই পুস্তিকাটি রচিত হয়েছিল।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

মুসৌরি থেকে
ঠিকানা—কলকাতা
৩০ মে, ১৯০৬

প্রিয়তম য়ুম,

আমি যেতে পারি শুনেই তুমি আমাকে স্বাগত জানিয়ে সপ্রেম পত্র দিয়েছ। আমি এখনও আশা করছি, সেন্ট সারা আমেরিকায় ফিরে না গিয়ে আগামী শীতে এখানে আসবে। ভাবছি আগে খুব অযোগ্য ছিলাম কি? আমি শুধু জানি আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। যদি কাজ ঠিকমতো করতে হয়, তবে আমাকেই তা পরিচালনা করতে হবে। খুবই আশ্চর্য হচ্ছি, এই কথাটা বুঝতে আমার এত সময় লাগল! যদি এস. সারা আসেন, আমি কথা দিচ্ছি তাঁকে আর কারও ওপর নির্ভর করতে হবে না। বেচারা মিঃ প্যাটারসন! তোমার কি মনে হয় তিনি বাঁচবেন না? যদি না বাঁচেন তাহলে মিসেস প্যাটারসনের পক্ষে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

হলিস্টারের বিষয় একটা খুব ভালো খবর দিয়েছ! আমি যে কী খুশি হয়েছি তা বলার নয়, আর মিঃ ক্রম্পটন কত-না ভালো!

গ্রন্থটির (স্বামীজীর জীবনী) প্রথম অধ্যায়ের ওপর তুমি যা বলেছ তাতে আমি খুব খুশি। আমি জানি, যদি আমি সফল হতে পারি তবে এটাই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ। আসল কথা হল, আমাকে কিছু দিতে হবে। ক্রমশ আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি, আমি যে শিক্ষা পেলাম, তা প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেওয়া নয়, যে-কোনও ভাবে হোক, সে শিক্ষা আমার মাধ্যমে সমগ্র ভারতের প্রজন্মকে দেওয়া হয়েছে। আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে শুধু বিশ্বাস করতে চাইছি—তিনি প্রতিটি ছত্র আমার হাত ধরে লেখাবেন, যার ফলে তাঁর জীবনের শাশ্বত দিকগুলির কথা প্রকাশ করতে পারব এবং আর সবকিছু দ্বিধাহীনচিত্তে নির্দয়ভাবে বাতিল করতে সক্ষম হব। কিন্তু তুমি জান না, এই কাজটি করতে গিয়ে প্রতিমুহূর্তে আমি কতখানি শিখছি। যেভাবে হোক, আমি বুঝতে পারছি যারা একদিন স্বামীজীকে আঘাত করেছিল তাদের সকলকে ক্ষমা করতে হবে। আমি যদি তাদের দোষগুলিকে প্রকাশ করে দিই, সে ক্ষমতাও আমার আছে এবং সে শাস্তি তাদের প্রাপ্য, তবু এভাবে স্বামীজীর পাশে এই মানুষগুলিকে স্থান করে দিলে শুধু স্বামীজীর

অম্লান চরিত্রকেই কালিমালিপ্ত করা হবে না—তারাও অমর হয়ে যাবে। তাদের প্রতি নিক্ষেপ করব বলে আমার পকেটে দীর্ঘদিন ধরে যে প্রস্তরখণ্ডগুলি সঞ্চয় করেছিলাম, সেগুলি আজ ফেলে দিতে হচ্ছে।

আমাদের প্রিয় অ্যালবার্টা ইতিমধ্যে মা হয়েছে এবং তুমি মাতামহী হয়েছ—আমি এই বিষয়ে আরও সংবাদের জন্য উৎসুক।

চিরস্নেহের
নিবেদিতা

পুনশ্চ—এখনও পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধটি লিখে উঠতে পারিনি বলে দুঃখিত!

॥ আটত্রিশ ॥

১৭ নং বোসপাড়া লেন
বাগবাজার,কলকাতা
৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫

প্রিয় য়ুম,

আমি আশা করেছিলাম তুমি বেন্টন স্ট্রীটে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম করবে। কিন্তু তা হল না, আবার তোমায় চলে যেতে হল।

আমার ভয় হচ্ছে, লণ্ডনের ঘন কুয়াশা তোমায় বিষণ্ণ করছে, এটা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ। তুমি যদি প্রকৃতিকে ভালবাসতে, আমি তোমাকে নানান পরামর্শ দিতে পারতাম কিন্তু হায় তুমি তা নও।

আমার ডেস্কটা যেন একটি বাগানের মতো, একটা টিউব রোজ যার বাঙলা নাম রজনীগন্ধা, একটা mignonette আর ছোটো ছোটো তিনটে প্যান্সি মিলে কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে। তুমি অবশ্য মনে রেখো যে 'Puvis de Chavannes'-এর যে-কোনও ছবির প্রিন্ট-এর সুলভ সংস্করণ আমি কীভাবেই না চেয়েছিলাম! আমায় তাঁর জীবনী ও চিন্তাধারা সম্পর্কিত কিছু লেখা পাঠাতে পার, যা আমি ইংরোজিতে প্রকাশ করতে পারি।

আমি লিখেই চলেছি, চেষ্টা করছি শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দিতে, আর করছি সূচীশিল্পের নকশা—যেটা করতে আমার খুব ভালো লাগে। আমরা জাতীয় পতাকার একটা নকশা তৈরি করেছি—যাতে থাকবে একটা বজ্র—ইতিমধ্যে

একটা তৈরিও করে ফেলেছি। দুর্ভাগ্যবশত একটা চিনা যুদ্ধপতাকার ছবিকে আমার আদর্শ করায় আমি লালের ওপর কালো দিয়ে নকশাটা করেছিলাম। কিন্তু ভারতবর্ষের কাছে এটা কখনওই গ্রহণযোগ্য হবে না। পরেরটা তাই টকটকে লালের ওপর হলুদ দিয়ে করা হবে। আমার মনে হয় এটাই হবে ভবিষ্যতের রঙ। মাকে দু-পাউন্ড পাঠিয়ে বিভিন্ন রঙ পছন্দ করে কিনে দিতে বললে খুব ভালো হবে। মা আমাকে তাঁতিদের কাছ থেকে হলুদ আর সবুজ রঙের চমৎকার কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিল। আমি গাঢ় রঙের গুলো ব্যবহার করেছি। কিন্তু গাঢ় হলুদ, সবুজ আর বেগুনি রঙের কাপড়গুলো ঢাকা হিসেবে বেশি উজ্জ্বল আবার লাইনিং-এর পক্ষে বেশি মোটা। এবছর লিবার্টির ছাঁটকাটের জন্য ঠিকসময়মতো তাঁকে বললে হত, কিন্তু বোধহয় এখন অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। আমরা টেবিলের ঢাকা, বইয়ের ঢাকা, কুশন, আর পুজোর সাজের জন্য টুকিটাকি জিনিস ইত্যাদি তৈরি করছি। যেমন ধরো, কৃস্টিন এইমাত্র স্বামীজীর ছবির সামনে সাজাতে নীল আর সাদা আইরিস ফুলের নকশা তোলা চারচৌকো কাপড়ের ফরমাস করেছে। মায়ের রুচিবোধের কোনও তুলনা নেই। মা যদি একবার ঠিকঠাক জানতে পারে কী ধরনের জিনিস প্রয়োজন তবে মা সেটা ঠিক খুঁজে বার করবে, যা আর কেউ পারবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাড়াহুড়ো না করে যেটা যেখান থেকে সংগ্রহ করলে ভালো হয়, তাই করা উচিত।

ভয় পাচ্ছি হয়তো জাপানি সোনালী সুতোর জন্য তাঁকে লিখতে হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারটা আমাকে খুবই দুঃখ দেবে কারণ আমি চেয়েছিলাম এই পতাকার সবটুকুই হোক ভারতীয়। একথা লেখার আগে আরও কদিন অপেক্ষা করে দেখতে চাই।

লিবার্টির লিনেনের কাপড়গুলো বেশ ভালো, অবশিষ্ট ছাঁটকাটগুলোকেও কাজে লাগানো যায়।

তোমার চিঠিতে এসব এলোমেলো কথা বলার মানেই হয় না। মড স্টাম আমার যে ছবিটা এঁকেছিলেন শুনেছি তার একটা ফোটো নেওয়া হয়েছিল। সেন্ট সারাকে তার দু-একটা কপি পাঠানোর জন্য লিখেছি। এ ছবিটা সবার এত ভালো লাগছে যে আমি কথা দিয়েছি যে অন্য কোনও ছবি ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু আমেরিকান পত্রিকায় আমার যে ছবিটা প্রায়ই ছাপা হয়, সেটা খুব ঝাপসা। তাই ওরা আমার কাছে একটা ভালো ফটো চেয়েছে যা থেকে ওরা কপি করতে পারে।

এটা একটা চিঠি? তুমি হয়তো ভাবছ এ চিঠিটা আমি না লিখলেও পারতাম। যদি তোমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা না হয়, আমাকে লেখা বন্ধ করে দিতে হবে।

সেই ঝিলমের তীরের দিনগুলোতে যদি ফিরে যেতে পারতাম, যখন রাতে কথা বলতে বলতে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। ওঃ সেই অদৃশ্য হাতের স্পর্শ, সেই সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর যদি ফিরে পেতাম!

কিন্তু দিন চলে যায়, সেদিনগুলো চলে গিয়েছে, আমাদেরও চলে যেতে হবে। শুধু তারাভরা আকাশের নিচে নিদ্রিত পাহাড়ের নিঃসীম শান্তি রয়ে যাবে আমাদের হৃদয়ে।

চির ভালোবাসার
মার্গট

July 4th

Friday Evening. At ½ past 6 or so He could not resist the longing to go to the roof & be alone. I left Him for an hour. On the roof I found a corner where quite invisible I could always meditate. I planned to do it so [around?] always - & sat down then. In the strange sweetness that [struck?] [illegible] was irresistible

Then my mind would fly to Swami [Guru?] though I had taken another subject. I know now that that last meditating Swamiji must have held a meditation for me He left. He called me to meditate. [Everything] about Him did that at the end. And He faced the North west as He sat.

And so came the end. He went out - as one drops a worn garment without a struggle. "Conqueror of Death" - But He has not left me for my part. He has been

নিবেদিতার চিঠির প্রতিলিপি

প রি শি ষ্ট

নিবেদিতা প্রণাম

(ভগিনী নিবেদিতার ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২৮ নভেম্বর ১৯৯২-এ রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন আয়োজিত সভায় সমবেত ছাত্রীদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ।)

আজ ভগিনী নিবেদিতার একশো পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তোমরা এখানে সমবেত হয়েছ। ভগিনী নিবেদিতা আজ উপস্থিত থাকলে পরম আদরে তোমাদের সম্বোধন করতেন 'আমার মেয়ে' বলে। উদ্বোধন সংগীত, পাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতি দিয়ে সভার একটি বাতাবরণ তোমরা তৈরি করে দিয়েছ। পূজার সময় যেমন মন্ত্র উচ্চারণ ও পূজাবিধির মধ্য দিয়ে আমরা পরিবেশকে শান্ত ও পবিত্র করি, আজ তোমরাও সূচনায় সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভার সুরটিকে তেমনই এক উঁচু তারে বেঁধে দিলে। তোমাদের গাওয়া 'এসেছি ভগিনী চরণে তোমার সাজায়ে অর্ঘ্য করিতে দান' গানটির রচয়িতা ঠিক কে—তা আমরা জানি না, তবে অনেকের কাছে শুনি ভগিনী সুধীরা। সেকথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কারণ এমন রচনা ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর পক্ষেই সম্ভব।

সরলাবালা সরকার নিবেদিতার ছাত্রী ছিলেন না, সহকর্মীর মতোই তিনি বিদ্যালয়ের কাজে নিবেদিতাকে সাহায্য করেছেন। আশ্চর্য মনস্বিনী ছিলেন এই সরলাবালা। সেইজন্য নিবেদিতার আকস্মিক মহাপ্রয়াণের পর স্বামী সারদানন্দ তাঁকেই অনুরোধ করেন নিবেদিতার জীবনী রচনা করতে। খুব অল্পদিনের ব্যবধানে সেটি রচিত হয়েছিল। সরলাবালা সরকার বলতেন নিবেদিতার দেহত্যাগের সংবাদ ছিল তাঁর কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। নিজের ঠাকুরঘরে বসে নিবেদিতার জীবনচিত্রটি তিনি রচনা করেন। সেখানে দোয়াত-কালি-কলমের সঙ্গে তাঁর সামনে থাকত এক থালা ফুটন্ত

বেলফুল বা ওইরকম কোনও সুগন্ধি ফুল। উনি সাতদিনের মধ্যে যে-জীবনালেখ্যটি প্রস্তুত করেন, তাকে পূর্ণ জীবনী বলা যায় না। কিন্তু বোঝা যায়, শুধু কলমের কালি দিয়ে নয়, প্রতিটি ছত্রই তিনি লিখেছেন অন্তরের ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে।

নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে সরলাবালা সরকার প্রাণে একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। কেন নিবেদিতাকে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে চলে যেতে হল? উত্তরে বলা যায়, এই যে বিরাট 'রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ' নাটক—সেখানে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের পর তিনি আর অপেক্ষা করেননি। বড়ো লজ্জা ও দুঃখের কথা, সেদিন তাঁর দিকে আমরা কেউই তাকিয়ে দেখিনি। রাস্তার ধারে যখন কলে আখ নিঙড়াতে দেখি, তখন মনে হয় নিবেদিতা নিজেকে ভারতবর্ষের জন্য ওইভাবে নিঃশেষে নিঙড়ে দিয়ে গেছেন।

নিবেদিতার বিদ্যালয়টি আজ একটি বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আজকাল কোনও বিদ্যালয়ের বিরাটত্বের বিচার হয় কত হাজার ছাত্রছাত্রী, কত বড়ো বিল্ডিং, বিদ্যালয়ের কত একর জমি, প্রতি বছর কত শত ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে তার ওপব। নিবেদিতা বিদ্যালয় সেই অর্থে বিরাট নয়। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অতি মহান। যখন ত্যাগের ভিত্তিতে কোনও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বভাবতই মনে হয়, তার ভিত কেবলমাত্র ইঁট-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়নি, হয়েছে হৃদয়ের শোণিতে। বাস্তবিকই নিবেদিতার মতো ব্যক্তিত্ব, যিনি গ্রেট ব্রিটেনে একজন বিশিষ্ট মহিলা হতে পারতেন, তিনি নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ওই ভিতের মধ্যে৷ বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য এইখানে। তবে এখনও তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। যে-বিদ্যালয়ের জন্য এত বড়ো ত্যাগ, সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভিতর থেকে তাঁর মতো আর একজন 'নিবেদিতা' না গড়ে উঠলেও নিবেদিতার পদাঙ্ক-অনুসরণকারিণী, ত্যাগব্রতধারিণী কিছু ছাত্রী অন্তত দেশেবিদেশে ছড়িয়ে পড়বে, এই আমাদের আশা।

সরলাবালা সরকার বলেছেন, ভারতবাসীর সৌভাগ্য, নিবেদিতাকে তাঁদের পাশে পেয়েছিলেন। আর দুর্ভাগ্য, যখন তিনি পাশে ছিলেন, তখন কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। শুধু তাই নয়, যখন তিনি অর্ধাশনে, অনশনে এই বিদ্যালয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তখন তাঁর দিকে সামান্য সাহায্যের হাতটুকুও কেউ বাড়িয়ে দেয়নি। তাই সেই ঋণশোধ করতে হবে ভারতের বর্তমান কন্যাদেরই।

নিবেদিতা প্রণাম

আজ নিবেদিতার নাম যখন আমি তোমাদের কাছে উচ্চারণ করছি তখন সেই দেবীর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা আমার হৃদয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। নিবেদিতা যদি সত্যি স্বামীজীর মানসকন্যা হন, তাহলে তিনি আজও কাজ করে যাচ্ছেন স্বামীজীর মতন a voice without a form (অশরীরী বাণী) হয়ে। নিবেদিতা শেষ সময়ে বলেছিলেন—'The boat is sinking, but I shall see the sunrise.'—তোমরা তাঁর মেয়ে, তোমাদের ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সূর্যোদয় দেখবেন।

নিবেদিতার আর একটি বিশেষ পরিচয় আমাদের অজানা—সেদিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটি হল ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নিবেদিতার অবদান। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে এ-বিষয়ে যতটুকু পাওয়া যায় তা ভাসমান হিমশৈলের মতো দশভাগের একভাগ। বাকি নয়ভাগ আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। কয়েক বছর হল শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতার পত্রাবলী সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। তাও মাত্র আটশোটি পত্র। নিবেদিতা অসম্ভব চিঠি লিখতে পারতেন। আর কী গভীরতায় ভরা সেসব চিঠি। চিঠির ভিতর দিয়ে যেন ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক শ্রীনিমাইসাধন বসু সম্প্রতি বলেছেন যাঁরা ইতিহাসের গবেষণা করবেন, তাঁদের জন্য এই পত্রগুলি যেন স্বর্ণখনি!

নিবেদিতার রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে, জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার সঙ্গে নিবেদিতা-গবেষক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনেক ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায়। মুক্তিপ্রাণা বিশ্বাস করেন না যে নিবেদিতা anarchist বা সন্ত্রাসবাদী ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রশ্ন জাগে, 'রাজনীতি'র অভিধানগত অর্থ কী? নিবেদিতা যখন রাজনীতি শব্দটি ব্যবহার করছেন তখন তার মূল উৎস ছিল patriotism বা দেশপ্রেম। দেশের মঙ্গল, দেশের অভ্যুদয়, দেশের উন্নতি—এগুলিই রাজনীতির মূলমন্ত্র। আর এসব কিছুই নির্ভর করে একটি মাত্র বিশ্বাসের ওপর—তা হল জাতিগত ঐক্য বা অখণ্ডতা। আমার ইচ্ছে করে ছেলেমেয়েদের বলি, যে-দর্পণটি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকে, তাতে যে দেশটি প্রতিবিম্বিত হবে, তা যেন এতটুকু বাংলাদেশ, এতটুকু আসাম, এতটুকু তামিলনাড়ু, এতটুকু মহারাষ্ট্র না হয়। সে হবে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ। আগে আমাকে জানতে হবে দেশটির কোথায় শুরু, কোথায় শেষ। দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক

অবস্থা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তখনই আমি তার প্রতি অন্তরের টান অনুভব করতে পারব। দু-একটি শব্দ আজকাল বড়ো সস্তা হয়ে গেছে—যেমন প্রেম, ভালোবাসা। ভালোবাসা বড়ো কঠিন। যখন কোনও কিছুর জন্য নিজের সব স্বার্থ ভোলা যায়, তখনই 'ভালোবেসেছি' বলার অধিকার জন্মায়। স্বামীজী বলেছেন ভালোবাসার মধ্যে দোকানদারি থাকে না, সে প্রতিদান চায় না, ভালোবাসা ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয় না, ভালোবাসায় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার কাছে ভারতের জন্য ওইরকম ভালোবাসা দাবি করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, তা না হলে তুমি ভারতে এসো না।

একটু আগে বড়ো মিষ্টি করে আমাদের এক কন্যা বললে—স্বামীজী চাইতেন না যে বাইরে থেকে এসে কেউ ভারতকে কৃপা করে যাক। আজ ভারতবাসী নিজেই নিজের দেশকে করুণা করছে। নিজের দেশকে উপেক্ষা করছে। ক্রমাগত ভারতের তুলনা করছে অন্য দেশের সঙ্গে। এর কোনওটাই কাম্য নয়। আমাদের প্রবেশ করতে হবে গভীরে। কাকে অনুসরণ করে প্রবেশ করব? এ-ভারতবর্ষ যত দরিদ্রই হোক না কেন, একটি দিকে সে ঐশ্বর্যশালী। বহু ধর্মেরই তো সে ধাত্রী, বহু মহাপুরুষের জন্মদাত্রী। আমরা শুধু তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব। কিন্তু তার আগে নিজেকে ভুলতে হবে, বলি দিতে হবে নিজের স্বার্থ। জানি এ-বড়ো কঠিন তপস্যা। তবে কি আমরা প্রথম থেকেই হতাশ হব? এক্ষেত্রে নিবেদিতাকেই অবলম্বন করব। সরলাবালা সরকার লিখছেন, "সংকল্পিত কার্যের নানা বাধাবিপত্তি ও প্রতিপদে নিষ্ফলতায় ব্যথিত হইয়া একদিন কেহ তাঁহার নিকট নিরাশ ভাবে 'আমাদের দিয়ে আর কিছু হল না' বলিয়া দুঃখ করিলে নিবেদিতা উত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমরা আশাও করিব না এবং নিরাশও হইব না, আমরা দৃঢ়নিশ্চয়—আমরা অগ্রগামী নিরাশাদল (Band of Despair)। আমরা নিজের শরীর দিয়া সেতু প্রস্তুত করিব, পরবর্তী সৈন্যদল সেই সেতুর ওপর দিয়া পার হইয়া যাইবে।' " বাস্তবিকই, নিজের জীবন দিয়ে নিবেদিতা এর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন আমাদের জন্য, তোমাদের জন্য এবং আগামীদের জন্যও।

আমরা তো জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে গিয়েছি, তবু নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে আজও যেন ছাত্রীজীবনে ফিরে যাচ্ছি। নিবেদিতার কথা চিন্তা

করলে, তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারা যায় না। এক একবার ভয় হয়, আমাদের হৃদয় থেকে যদি এই সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হারিয়ে যায়, আমাদের মন যদি কোনও মহাপ্রাণের মহাত্যাগের আদর্শ দেখে স্পন্দিত না হয়, তাহলে আজকের শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? সে-শিক্ষা তো বন্ধ্যা শিক্ষা! শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তো মানুষের ভিতর যে-পূর্ণতা সুপ্ত আছে, তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করা। সভ্যতাকে পরিচ্ছদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু শিক্ষাকে নয়। শিক্ষা আসবে ভিতর থেকে। তা না হলে একটা সংকটে উপনীত হলেই ভিতরের দুর্বলরূপটি প্রকাশ হয়ে যাবে। স্বামীজী তাই বলছেন—শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভিতরের পূর্ণতাকে প্রকাশ করা। আর নিবেদিতা ভারতের মেয়েদের সেই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন। উঁচুদরের শিক্ষাবিদ ছিলেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে গৌরব ছিল তিনি একজন শিক্ষিকা। সবসময় বলতেন—I am a teacher. এই কথাটুকুর মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চাইতেন শিক্ষকতা বৃত্তিটির ওপর কত দায়িত্ব ন্যস্ত। মানুষের জীবনগঠনে বা চরিত্রবিকাশে মায়ের পরই বোধহয় ব্যাপক ও গভীর ভূমিকা শিক্ষিকার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা মায়ের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে যায়। মানুষকে আমৃত্যু শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তোমরা যদি মনে কর বি.এ. পরীক্ষাটা দিলেই তোমাদের ছাত্রীজীবন শেষ হয়ে গেল, তাহলে তোমাদের শেখা আরম্ভই হল না। নিবেদিতা চাইতেন এমন শিক্ষা যা ক্রমাগত মানুষের ভিতরে জানার আকাঙ্ক্ষাটাকে বাড়িয়ে দেবে।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর আজ পর্যন্ত তাঁর ও নিবেদিতা সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তিকর বিকৃত সংবাদ পুস্তিকা বা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অন্তত তোমরা, যারা এইরকম প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছ, তারা যেন সঠিক সংবাদটুকু জানতে আগ্রহী হও। অনেকে আমাদের কাছে এসে বলেন—নিবেদিতাকে তো রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর মৃত্যুর পর সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন! প্রকৃত ঘটনা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর নিবেদিতার জীবনীতে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। নিবেদিতা সেসময় নিজেকে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বড়ো বেশি জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর অগ্নিময় বাণী, রাজনৈতিক বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি স্বভাবতই সঙ্ঘের পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। স্বামীজীর পরিকল্পিত বেলুড় মঠ সর্বতোভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকবে—এটি স্বামীজীরই নির্দেশ। তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা

নিবেদিতা জানতেন। আর বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যও কখনও কেবলমাত্র কয়েকজন সন্ন্যাসী তৈরি করা হতে পারে না। স্বামীজী একটি বিরাট সম্ভাবনাময় আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন। সুতরাং ব্রিটিশের রোষদৃষ্টি থেকে তাকে বাঁচতে হলে নিবেদিতাকে সরে আসতে হবে। সেইজন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন তাঁকে ডেকে বললেন বেলুড় মঠের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হলে নিবেদিতাকে রাজনৈতিক সংস্রব ত্যাগ করতে হবে, তখন তিনি ওই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। কারণ সেদিন নিবেদিতার পক্ষে রাজনীতি ত্যাগ অসম্ভব ছিল। তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশিত তাঁর মতবাদের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন কোনও ভাবে দায়ী নন। সব দায়িত্ব তাঁর নিজের। তাঁর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল মর্মান্তিক। তবে বেলুড় মঠের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক বাহ্যত বিচ্ছিন্ন হলেও, আত্মিকযোগ ছিল চিরকালই অটুট।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীরা সর্বদাই তাঁর পাশে ছিলেন। যখন নিবেদিতার স্কুলটি প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে বন্ধ হওয়ার উপক্রম, সেই দুর্দিনে এগিয়ে এসে নিবেদিতার সেই ছোটো চারাগাছটিকে বাঁচানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা তাঁরাই করেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের আর্থিক অবস্থাও তখন যথেষ্ট উদ্বেগজনক। স্কুল নিয়ে নিবেদিতাকে প্রথমাবধি বহু সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, যার জন্য আমেরিকা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী লিখেছেন, যে করে হোক নিবেদিতার স্কুলটিকে গড়ে দিতে হবে। পরবর্তী কালেও দেখব, নিবেদিতার আকস্মিক দেহত্যাগে স্কুলটির সকল উন্নতির সম্ভাবনা যখন রুদ্ধ তখন রামকৃষ্ণ মিশন তার সবরকম ভার গ্রহণ করেন। এই ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে বেলুড় মঠের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য।

স্বামীজীর মত ও আদর্শে বিশ্বাসী নিবেদিতা জানতেন ভারতের স্বাধীনতা আগে চাই। তা না হলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। উনি নির্জীব, তাপ-উত্তাপবিহীন ভারতবাসীকে দেখে অসম্ভব বেদনা অনুভব করেছেন। তাই যেখানেই নিবেদিতা কয়েকটি তেজী, সাহসী, সম্ভাবনাময় ছেলেকে দেখেছেন, সেখানেই নানাভাবে প্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন, তাদের উদ্দীপিত করেছেন। তিনি মনে করতেন নিজের জন্মভূমিকে স্বাধীন করার জন্য কোনও ত্যাগই যথেষ্ট নয়। আর কী প্রচণ্ড ঘৃণা তাঁর স্বজাতি ব্রিটিশদের ওপর! বলছেন—একদল ডাকাত ভারতবর্ষের মতো এক দেশকে লুঠপাট করে চলেছে। এদের কাছে ভারতবাসী

কী শিখবে বলে আশা করে? নিবেদিতা তখন লুকিয়ে গুপ্ত সমিতির ছেলেদের কাছে চিঠি লিখছেন, জ্বলন্ত সেসব চিঠি! আমি জানি না কজন মেয়ে এই চিঠিগুলি পড়বে। আজ সময়াভাবে পড়ে শোনাতে পারলাম না, আশা করব তোমরা নিজেরা এগুলি পড়ে নেবে।

এছাড়া 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু মুক্তিসংগ্রামে নিবেদিতার অবদান কী তা আলোচনা করেছেন। নিবেদিতার অজস্র চিঠি ও সমসাময়িক সব পত্রপত্রিকা ঘেঁটে উনি তথ্যসংগ্রহ করে নিবেদিতাকে ও অন্যান্যদের তুলে এনেছেন বিস্মৃতির গহ্বর থেকে। আমরা দেখব নিবেদিতা গোপনে চিঠি লিখছেন জোসেফিন ম্যাকলাউডকে, Statesman পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফকে। অতিরিক্ত স্বদেশিভাবাপন্ন প্রবন্ধ ছাপার জন্য পত্রিকার চাকরীটি র‍্যাটক্লিফের চলে যায়। তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। নিবেদিতাও বুঝেছিলেন যে পরাধীন ভারতবর্ষে থেকে বেশি কাজ করা যাবে না, সংবাদপ্রেরণ করতে হবে স্বল্পসংখ্যক ভারতবন্ধু ইংরেজদের, যাঁরা ওই দেশে আছেন। তাঁরাই সেখানকার সংবাদপত্রে, পার্লামেন্টে ভারতবিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরবেন। আজ তোমরা ভাবতেও পারবে না, সেদিন সেকাজ ছিল কত কঠিন! রাশি রাশি চিঠি লিখে ব্রিটিশ অত্যাচারের কাহিনী তিনি শোনাচ্ছেন। তার থেকে দু-একটি তোমাদের শোনাই। ধুতির পাড়ে কী একটা গান বুনছিল বলে মেদিনীপুর জেলার একশোজন তাঁতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নিরক্ষর তাঁতিরা কিন্তু জানে না কী গান তারা বুনছিল। নিবেদিতা সে গানের ভাষা সংগ্রহ করতে পারেননি, ফলে সেটা আমাদের অজানা থেকে গেছে। আবার অন্যসময় লিখছেন, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রকে ব্রিটিশ সরকার এক অদ্ভুত উপায়ে গ্রেপ্তার করে। তা দেখে নিবেদিতার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। পুলিশ তাঁর বাড়িতে খবর দিয়ে আসে যে থানার সুপারিন্টেনডেন্ট তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। ভদ্রলোক সরলভাবে কথা বলতে গেলে পুলিশ কিছু আভাস না দিয়েই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের অপর একটি অত্যাচারের দৃষ্টান্ত—সাধারণ মানুষদের পারিবারিক রুপোর অলংকারপত্র হল ডাকাতি করা গহনা : এই অভিযোগে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করত। সে-অলংকার দরিদ্র লোকেরা কোনওদিনই ফেরত পেত না। পুলিশ-আইন নিয়ে দেশ তখন হতভম্ব। নিবেদিতা বিস্ময়ের সঙ্গে লিখছেন—ভাবতে পার, তীর্থযাত্রী এক বৃদ্ধাকে ২৪ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল কারণ

তিনি তাঁর গ্রামের নাম ইত্যাদি বলতে পারলেও পুলিশের বড়ো থানার নাম বলতে পারেননি! নিবেদিতা অনুভব করেছেন ব্রিটিশ শাসনে সেসময় ভারতীয়দের ওপর যে-অত্যাচার করা হয়েছে তা papal যুগের inquisition-এও হয়নি। সেযুগে পোপের ধর্ম না মানলে অমানুষিক পীড়ন করা হত। রোমান, স্প্যানিশ, রুশ কোনও বিপ্লবের সঙ্গে সে অত্যাচারের তুলনা নেই। আর সেসবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ভারতীয়দের ওপর ইংরেজদের অত্যাচার। শিক্ষাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে। কৃষ্ণনগরে একটা কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হত। গভর্নমেন্ট ও কৃষ্ণনগরের রাজারা আধাআধি সে খরচ দিতেন। গভর্নমেন্ট হঠাৎ খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেন। রাজারা নিজেদের ব্যয়ে কলেজটি চালাতে চাইলেন কিন্তু সে-অনুমতিও পেলেন না। নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠির মাধ্যমে এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায়। সেসময় সরকার Press Act নামে একটা নতুন আইন প্রণয়ন করলেন। প্রকাশ্যে সরকারবিরুদ্ধ কিছু ছাপা নিষেধ হয়ে গেল। তবু যাঁরা দুঃসাহস করে কিছু প্রকাশ করলেন, তাদের press ভেঙে চুরমার করা হল অথবা দরজায় তালা লাগিয়ে তাদের সর্বনাশ করে দেওয়া হল। নিবেদিতা লিখছেন, "ভাবতে পার, ওরা কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিচ্ছে, কণ্ঠের ওপর হাত চেপে ধরছে। ওরা জানে না এভাবে কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায় না, হাতটা তুলে নিয়ে দেখুক কী শক্তি, কী তেজ! ওরা কী ভাবছে, চিন্তা রুদ্ধ হয়ে গেছে, যেহেতু শব্দ শোনা যাচ্ছে না?" বিচার না করে ছেলেদের কারাগারে বন্দী করে রেখে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে-অকথ্য যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পাঠাচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ছেলেদের সহ্যশক্তি দেখে। বলছেন, আশ্চর্য সাধনার দেশ এই বাংলাদেশ। এরা অদম্য, জীবনমৃত্যু তুচ্ছ এদের কাছে। এই যুবক সম্প্রদায়কে প্রেরণা দিতে পারে এমন বইও তিনি লিখছেন।

অবশেষে নিবেদিতাকে ভারত ছেড়ে সাময়িকভাবে চলে যেতে হল। তিনি তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন শাসকদের শত্রু হিসাবে। যদি ওঁকে গ্রেপ্তার করা হত, ওঁর শ্বেতচর্ম হয়তো জেলের পাশবিক যন্ত্রণা থেকে ওঁকে রক্ষা করত, তবু তাঁর মতো তেজস্বিনী সিংহিনীর জেলের খাঁচায় বন্দী হওয়া তো মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। মিস ম্যাকলাউডের আশঙ্কার উত্তরে নিবেদিতা লিখছেন, "তুমি ভয় পেয়ো না, আমায় যদি জেলে নিয়ে যায়, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তখন ধ্যান করব। যে অধ্যাত্মশক্তিতে সারদা দেবী প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেকে সবকিছুর

ওপর রাখতে পারেন—আমি ধ্যানের দ্বারা সেই অবস্থায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব।" আইরিশ মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস তাঁর ভালো করে পড়া ছিল। উনি জানতেন শাসকগোষ্ঠীর হাতে ধরা পড়া বোকামি। এও জানতেন—জেল কীভাবে এড়াতে হয়। তাই code ব্যবহার করে কী সাবধানে চিঠিপত্র লিখতেন। নিজের নামের পরিবর্তে চিঠির ওপরে 'কৃস্টিনা' ২ লিখতে বলতেন কিংবা ব্যাঙ্কের এজেন্টের মারফত চিঠি আদানপ্রদান করতেন বিনা নামে। 'রাজনীতি' শব্দের ব্যবহার তাঁর চিঠিতে ছিল নিষিদ্ধ। ভারতে ফিরলে গ্রেপ্তার হতে পারেন এই আশঙ্কায় ভারতীয় বন্ধুরা তাঁকে ফিরতে বারণ করা সত্ত্বেও তিনি নিজের বিশেষ পোশাক ছেড়ে ছদ্মবেশে সেই বাগবাজারের বোস পাড়াতেই ফিরে আসেন। সেসময় দেবমাতা সেখানে রয়েছেন। দেবমাতা তাঁর পোশাক দেখে বিস্মিত, কারণ তিনি জানতেন নিবেদিতা সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরেন। দেবমাতাকেও রাস্তায় দেখলেই প্রশ্ন করা হয়েছে—তুমি কি নিবেদিতা? কত সন্তর্পণে, কত সংগ্রাম করে এভাবে গ্রেফতার এড়াতে হয়েছে নিবেদিতাকে।

নিবেদিতার নাম সরকারি মহলে তালিকাভুক্ত হয় 'Inspirer' বলে। সত্যই তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণাদাত্রী। ভীতুকে ধিক্কার দিয়েছেন, সাহসীকে দিয়েছেন বাহবা।

স্বাধীন ভারতের জন্য বজ্রচিহ্নিত পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন নিবেদিতা। বজ্র কেন? তাঁর আশা ছিল ভারতের জনসাধারণের ত্যাগ হবে দধীচির মতো। নিবেদিতা জানতেন উত্তেজনার বশে দেহত্যাগ সহজ, কিন্তু প্রায়োপবেশনে তিলে তিলে শরীরদান কত কঠিন! তিনি চাইতেন, ওঁর কাছে যেসব ছেলেরা আসত তারা যেন দেশের জন্য দধীচির মতো আপন অস্থি দিতে পারে যার প্রভাব হবে বজ্রতুল্য।

আজ আমরা শতধা-বিদীর্ণ দেশটিকে দেখছি। প্রায় ছশ বছরের মুসলমান রাজত্ব ও দুশ বছরের ইংরেজ শাসনের পর এমনিতেই দেশ দুর্বল। মুসলমান রাজত্বকালে ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল মেয়েরা, সে প্রশংসা তাদের প্রাপ্য। কিন্তু ব্রিটিশ যুগ যেন ভারতের ইতিহাসে একটা 'Cultural Black-out'-এর মতো। আর আজ স্বাধীন ভারতে আমরা ভুগছি হীনম্মন্যতায়। বিদেশের যা-কিছু ভালো তাকে আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব, স্বামীজীর সেইরকমই নির্দেশ ছিল, কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠত্বকেও সেইসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে

হবে। অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে মুসলমান যুগের মতো এযুগেও মেয়েদের ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে। ভোগবাদ, জড়বাদের সাময়িক সম্মোহন ভেদ করে বেরিয়ে আসতেই হবে। অতীতেও এমন হয়েছে, তা না হলে ভারতবর্ষ কবে বিলুপ্ত হয়ে যেত! তবে তার জন্য চাই সাধনা—নিঃস্বার্থ হওয়ার সাধনা, দেশকে ভালোবাসার সাধনা। আজ আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। নিবেদিতার কথা, "দেশ যখন ডাকবে তখন ঘুমিয়ে থেকো না, মনের প্রস্তুতি বন্ধ রেখো না।" আজ আবার দেশের দুর্দিন এসেছে। এদেশের জন্য নিবেদিতার সমগ্র জীবনখানি দেওয়া কি তবে অসার্থক হয়ে যাবে? তা কি তোমাদের অনুপ্রাণিত করবে না?

সেযুগে নিবেদিতা অসম সাহসের সঙ্গে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন—বিদেশি বয়কট। এই পদক্ষেপ সরকারকে যে এতখানি আঘাত করবে, তা বোঝা যায়নি। ওদের অর্থনীতি হয়েছে বিপর্যস্ত, রপ্তানি বন্ধ হওয়ার পথে। একজন নিবেদিতাকে বলছেন সিস্টার, কম দামে অনেক বেশি সুন্দর বিদেশি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। লোকে কেন স্বদেশি জিনিস কিনবে? গর্জন করে উঠেছেন তিনি—"কোনওদিন তো জানতাম না যে ভারতীয়দের মধ্যে বণিকবৃত্তি আছে! ওটা তো ইংরেজদের। আমি তো আমার ভারতীয়দের অমূল্য আত্মমর্যাদার কথাই জানি।" নিবেদিতা নিজে স্বদেশি জিনিস ব্যবহার শুরু করলেন। ভাইসরয় পত্নী লেডি মিন্টোকে স্বদেশি বিস্কুট, স্বদেশি চা, স্বদেশি পেয়ালায় খাওয়ালেন নির্বিকারে। সে বর্ণনা ওঁর জীবনীতে পাবে। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নিবেদিতা সম্পর্কে আরেকটি সুন্দর পুস্তিকা তোমাদের পড়তে বলি—তা হল আত্মপ্রাণা-সংকলিত 'My India, My People'. রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "তিনি যখন বলিতেন 'Our people' তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই এমনকি জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই।"—নিবেদিতা এই হৃদয়টি দিয়েছিলেন। সরলাবালা সরকার মনে করছেন এরজন্যই ভারতবাসী এতখানি মুগ্ধ হয়েছিল। নিবেদিতাও

ভারতবাসীর কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম তাই আশা করেছেন।

খ্রিষ্টান মিশনারিরা ওঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। অকথ্য গালিগালাজ সহ্য করতে হয়েছে ওঁকে। তাঁদের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে নিবেদিতা একখানি ছোটো বই লিখলেন—'Lambs among Wolves' নিবেদিতার প্রতিবাদ খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল anti-India মিশনারীদের বিরুদ্ধে। অদ্ভুত সে বই। তারপর লিখলেন 'The Web of Indian life', সে বই পড়ে ইউরোপ-আমেরিকা মুগ্ধ হয়ে গেল। এই উন্নত সংস্কৃতির দেশ—ভারতবর্ষের কথা তো তাদের জানা ছিল না। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে খ্রিষ্টান মিশনারীদের 'মিলিয়ন ডলার' গ্রান্ট কমে গিয়েছিল। ইতিহাসের প্রমাণ দিয়ে লেখা ইংরেজ দুহিতা নিবেদিতার বইয়ের প্রতিক্রিয়া হল তার চেয়েও বেশি। নিবেদিতা যথার্থই ভারত-উপাসিকা ছিলেন। ভারত-উপাসিকা নিবেদিতা, অনন্য নিবেদিতা, মহীয়সী নিবেদিতা—এই তিনটি অধ্যায় আছে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার বইতে। এ-বইটি তোমাদের কাছে শক্ত হবে না। 'নিবেদিতা লোকমাতা' থেকে সহজ অংশগুলি তোমরা পড়ো। অর্ন্তদৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'নিবেদিতা'র লোকমাতা নাম সার্থক—আজও তিনি জাতিকে পরিচালিত করার শক্তি রাখেন। স্বামীজীকে একবার মিস ম্যাকলাউড জিজ্ঞেস করেছিলেন—"স্বামীজী কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, "ভারতকে ভালোবেসে"। নিবেদিতাকে সে-কথা বলতেই হয়নি। স্বামীজীর সবচাইতে ভালোবাসার জিনিস ছিল ভারতবর্ষ। নিবেদিতা তাঁর পবিত্রতম ভালোবাসা দিয়েছিলেন স্বামীজীকে আর জীবন দিয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য ভারতবর্ষের সেবায়—নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে। সেই ছিল তাঁর গুরুদক্ষিণা। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, তুমি যজ্ঞের সমিধ হও। নিবেদিতা মনেপ্রাণে তাই হয়েছিলেন।

আজ তোমরা ভারতের ছাত্রছাত্রীরা নতজানু হয়ে ভারতপ্রেমের দীক্ষা নাও নিবেদিতার কাছ থেকে। অন্তরের ভক্তি-ভালোবাসা শ্রদ্ধা মিশিয়ে বলো,

'শিষ্যা তব পদতলে, সেই ব্রতে ব্রতী করো
ভালে দিয়ে টীকা,
জ্বালো চিত্তে চির দীপ্তি নিষ্কলুষা, স্বর্গমুখী
হোমানল-শিখা।'

নিবেদিতার স্বপ্ন

(গত ৬ নভেম্বর'৯৮ ছাত্রীদিবসে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ।)

নিবেদিতার ভারত আগমনের পশ্চাতে একটি নির্দিষ্ট 'মিশন' ছিল, কিন্তু তিনি 'মিশনারি' ছিলেন না। তথাকথিত মিশনারিদের মতো এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যেতে আসেননি। এসেছিলেন সুপ্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার মনোভাব নিয়ে। ভারতবর্ষকে ঘিরে ভগিনী নিবেদিতার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যতদূর সম্ভব তাঁর চিন্তা ও ভাবানুসরণে আপনাদের সামনে আজ তুলে ধরব।

নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির যথার্থ তাৎপর্য কী অথবা আগামী প্রজন্মের জন্য সে কোন ভূমিকা গ্রহণ করবে—এসব নির্ণয় করার সময় হয়তো এখনও আসেনি। তবে একথা নিঃসন্দেহ বলতে পারি যে, নিবেদিতা সেযুগের লন্ডনে নবীন শিক্ষান্দোলন-এর সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসাবে নিজস্ব ধ্যানধারণার আলোকে বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বেই নিবেদিতা অনন্য ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন জাগে, নিবেদিতার মতো অসাধারণ ব্যাক্তিত্বশালিনী নারীকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুল খুলে অ-আ-ক-খ শেখানোর কাজে কেন আহ্বান জানিয়েছিলেন? মনে হয়, স্বামীজীর সে-আহ্বানের পশ্চাতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনটা মুখ্য ছিল না। কারণ এখানে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এক, বিদ্যালয় শুরু হওয়ার আগে স্বামীজী মার্গারেট নোবলকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করে 'নিবেদিতা' নাম দিয়েছিলেন। দুই, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং, শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে যিনি ছিলেন সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তির পালয়িত্রী। এথেকেই প্রমাণিত হয়, স্বামীজী চেয়েছিলেন ছেলেদের মতো মেয়েদের জন্যও একটি মঠ স্থাপন করতে।

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে স্বামী সারদানন্দ বিদ্যালয়ের যে প্রথম কার্যবিবরণী (১৯০৫-১৯১২) প্রকাশ করেন তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে—"বিদ্যালয়ের সামান্য সূচনায় প্রস্তাবিত স্ত্রীমঠের 'ভূমিকা' রচনা হল।" স্বামীজীর সেই স্বপ্ন সম্ভব হল যখন দক্ষিণেশ্বর স্ত্রীমঠ স্থাপিত হল আরও ছাপ্পান্নো বছর পরে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে।

নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে যে অল্পসংখ্যক ত্যাগব্রতী মেয়েরা সমবেত হন, তাঁরা ১৯১৪ সাল থেকে বিদ্যালয়ের অদূরে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। তাঁরা তাঁদের আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন 'মাতৃমন্দির' এবং সন্ন্যাসিনীর মতোই জীবন যাপন করতেন।

নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর নির্দেশ ছিল—ভারতীয় মেয়েদের জাতীয়ভাবে দেশীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেই শিক্ষা দিতে হবে। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র নারীমুক্তির জন্য আসেননি, তিনি জনগণেরও ত্রাণকর্তা। স্বামীজীর এই ভাবনাই নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর পক্ষে শুধুমাত্র একটি বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা কঠিন ছিল।

স্বামীজী চেয়েছিলেন মানুষ গড়ার শিক্ষা। নিবেদিতা সেটিকে জাতি গঠনের দিকে প্রসারিত করেন। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে এই বিদ্যালয়টি ছিল তখনকার দিনে ভারতের প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের মেয়েরা প্রতিদিন প্রার্থনার সময়ে গাইত 'বন্দে মাতরম্'—এই সংগীতের ওপর তখন ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহারেও নিবেদিতার আগ্রহের সীমা ছিল না। তাই কোনওরকম দ্বিধা না করে তিনি লেডি মিন্টোকে (তৎকালীন ভাইসরয়ের পত্নী, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন) আপ্যায়িত করেছিলেন স্বদেশি কাপ-ডিসে স্বদেশি চা, চিনি ও বিস্কুট দিয়ে। তখন ভারতীয়দের ঘরে ওই স্বদেশি বস্তুর কোনও কদর ছিল না। আবার লেডি মিন্টো যখন ১৯১০-এর ১৮ মার্চ নিবেদিতাকে গর্ভনমেন্ট-হাউস-এ ব্যাক্তিগত ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখনও নিবেদিতা এক প্যাকেট স্বদেশি বিস্কুট (লেড়ে বিস্কুট) সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এ বোধহয় একমাত্র নিবেদিতার পক্ষেই সম্ভব।

একথা সুনিশ্চিত যে, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশ থেকে শেখার কিছুই নেই, বরং দেওয়ার মতো সম্পদ অনেক আছে। আমাদের সমাজে অবশ্য

বর্তমানে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সমাজে নতুন যা কিছুর প্রবর্তন প্রয়োজন ভারতীয়রা নিজেরাই করবে। কোনও বিদেশির তো সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

তিন হাজার বছরে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা কি এতই গুরুত্বহীন যে, পশ্চিমের তরুণজাতি প্রাচ্যের মানুষকে দিগ্‌দর্শন করাবে! ইউরোপে সভ্যতার জন্ম তখনও হয়নি। সেই সুপ্রাচীন কালেই ভারতবর্ষ সভ্যতার মূলভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করেছিল। সভ্যতার শেষ কথা ঐশ্বর্য, শক্তি অথবা সংগঠন নয়, সভ্যতার অর্থ মানুষের চেতনাকে উচ্চতর মূল্যবোধে জাগ্রত করা, সূক্ষ্ম মহত্তর কৃষ্টির সঞ্চার করা এবং সেইসঙ্গে গড়ে তোলা উদার প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি।

ভারতীয় মেয়েরা অজ্ঞ—এমন ভুল ধারণা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। বরং ভারতীয় মেয়েদের সমুন্নত চরিত্রমহিমা, তাদের সহজাত মর্যাদাবোধ, হৃদয়-মনের কোমলতা, যা তারা নিজেদের সহজ-সরল জীবনযাত্রার মধ্যেই লাভ করেছে—সেগুলিই তো জাতীয় জীবনে মহার্ঘ্য সম্পদ। হয়তো আধুনিক পরিভাষায় তারা অশিক্ষিত, কারণ তারা নিজের ভাষায় একটি শব্দও পড়তে শেখেনি, নিজের নাম সই করা তো দূরের কথা। তা-সত্ত্বেও শিক্ষা মানুষকে যে উৎকর্ষতা দেয়, নিবেদিতার মতে, সেযুগের ভারতীয় মেয়েরা তথাকথিত শিক্ষালাভ না করেও তা সহস্রগুণে বেশি অর্জন করেছিল। ভারতে নারীত্বের আদর্শ, রোম্যান্স নয়, ত্যাগ। প্রাচ্যদেশের পক্ষে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করার কোনও আবশ্যকতা নেই। বিদেশের রীতিনীতি, শিষ্টাচারকে অনুকরণ করার হীন মনোভাব থাকবে কেন? পরস্পরের সৌহার্দ্য যেখানে আছে সেখানে হাতজোড় করে নমস্কার জানালাম অথবা করমর্দন করলাম—তাতে কী আসে যায়!

নিবেদিতা চাইতেন, ভারতের তরুণরা যেন মনে রাখেন যে, জগতের অন্য কোথাও, আর কোনও জাতির মধ্যেই ছাত্রাবস্থায় এত উচ্চ ব্রহ্মচর্যের আদর্শ নেই। নিবেদিতা আশা রাখতেন—প্রতিটি ছাত্রই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। শাসকশ্রেণীর চাপে লেখা এক বিপরীত এবং অর্ধসত্য ইতিহাসের মোহে না পড়ে, তারা যেন স্বদেশকে অখণ্ডরূপে ভাবতে শেখে। অন্যান্য জাতির কাছে ভারতের জবাবদিহি করার কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতের ছাত্রেরা যেন নিজেদের সাহিত্য—বিশেষ করে সংস্কৃতসাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে বিকশিত জাতীয় প্রতিভার সমাদর করতে শেখে। নিজেদের অমূল্য

শিল্প-সম্পদের প্রতি তরুণসমাজের ঔদাসীন্য নিবেদিতাকে কতটা ব্যথিত করত, তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তিনিই সেদিন ভারতের শিল্পীদের উৎসাহ দিয়ে প্রেরণাদাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পের জাগরণে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে তিনি শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে এক মুক্ত দিগন্ত খুলে দিলেন। নিবেদিতার কাছে শিল্পীরা ছিলেন অনন্ত স্বপ্নের সান্ত রূপকার।

ভারতীয় নারীর ব্যক্তিত্বকে বোঝার মতো অর্ন্তদৃষ্টি নিবেদিতার ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল সেখানেই রহস্যের চাবিকাঠি—যা ভারতবর্ষকে সমস্ত ধর্মসমূহের জননী করেছে। বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ওপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ বেশি নির্ভর করছে।

আমাদের দেশ আজ বিপদের সম্মুখীন। দেশজননী বিশেষ করে এই ক্ষণে তাঁর মেয়েদের আহ্বান করছেন। তাঁরা যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে সেআহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন।

আজকের ভারতীয় মা যেন তাঁর মেয়েদের একটি পবিত্র জীবনযাপনে প্রেরণা দেন—যার অভাবে জাতি আজ তার অন্তরের শক্তি ও বীর্য হারিয়ে ফেলছে।

প্রত্যেক মা যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তান মহৎ হবে। মায়েরা যেন সন্তানের অন্তরে অপার সহানুভূতি জাগিয়ে তোলেন যাতে তারা অন্যের দুঃখকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে।

নিবেদিতার শক্তিশালী লেখনীতে স্বামীজীরই মহা আহ্বান শুনতে পাই—আমরা যেন আমাদের সন্তানদের স্বদেশ ও স্বজাতির চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমরা দেখতে চাই, আমাদের সন্তানরা স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ করছে। তারা ভারতকে ভালোবাসুক, জ্ঞান অর্জন করুক ভারতেরই কল্যাণসাধনে—এইসব ভাব তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো প্রবাহিত হোক।

এতটাই ছিল নিবেদিতার আশা, নিবেদিতার স্বপ্ন। নিবেদিতার প্রিয় স্বদেশমন্ত্রটি উচ্চারণ করেই শেষ করি। তিনি তাঁর ছাত্রীদের ওই মন্ত্রটি ধ্যান করতে ও বার বার আবৃত্তি করতে বলতেন জপমন্ত্রের মতো। সে মন্ত্র হল : " 'বন্দে মাতরম্'—ভারতমাতা, তোমায় প্রণাম করি।"

বিবেকতনয়া নিবেদিতা

মিস মার্গারেট নোবল, স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতা। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর জন্ম নিলেন আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন পল্লীতে। প্রথম প্রণাম নিবেদন করি তাঁর পুণ্যশ্লোকা জননী মেরি হ্যামিল্টনকে যিনি গর্ভস্থ সন্তানকে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেন। তখনও তিনি জানতেন না যে, তিনি একটি কন্যারত্ন লাভ করবেন। এখন বুঝতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লীলায় মার্গারেটের ভূমিকাটি ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। মার্গারেটের কৈশোর, যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছিল ইংল্যান্ডে। বাল্যকাল থেকেই তিনি আর পাঁচজন বালিকার মতন ছিলেন না।

১৮৯৫-এর নভেম্বরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয় একটি পরম লগ্নে আর সেই দিনটিকে বলা যায় তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন। মনস্বিনী, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না মার্গারেট জন্মসূত্রে ছিলেন ধর্মযাজকের কন্যা। ধর্মানুরাগ তাঁর স্বাভাবিক। যে পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন, সেখানে ধর্মানুষ্ঠানগুলি ছিল প্রাণহীন। প্রকৃত ধর্ম কোথায়? তিনি দেখেছেন ধর্মমতেই অসঙ্গতি। সুতরাং মার্গারেটের মন সংশয়ক্ষুব্ধ। সত্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত হতে চান, সত্য তাঁর কাছে আসবে। এল সেই মহালগ্ন। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনে তিনি বুঝলেন, মন যেন এতদিনে নির্ভরযোগ্য কোনও আশ্রয় পেয়েছে, যিনি নিশ্চিতরূপে তাঁর জীবনের গতি নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। কিন্তু এই বিশ্বাসে উপনীত হতে তাঁকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

মার্গারেট মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতেন, প্রশ্ন করতেন, তর্ক করতেন। তাঁর মনের মধ্যে আলোড়ন উঠত। আভাস পেতেন অস্পষ্ট এক আহ্বানের। তখন তাঁর মনের অবস্থা—'নাহি জানি কে ডাকিল মোরে, দুর্নিবার তবু সে-আহ্বান।' একদিন শুনলেন স্বামীজী বলছেন, "...জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।' কে কে যেতে প্রস্তুত?" বলতে বলতে তিনি আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে কাউকে যেন ইঙ্গিত করে বলছেন,

"কিসের ভয়? যদি ঈশ্বর আছেন এ-কথা সত্য হয় তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি তা সত্য না হয় তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কী?" মার্গারেটের সমস্ত অন্তর সেদিন সাড়া দেওয়ার জন্য অধীর, বুঝতে পেরেছেন জগতে যা কিছু মহত্তম, ধর্মের নামে স্বামীজী তাকেই আহ্বান করছেন। কিন্তু তখনও প্রত্যক্ষ আদেশ আসেনি স্বামীজীর কাছ থেকে।

মার্গারেট জানতে চাইলেন স্বামীজীর কাজের যথার্থ স্বরূপ কী, আর তিনি কীভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। শুনলেন সেই সত্য—তাঁর কাজ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেটি প্রকাশের পথ-নির্ধারণ। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বামীজী ঘোষণা করলেন, "যাঁরা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়। অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন...জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেইরূপ লোকেদের প্রয়োজন, যাদের জীবন প্রেম-প্রদীপ্ত, যারা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি বাক্যকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।" এই পত্রেই এল স্বামীজীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। "তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী, আর তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমাব কি নিদ্রা সাজে?" (৭ জুন, ১৮৯৬)

মার্গারেটের অন্তর মথিত হল এই বজ্র আহ্বানে। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। স্বামীজীর কাছ থেকে মার্গারেট সুস্পষ্ট ভাবে ভারতের কাজে জীবন উৎসর্গ করার নির্দেশ পেলেন ১৮৯৭-এর ২৯ জুলাই। "তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালোবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।"

স্বামীজী কিন্তু কখনও মার্গারেটের সামনে তাঁর ভারত-বাসের কোনও উজ্জ্বল চিত্র আঁকেননি বরং ইঙ্গিতই দিয়েছেন দুঃসহ সংগ্রামের । তারপরে

লিখছেন, "এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে... তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।...

"কর্মে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক।"

৩ নভেম্বর, ১৮৯৭ স্বামীজী মার্গারেটকে লিখলেন, "অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে।" আবার আশ্বাসও দিলেন, "...বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি এক-টুকরো রুটি পাই, নিশ্চয় জেনো, তুমি তার সবটুকুই পাবে।"

কিন্তু আমরা দেখব ভারতে আগমনের পূর্বে স্বামীজীর কাজের সঠিক ধারণা করা মার্গারেটের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি যা আশা করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তা সময়ে সময়ে মরীচিকা বলে মনে হয়েছে।

মার্গারেট ভারতে এসে পৌঁছালেন ১৮৯৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৭ মার্চ, শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দিনটিকে তাঁর তৃতীয় জন্মদিবস বলা যায়। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। শ্রীশ্রীমা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন, সেযুগে যা ছিল অকল্পনীয়। আরও আশ্চর্যের কথা এত অল্প সময়ের মধ্যে মার্গারেট শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা কী করে বুঝতে পারলেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁকে চিনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আহা, কী সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী! নরেনকে কী ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কী গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কী ভালোবাসা!" শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মার্গারেট তাঁর গর্ভধারিণীকে উল্লেখ করতেন 'Little Mother' বলে।

২৫ মার্চ ১৮৯৮, মার্গারেটের জন্মান্তর ঘটল। নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থিত মঠের ঠাকুরঘরে পূজার আয়োজন করা ছিল। স্বামীজী প্রথমে মার্গারেটকে দিয়ে সংক্ষেপে শিবপূজা করিয়ে পরে তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন। ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক শুভ অনুষ্ঠান শেষ হল। স্বামীজী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচ শত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণবিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ

করো।" মার্গারেটের নাম হল নিবেদিতা। শিষ্যাও এই গুরুদত্ত নামটি সার্থক করেছেন ভারতকল্যাণে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে। মাতৃগর্ভে জননী কর্তৃক নিবেদিত কন্যার উৎসর্গ-অনুষ্ঠান এতদিনে সম্পূর্ণ হল। ওই দীক্ষার দিনটি স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যার জন্যই বিশেষভাবে যেন নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ওপরে যে-কার্যভার অর্পণ করেছিলেন, সেদিন তিনি অকপটভাবে নিবেদিতার কাছে সেটি ব্যক্ত করলেন। সঙ্ঘ স্থাপনের মহৎ দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যস্ত করেন স্বামী বিবেকানন্দের ওপর। পুরুষদের জন্য কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সঙ্ঘের সূচনা করেন, বরাহনগর আলমবাজার হয়ে সে-মঠ তখন বেলুড়ে নিজ জমিতে অবস্থিত। স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল অনুরূপ একটি স্ত্রীমঠ স্থাপন করে মেয়েদের সামনেও তুলে ধরতে হবে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। তারই জন্য প্রয়োজন এমন একজন নারীর যিনি ভারতের প্রাচীন ভাবসম্পদের বিষয়ে অবহিত এবং নিজেও ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত।

স্বামীজী কিন্তু তখনও মনে করছেন না যে, তাঁর পরিকল্পিত স্ত্রীশিক্ষার কাজে নিবেদিতার যোগ দেওয়ার সময় হয়েছে। যে ভারতীয় রমণীদের জন্য নিবেদিতা কাজ করবেন, তাদের সামাজিক, পারিবারিক পরিবেশকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানার জন্য ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আবশ্যক।

স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যাদের নিয়ে ভারত ভ্রমণে বের হলেন। স্বামীজীর সঙ্গে এই ভারত ভ্রমণ নিবেদিতার জীবনের প্রস্তুতিকাল। কাশ্মীরে একদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তাঁর ভাবী স্কুল সম্বন্ধে কী চিন্তা করছেন। নিবেদিতা নিজে একজন প্রতিভাময়ী শিক্ষাবিদ। প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নারীসমাজ সম্বন্ধে সঠিক অভিজ্ঞতার। নিবেদিতার ইচ্ছা, শিক্ষাদানের প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মভাব থাকবে, সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকে প্রাধান্য দেওয়ার সংকল্প করেছেন। তিনি স্বামীজীকে অনুরোধ করলেন, তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে চিন্তা করে সেসম্পর্কে সমালোচনা করতে। স্বামীজী কিন্তু সম্মত হলেন না। বললেন, "তুমি আমাকে সমালোচনা করতে বলছ কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমার ধারণা তুমিও আমার মতো ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। সব ধর্মের লোকই বিশ্বাস করে তাদের ধর্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তি দ্বারা পরিচালিত। আমাদেরও তাই

বিশ্বাস।... সুতরাং তুমি যা সবচেয়ে ভালো বলে বিবেচনা করেছ, সেই কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব।''

স্বামীজী স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে নিবেদিতাকে যেকথাগুলি বলতেন তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, 'স্বদেশ এবং ধর্মের মধ্যে যেন সমন্বয় ঘটে', 'হিন্দুধর্ম যেন সক্রিয় এবং অপরের ওপর প্রভাবশালী হয়,' 'ভারতের অভাব বাস্তব কর্মতৎপরতা, কিন্তু তার জন্য ভারতের ধ্যানধারণার জীবন যেন উপেক্ষিত না হয়।' স্বামীজী নিবেদিতাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ছিল সমুদ্রের মতো গভীর ও আকাশের মতো উদার।

নিবেদিতার আগ্রহ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণপূজার প্রবর্তন করবেন তাঁর বিদ্যালয়ে। স্বামীজী স্বীকার করলেন তাঁর নিজের জীবনে সেই মহাপুরুষের প্রভাব গভীর ভাবে বর্তমান কিন্তু সেটা অপরের পক্ষে সমানভাবে সার্থক নাও হতে পারে। আমরা দেখব ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ রবিবার, কালীপূজার দিন ১৬ নং বোসপাড়া লেনে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পূজাশেষে শ্রীমায়ের আশীর্বাণীর তাৎপর্য কী গভীর! শ্রীশ্রীমা বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও প্রার্থনা করছেন, ''এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়।'' এখানে উল্লেখ্য নিবেদিতা কেবলমাত্র সামান্য ভাষা ও গণিত শিক্ষার জন্য একটা গতানুগতিক বিদ্যালয় কখনই চাননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। বিদ্যালয় স্থাপন একটি বিরাট সম্ভাবনার বীজবপন মাত্র।

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি স্বামীজী নানাভাবে নিবেদিতার সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাচ্ছেন। বোসপাড়া অঞ্চলে খুব কাছ থেকে নিবেদিতা ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছেন। গুরুর আশীর্বাদে নিবেদিতা এক আশ্চর্য দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। অতি সাধারণ ঘটনাও তাঁর কাছে দেখা দিত অসাধারণ ভাবে। সুতরাং তাঁর বহু লেখার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের নতুন করে ভারতকে চিনিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হল 'The Web of Indian Life', যা ইংল্যান্ডে ও ইউরোপে সেযুগে আলোড়ন তুলেছিল, ধাক্কা দিয়েছিল তাদের প্রচলিত ধারণাতে। ইতিহাসের এক আশ্চর্য পরিহাস যে, ভারতের উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাশ্চাত্যদেশ লাভ করল এক

ইংরেজ রমণীর কাছ থেকে। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতাকে উপলক্ষ করে ভারতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন স্বামীজী স্বয়ং।

অর্থসংগ্রহের জন্য যখন নিবেদিতা ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে গেলেন, সেই মাসখানেকের সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজী অবিরাম তাঁর কাছে চিন্তাপ্রবাহ ঢেলে দিয়েছিলেন। নিবেদিতাও সেসব গ্রহণ করতে সমর্থ হন তাঁর অসাধারণ ধীশক্তির সহায়তায়। স্বামীজীর বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে যিশুখ্রিষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রসঙ্গ যেমন থাকত, তেমনই থাকত ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও পুরাণকথা। নিবেদিতা পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে স্বামীজীর প্রত্যেকটি কথা লিখে রাখতেন। ভারত তাঁর কাছে এজন্য ঋণী। এসময় তিনি 'Cradle Tales of Hinduism' বইটির উপাদানও সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রাকে তিনি শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রার সঙ্গে তুলনা করতেন। ভারতের নারীগণের শিক্ষার দায়িত্ব স্বামীজী দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। তিনি একবারও সেকথা বিস্মৃত হননি। যে-কোনও কাজে নামার আগে ধ্যানের দ্বারা অন্তর্মুখ ভাবকে আয়ত্ত করতে হয়, স্বামীজীর এই শিক্ষা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। স্বামীজী মনে করিয়ে দিলেন নিবেদিতাকে কারও ওপর নির্ভর না করে একাই নিজের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা দেখেছি—তাঁর বিদ্যালয়ের কাজে অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি পাশ্চাত্যে যথোচিত সাড়া জাগাতে পারেননি। বহুস্থানে বছরে একটিমাত্র ডলারের প্রত্যাশাও তাঁর পূর্ণ হয়নি। নিবেদিতার চোখের সামনে কতকগুলি অসহায় বালিকার মুখ ভেসে উঠত—যাদের জীবন তিনি বদলে দিতে পারতেন বছরে মাথাপিছু মাত্র একটি ডলার পেলে।

নিবেদিতাকে অবসন্ন জেনে স্বামীজী তাঁকে একটি পত্র দেন। স্বামীজী বুঝেছিলেন যেকাজে নিবেদিতা হাত দিয়েছেন তাতে বহু ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। যাদের জন্য তিনি প্রাণপাত করবেন, তারাই হয়তো নিবেদিতার আন্তরিকার প্রতি সন্দেহ ও বিদ্রুপ বর্ষণ করবেন। সুতরাং প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতির। সেই ভাব প্রকাশ করে স্বামীজীর কাছ থেকে এল অপূর্ব পত্র, "...যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকো, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ করো; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে আমাদের এমন শঙ্কিত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে

আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা বহন করাই বরং ছিল ভালো। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় স্বেচ্ছায় কাঁধে নেয়, জগতকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে, তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না, তার কারণ এ নয় যে, জগতে পাপ নেই, তার কারণ এই যে, সে স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।...

"আজ প্রাতে শুধু এ-তত্ত্বের আলোই আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে।...

"দুঃখভার জর্জরিত যে যেখানে আছ, সব এসো, তোমাদের সব বোঝা আমার ওপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাকো,... অনন্ত ভালোবাসা জানবে। ইতি—

তোমার বাবা
বিবেকানন্দ"

পত্রটি নিবেদিতাকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করে। তিনি কেন হতাশ হবেন? তিনি তো স্বেচ্ছায় সাগ্রহে স্বামীজীর কাজের ভার নিয়েছেন। যেদেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, সেদেশবাসীর বিরুদ্ধে একদিনের জন্যও তাঁর মুখে অভিযোগ শোনা যায়নি। আরেকটি আঘাতও তাঁকে পেতে হয়েছিল। নিবেদিতা অনেক আশা করে আমেরিকা এসেছিলেন—ভেবেছিলেন যে, এখানে স্বামীজীর শিষ্য ও বন্ধুরা তাঁকে অযাচিত সাহায্য করবেন। কিন্তু আমরা দেখেছি মিসেস বুল, মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউড ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে নিবেদিতা প্রত্যাশিত সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ করেননি। অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও তাঁকে তীব্র প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যখনই নিবেদিতা কাতর হতেন স্বামীজীর কাছ থেকে আশ্বাসপূর্ণ পত্র আসত। এবারও ২৪ জানুয়ারি, ১৯০০ স্বামীজী লিখলেন, "আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে; একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয়, তাদের দুর্ভোগও হয় বেশি। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।"

আবার দেখছি ২৬ মে ১৯০০ লিখছেন, "আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হোয়ো না, শ্রী ওয়া গুরু, শ্রী ওয়া গুরু। ক্ষত্রিয়শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়।... দৃঢ় হও, মা! কাঞ্চন কিংবা অন্য কিছুর দাস হোয়ো না, তবেই সিদ্ধি সুনিশ্চিত।"

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি পাশ্চাত্য দেশ থেকে নিবেদিতা ১৭ নং বোসপাড়া লেনের স্কুলবাড়িতে ফিরে এলেন। সরস্বতী পূজার পর স্কুলটি খুলে দিলে বালিকারা বিদ্যালয়ে আসতে আরম্ভ করে। তিনি নিজে তখনও বিদ্যালয়ের কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। ভগিনী কৃস্টিন এসে বিদ্যালয়টির ভার নেওয়ায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। ধীর-স্থির শান্ত মধুরভাষিণী কৃস্টিন ছিলেন স্বামীজীর আস্থাভাজন।

স্বামীজী সেসময় কাশীতে। সেখান থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি মিসেস বুলকে একটি পত্র লেখেন, "মাতা ও কন্যাকে [নিবেদিতাকে] আরেকবার ভারতভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি।" ওই পত্রে মিসেস বুলকে তাঁর আরেকটি ইচ্ছার কথাও জানান। মিসেস বুল ও নিবেদিতা যেন কলকাতার পশ্চিমে কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখে আসেন। সেখানে তাঁরা বাঁশ, বেত, খড় নির্মিত বাঙালি বাসগৃহের নমুনা দেখতে পাবেন। আক্ষেপ করেন—আহা! নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি ওইভাবে নির্মাণ করে দিতে পারতেন! নিবেদিতার বিদ্যালয়টি সম্বন্ধেও স্বামীজীর কত না আগ্রহ। ১৪ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতাকে লিখছেন, "সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোন, অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোকএবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর, এই আমার প্রার্থনা।...

"যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন তবে যেভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্টভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

ইতিমধ্যে নিবেদিতার মনের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বিদেশি শাসনের ভয়ংকর রূপ হৃদয়ঙ্গম করার পর এক মুহূর্তও ভারতের ওপর ইংরেজ আধিপত্য তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তাঁর ধমনীর আইরিশ রক্ত সাংঘাতিক

ভাবে মানসিক প্রতিক্রিয়া এনেছিল। স্বামীজীর কাছে বিদেশি শাসনের ভয়াবহ পরিণাম অজ্ঞাত ছিল না এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন না হলে জাতির মঙ্গল সম্ভব নয়, তাও তিনি জানতেন। তবু রাজনৈতিক সংগ্রামকে তিনি তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত রাখেননি। কিন্তু নিবেদিতাকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নিবেদিতার আশঙ্কা ছিল তাঁর রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী স্বামীজী হয়তো অনুমোদন করবেন না। কোনও কাজে স্বামীজীর সমর্থন না-পাওয়া যে নিবেদিতার পক্ষে কত মর্মান্তিক! নিবেদিতা নিজেই লিখছেন, "এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে ভারত এবং ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু করবার আছে। কিন্তু কেমন করে সম্পন্ন হবে, সে ভার মায়ের ওপর।... আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব স্বামীজীর মহৎ বাণী কী অতুলনীয়। আমি গতবছর এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি যা আমার জন্য তাঁর নির্দিষ্ট করে দেওয়া পথের বাইরে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি এত দৃঢ়ভাবে ধরেছি যে, যদি কোনও জায়গায় আমার ভুল হয়ে থাকে তবে সে-ভুল তাঁর, আমার নয়।"

নিবেদিতা ১১ মে, ১৯০২ কৃস্টিনকে নিয়ে মায়াবতী চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন ২৬ জুন রাত্রে। কৃস্টিন তখনও মায়াবতীতে। ২৮ জুন স্বামীজী এলেন বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বিদ্যালয়ে। কেউ কল্পনা করতে পারেনি এটিই তাঁর শেষ আগমন! নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামীজীকে দর্শন করেন ২ জুলাই। সেদিন স্বামীজীর কথাবার্তা বা ব্যবহারে কোথাও কোনও বিষণ্নতা ছিল না, বরং একটা জ্যোতির্ময় সত্তার আবির্ভাব তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি য়ুমকে (ম্যাকলাউড) লিখলেন, "...আমার মনে হয় তিনি জানতেন আমি তাঁকে আর দেখতে পাব না। এত আশীর্বাদ! কেবল আমি যদি জানতে পারতাম প্রত্যেকটি মুহূর্ত কত মূল্যবান!" ৪ জুলাই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

নিবেদিতার সামনে সেদিন জীবনের চরম সংকট উপস্থিত। এক মুহূর্তে সবকিছু বদলে গেল। স্বামীজীর প্রাণের বস্তু মঠকে বাঁচাতে হলে রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নিবেদিতাকে সঙ্ঘ থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে। অথচ সেটিও তাঁর কাছে কম বেদনাদায়ক নয়। তিনি নিজেও প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর কর্মপরিধি বহু বিস্তৃত। দশ-বারোটি মেয়ের মধ্যে শিক্ষা এবং আদর্শ প্রচারে ফল কিছু হবে না। দেশবাসীর মধ্যে আনতে হবে জাতীয় চেতনা, তখন তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে তাদের কী প্রয়োজন। নিবেদিতার

নিজের কথায়, "আমার কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা, কয়েকটি মেয়েকে প্রভাবিত করা নয়।... আমাদের কর্তব্য মহাশক্তির তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়া, তীরে উত্তীর্ণ হব কিনা সে ভার মহামায়ার ওপর।"

এখন আমরা নিবেদিতাকে দেখব ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে স্বামীজীর বাণীকে তাঁর নিজের মতো করে প্রচারে নিযুক্ত। প্রধানত তিনি ভারতের একতার ওপরই বক্তৃতা দিতেন। নিবেদিতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতবর্ষে এক অখণ্ড শক্তিশালী মহান ঐক্য বিরাজ করছে। আর তাকে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত। সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী স্বদেশপ্রেম নয়, ভারতের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে যেন উচ্চারিত হয় একটি মাত্র শব্দ—'জাতীয়তা'। কিন্তু নিবেদিতা সেইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন আরও একটি কথা ভারতবাসী কোনওমতেই যেন জাতীয়তার জন্য ধর্ম পরিত্যাগ না করে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে-শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে এবং আজকের দিনে তারই নাম 'জাতীয়তা'।" যেখানেই নিবেদিতা কয়েকটি তেজস্বী, সাহসী সম্ভাবনাময় ছেলেকে দেখেছেন, সেখানেই নিজেকে নিঃশেষ করে প্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন, তাদের অনুপ্রাণিত করে বলেছেন, "তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। সর্বদা মনে রেখো, সমগ্র ভারতই তোমার দেশ, আর এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন হল কর্ম।... স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনগণ জগতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করার এক সুযোগ পেয়েছে।"

একই সঙ্গে নিবেদিতা ভারতবর্ষের মেয়েদেরও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। মাদ্রাজে এক মহিলাসভায় প্রদত্ত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবৃতি 'খোলা চিঠি'তে (২০ ডিসেম্বর, ১৯০২)। তিনি লেখেন, "তাঁর [স্বামী বিবেকানন্দের] দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ পুরুষের চেয়ে নারীর ওপর বেশি নির্ভর করছে। আর আমাদের ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ।"... তিঁনি আরও লেখেন সকল দেশই, জাতির মহান সম্পদ পবিত্রতা ও বীর্য রক্ষার ভার নারীর ওপরই দিয়ে এসেছে। পুরুষের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি ও মহত্ত্বের উৎস গৃহ আর তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, "ভারতমাতা এই মুহূর্তে তাঁর মেয়েদের বিশেষভাবে আহ্বান করছেন তাঁরা

যেন প্রাচীনকালের মতো শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। কী করে তা সম্ভব হবে?

"প্রথমত, হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন। ... ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।

"দ্বিতীয়ত, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তানসন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না, যার ফলে সৃষ্টি হবে শক্তিশালী কর্মী—যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্যই মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে।" ভারত-সন্তানের জন্য জননীর এই আদর্শ আজকের দিনে আরও অনেক বেশি প্রয়োজনীয় নয় কি?

দেশকে জাগ্রত করার কাজ স্বামীজী করে গেছেন। নিবেদিতার দায় তাকে সঞ্জীবিত রাখা। সর্বক্ষণ তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শ ও মহিমা প্রচার। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই দুই মহাজীবনের মধ্যেই সমগ্র ভারতের ঐক্য নিহিত। কেবল তাঁদের আদর্শ অনুসরণই ভারতমাতাকে আরও একবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

নিবেদিতাকে তাঁর আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে যেতে হয়েছিল। এক যুগ-সন্ধিক্ষণে নিবেদিতার আবির্ভাব ঘটেছিল ভারতে। সেদিন ভারতের প্রয়োজন ছিল জাতীয়তা উদ্বোধনকারী প্রাণশক্তির। আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। বর্তমান ভারতের সংহতি বিপন্ন। আজ একান্ত অভাব জাতীয় চেতনার। ভারতের বিপুল জনশক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু আজও নিবেদিতা মূর্তিময়ী প্রেরণারূপে অবস্থিত। এই সংকট মুহূর্তে তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা—তাঁর আহ্বানে ভারত সন্তান দলে দলে(আবার) সমবেত হোক—নতজানু হয়ে দৃঢ়চিত্তে পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করুক তাঁরই প্রিয়মন্ত্র : "হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান যে বেশে ইচ্ছা আমার কাছে এসো, আমাকে তোমার করে নাও।"

ব্যক্তি-পরিচিতি

স্বামী অখণ্ডানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। স্বামীজীর একান্ত অনুগত। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞে প্রথম হোতা।

স্বামী অভয়ানন্দ

স্বামীজীর ফরাসি শিষ্যা। পূর্বাশ্রমের নাম মাদাম লুই। থাউজেন্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজী এঁকে সন্ন্যাস দেন এবং নামকরণ করেন 'স্বামী অভয়ানন্দ'।

লেডি ইসাবেল

ভগিনী নিবেদিতার বান্ধবী। ১৮৯৫-এর নভেম্বর মাসে এই সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলার আবাসে এক ঘরোয়া বৈঠকে স্বামীজী ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভাষণ দেন। ওই সভায় উপস্থিত মার্গারেট নোবল (নিবেদিতা) সেই প্রথম স্বামীজীকে দর্শন করেন।

মিঃ ওকাকুরা

কাকাজু ওকাকুরা বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ও জাপানি শিল্পী।

ওলিয়া

মিসেস সারা বুলের কন্যা।

মিসেস কলস্টন

নিবেদিতার কাছে সাহায্য করতে এদেশে আসতে ইচ্ছুক। তৃতীয়বার স্বামীজী রিজলি ম্যানরে বাসকালে উপস্থিত ছিলেন।

মিস কৃস্টিন গ্রিনস্টিডেল

ভগিনী কৃস্টিন ডেট্রয়েট নিবাসিনী। থাউজেন্ড আইল্যাণ্ডে স্বামীজীর পূতসঙ্গলাভ করেন এবং স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দেন। ১৯০২-এ স্বামীজীর দেহাবসানের কয়েকমাস মাত্র আগে ভারতে নিবেদিতাকে স্ত্রীশিক্ষার কাজে সাহায্য করতে আসেন এবং

বিদ্যালয় পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা নেন।

গিরিশ ঘোষ

বিখ্যাত নট ও নাট্যকার। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহী ভক্ত। বাগবাজার নিবাসী এবং সেইসূত্রে ভগিনী নিবেদিতার প্রতি স্নেহশীল ও তাঁর নিকট প্রতিবেশী।

সরলা ঘোষাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদুষী কন্যা। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা।

মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি

আইনজীবী, ধর্মজিজ্ঞাসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা।

সুরেন ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের মধ্যমভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।

স্বামী তুরীয়ানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বেদান্ত প্রচারে কয়েকবছরের জন্য যান। ১৯০২-এ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে প্রধানত তপস্যা ও জ্ঞান চর্চায় কালাতিপাত করেন।

নিম

নিবেদিতার ছোটো বোন। মে, মেরি ইত্যাদি নামেও অভিহিত। পরবর্তী কালে মিসেস উইলসন।

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। নিবেদিতার দেহাবসানের পর তিনি প্রতিদিন পূজাকালে এই মহীয়সী ভারত উপাসিকার উদ্দেশ্যে ফুল দিতেন।

মিস ফার্মার
বিখ্যাত তড়িৎতত্ত্ববিদ্ গেরিস ফার্মারের কন্যা। গ্রীনএকার রিলিজিয়াস কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাত্রী।

জগদীশচন্দ্র বসু
প্রসিদ্ধ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক। নিবেদিতা তাঁকে স্কচ ভাষায় 'Bairn' নামে ডাকতেন যার অর্থ 'A Child'. নিবেদিতা তাঁর গবেষণার কাজে প্রেরণা দেন ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনায় তাঁর থিসিস লেখার কাজে সাহায্য করেন।

মিসেস সারা বুল
নরওয়ের বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের বিধবা পত্নী। স্বামীজীর বিশেষ আস্থাভাজন। মাতৃতুল্যা এই মার্কিন মহিলা 'সেন্ট সারা' নামেও ঘনিষ্ঠ মহলে অভিহিত হতেন।

সিস্টার বেট
নিবেদিতার বাল্যকালে পরিচিতা এবং এদেশে এসে বাগবাজারে তাঁর গৃহস্থালী কাজে কয়েকবছর সহায়তা করেন।

বেবি (ফ্রান্সেস লেগেট)
মিস্টার ও মিসেস লেগেটের কন্যা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্ররূপে চিহ্নিত।

মিসেস ব্রিগ্‌স
মিসেস বুলের বান্ধবী মেরিয়ান ব্রিগ্‌স্।

মন্টেগু
ম্যাকলাউডের বোনঝি অ্যালবার্টার স্বামী জর্জ মন্টেগু। আর্ল অব স্যান্ডুইচ।

মিস ম্যাকলাউড
স্বামীজীর 'বন্ধু', শিষ্যা এবং পাশ্চাত্য ভাবপ্রচারে বিশেষ সহায়িকা। 'জো', 'য়ুম'

ইত্যাদি নামেও অভিহিত।

ম্যাক্সমূলর
জার্মান পণ্ডিত। পাশ্চাত্যে 'ঋগ্বেদ' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা 'Ramakrishna : His Life and Teachings' ১৮৯৮-এ প্রকাশিত।

স্বামী যোগানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট।

ডোরা রথলিসবার্জার
ম্যাকলাউডের বান্ধবী।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। দক্ষিণভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রধান প্রচারক, মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ।

রিচ
নিবেদিতার ছোটো ভাই।

মিঃ র‍্যাটক্লিফ
স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক।

মিসেস লেগেট
মিস ম্যাকলাউডের দিদি। বিধবা মিসেস স্টার্জিস মিঃ লেগেটকে আবার বিয়ে করেন। রিজলি ম্যানরের গৃহস্বামিনী।

স্বামী সদানন্দ
স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসিসন্তান। প্লেগ সেবাকাজে নিবেদিতার সহায়ক।

স্বামী সারদানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, শ্রীশ্রীমায়ের সেবক। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক।

ব্যক্তি-পরিচিতি

মিসেস সেভিয়ার

ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ারের স্ত্রী। স্বামীজীর ইচ্ছায় ক্যাপ্টেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজীর দেহাবসানের পরও ১৯১৬ সাল পর্যন্ত মাদার সেভিয়ার মায়াবতীতেই বাস করতেন। পরে ইংল্যান্ডে ফিরে যান ও ১৯৩১-এ তাঁর দেহাবসান হয়।

স্বামী স্বরূপানন্দ

স্বামীজীর সন্ন্যাসিসন্তান। আলমোড়ার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রিকার সম্পাদক।

মিস মড স্টাম

ফরাসি শিল্পী। রিজলিতে স্বামীজীকে বসিয়ে তাঁর ছবি আঁকেন, নিবেদিতারও সুন্দর প্রতিকৃতি রচনা করেন। তৃতীয়বার স্বামীজীর রিজলি বাসকালে নিকটবর্তী 'স্টোন রিজ' পল্লীতে বাস করে স্বামীজী ও এই অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠীর আকর্ষণে প্রত্যহ রিজলি ম্যানরে আসতেন। স্বামীজী সম্বন্ধে স্টামের স্মৃতিকথা আছে।

অ্যালবার্টা স্টার্জিস

মিস অ্যালবার্টা স্টার্জিস ছিলেন মিস ম্যাকলাউডের দিদি বেটি বা বেসি লেগেটের প্রথম পক্ষের স্বামী মিঃ স্টার্জিসের তরুণী কন্যা।

হলিস্টার

মিসেস বেটি স্টার্জিসের পুত্র। অ্যালবার্টার ভাই।

ডাঃ হেলমার

লেগেটদের পারিবারিক চিকিৎসক এবং সেইসূত্রে স্বামীজীরও চিকিৎসা করেন।

এরিক হ্যামন্ড ও নেল হ্যামন্ড

ইংল্যান্ডের মিঃ এরিক হ্যামন্ড ও মিসেস নেল হ্যামন্ড স্বামীজীর অনুগত ভক্ত ছিলেন। স্বামীজীর সম্বন্ধে মিঃ হ্যামন্ডের স্মৃতিচারণা 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ প্রকাশিত হয়।